দুই খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

নীল আতঙ্ক

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

নীল আতঙ্ক

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
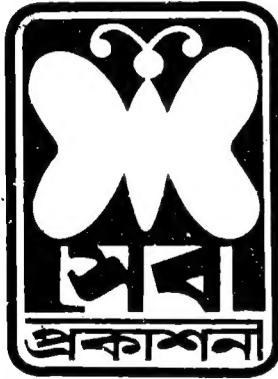
ISBN 984-16-7013-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

১ম প্রকাশ: ১৯৬৯
৫ম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

একত্রিশ টাকা

Masud Rana
NEEL ATANKO
[Part I&II]
A Thriller Novel

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ! *বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা মরণ কামড় *মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট।

নীল আতঙ্ক-১

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৬৯

এক

সকাল দশটা। ঢাকা।

ভাদ্র মাসের সকাল। আকাশ নীল। মাঝ আকাশে একটা প্রমাণ সাইজ সাদা মেঘের ভেলা। মৃদুমন্দ বাতাসে অলস গতিতে চলেছে সেটা প্রিয়ার দেশে। কোন তাড়া নেই যেন তার। অখণ্ড অবসর।

প্রকাণ্ড সাততলা স্টেট ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙ-এর মাথায় উঠেছে সূর্য। তারই সোনালী আলো বিছিয়ে পড়েছে মতিঝিলের লম্বা একটানা রাস্তাটার ওপর। দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত-সমস্ত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে অবসর নেই কারও। ছোট বড় নানান রকম রঙ-বেরঙের গাড়ি, ট্যাক্সি, বেবী-ট্যাক্সি, রিকশা, মোটর বাইক, বাস, ট্রাক ছুটছে প্রাণপণে হয় পুবে, নয় পশ্চিমে। চারদিকে সময় নেই, সময় নেই ভাব। জীবিকার তাড়া।

সাদা একটা ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেড এসে থামল চারতলা মির্জা চেম্বারের সামনে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রাক্তন এজেন্ট মাসুদ রানা। কড়া ইস্তিরি দেয়া টেট্রনের নীল স্যুট, সাদা শার্ট, লাল সিল্কের টাই—পায়ে কালো অক্সফোর্ড শু। চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে এদিক-ওদিক চাইল সে একবার, তারপর দীর্ঘ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঢুকে পড়ল মির্জা চেম্বারের গেট দিয়ে।

দ্রুত পায়ে উঠে এল রানা দোতলায়। প্রথমেই সারি দিয়ে দেয়ালে টাঙানো লেটার বক্সগুলোর মধ্যে 'রানা এজেন্সী' লেখা বাক্সটা খুলল সে। যা আশা করেছিল, তাই। আজও চিঠি নেই একটাও।

করিডর ধরে বাম দিকে এগিয়ে গিয়ে সবশেষের দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। খোলা দরজা, ভারী পর্দা ঝুলছে। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা সাইন বোর্ড

রানা এজেন্সী

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরস

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল রানা। তুমুল বেগে খটাখট খটাখট টাইপ করছিল অনীতা গিলবার্ট, রানাকে দেখে চোখে মুখে একটা হতাশ ভঙ্গি ফুটে উঠল ওর। ঠোঁট উল্টে বিরক্তি প্রকাশ করল সে।

'ওহ, তুমি। আমি ভেবেছিলাম কোন পার্টি এল বুঝি।' টাইপ করবার সমস্ত আগ্রহ লোপ পেল অনীতার। হাত গুটিয়ে নিয়ে আরাম করে বসল সে আবার পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে।

সপ্তাহ দুয়েক হলো ভাড়া নিয়েছে রানা এই অফিস স্যাইট। দুই কামরা বিশিষ্ট

এই অফিস স্যুইটের প্রথমটা অফিস সেক্রেটারি শ্রীমতী অনীতা গিলবার্টের জন্যে—সুইংডোর ঠেলে আরেকটু এগিয়ে গেলে রানার চেম্বার। একটি খরিদ্দারও পাওয়া যায়নি গত দুই সপ্তাহে। তাই উদ্বিগ্ন অনীতা। ব্যস্ততার ভান করে পার্টির শ্রদ্ধা অর্জন করবার চেষ্টা তাই ওর।

'হাসলে যে?' রানাকে মুচকে হাসতে দেখে ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল অনীতা।

'হাসছি তোমার পাগলামি দেখে। একটা পার্টিও তোমার হাত থেকে ফস্কাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'পার্টি এলে তো ফস্কাবে। একটা পার্টির টিকিও তো দেখতে পেলাম না এই চোদ্দ দিন।' বিরক্ত কণ্ঠে বলল অনীতা।

'আফসোস করে লাভ নেই নীতা। এসে যাবে পার্টি। ব্যবসা দাঁড় করাতে গেলে একটু ধৈর্য ধরতেই হয়। এখন যাও, দুটো পর্যন্ত ছুটি তোমার। আমি অফিসে থাকছি, একটু চরে এসো ততক্ষণে—কেনা-কাটাগুলোও সেরে ফেলো।' গাড়ির চাবিটা এগিয়ে দিল রানা।

উঠে দাঁড়িয়ে রানার গালে একটা কেতাদুরস্ত চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল অনীতা, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে হাইহিলের খটখট শব্দ আর টেডি কামিজের পিছনে ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গ তুলে। টাইপ রাইটার লাগানো কাগজটার ওপর চোখ পড়তেই দেখল রানা, আধ পৃষ্ঠা ভর্তি লেখা আছে কেবল একই কথা—I Love Rana.

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল মাসুদ রানা।

ছোট্ট ঘর। দশ ফুট বাই দশ ফুট। মেঝেটা সস্তা দামের কার্পেটে ঢাকা। ঘরের কোণে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ওপাশে রানার সুইভেল চেয়ার, আর এপাশে ক্লায়েন্টের জন্যে দুটো গদি আঁটা আর্ম চেয়ার। রানার মাথার উপর দেয়ালে টাঙানো রয়েছে একটা জাপানী ওয়াল ক্লক—তাতে লেখা আছে, টাইম ইজ মানি। ঘরে ঢুকেই বাঁ ধারের কাঁচের জানালা দিয়ে নিচের দিকে চাইলে ব্যস্ত সড়কটা চোখে পড়ে। আর ডান দিকের দেয়ালে টাঙানো আছে একটা জাপানী পাওয়ার টিলার কোম্পানির ওয়াল ক্যালেন্ডার। নগ্ন যুবতীর সঙ্গে পাওয়ার টিলারের কি সম্পর্ক বোঝা মুশকিল, কিন্তু এই ক্যালেন্ডারের শোভাবর্ধন করেছে বিশেষ বিশেষ মনোরম ভঙ্গিতে ছয়টি ন্যুড ফটোগ্রাফ। একটা স্টীলের আলমারি রয়েছে ঘরের আরেক কোণে।

ব্যস, আর কোন আসবাব নেই ঘরটায়।

নিজের চেয়ারে বসে জুতোসুদ্ধ দুই পা তুলে দিল রানা টেবিলের উপর। একটা সিনিয়র সার্ভিস ধরিয়ে মনের সুখে টানল কয়েকবার। কিন্তু টেবিলের উপর ভাঁজ করে রাখা পাকিস্তান টাইমসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল সে আচমকা।

পায়ের শব্দ। কেউ একজন এগিয়ে আসছে করিডর ধরে! ঝট্ করে পা নামিয়ে নিল রানা টেবিলের ওপর থেকে, একটানে বাম পাশের ড্রয়ার খুলে কিছু কাগজপত্র খাম বের করে ছিটিয়ে দিল ডেস্কের ওপর, ক্লিক করে টিপে দিল একটা বোতাম,

তারপর কাজের মধ্যে ডুবে গেল গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

খট্‌খট্। দরজায় নক করল কেউ। রানার কামরার দরজায়।

বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল রানার চেহারায়, চোখে, কপালের ভাঁজে। কাজের সময় বাধা পড়লে কে না বিরক্ত হয়।

'ভেতরে আসুন।' কর্কশ কণ্ঠে ডাকল রানা। মনে মনে ভাবল, অনীতাকে বিদায় দিয়ে ভাল করিনি, এসময় ও থাকলে কোম্পানির প্রেস্টিজ একলাফে পঞ্চাশ ফুট হাই হয়ে যেত। যাক, এখন আমাকেই পুষিয়ে নিতে হবে। গাম্ভীর্য আর ব্যস্ততা দেখিয়ে···

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ঘরে ঢুকল লোকটা। চমৎকার ধোপ দুরস্ত স্যুট পরনে, পায়ে পয়েন্টেড ইটালিয়ান শূ, হাতে স্টীল লাইন্‌ড ব্রীফকেস। মাথার মাঝখানে সিঁথি, জুল্‌ফি কাঁচা-পাকা, চোখ দুটো সপ্রতিভ। এক নজরেই পরিষ্কার বোঝা যায় ইনস্যুরেন্স এজেন্ট। হতাশ হলো রানা।

'কিছু মনে করবেন না, ও ঘরে কাউকে না দেখে···' মাথা ঝাঁকিয়ে প্রথম ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'আপনার সেক্রেটারি বোধহয়···'

'হ্যাঁ, বাইরে গেছে কাজে। বসুন।' নিরাসক্ত কণ্ঠে অভ্যর্থনা করল রানা। ব্রীফকেসটা চেয়ারের পাশে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে বসল লোকটা। অস্বস্তিতে ফেলে যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় দেবার উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্যপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা ওর দিকে।

'আমার নাম এস.এম. খালেক।' পরিচয় দিল লোকটা। রানার ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করল সে। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার মাসুদ রানা।'

'জ্বি।'

অপেক্ষা করল রানা ছোট উত্তরটা দিয়ে। একগাল ধোঁয়া ছাড়ল। ভাবল, এবার নিশ্চয়ই একটু অস্বস্তিবোধ করবে লোকটা। কিন্তু কিসের অস্বস্তি, নড়েচড়ে আরেকটু আয়েশ করে বসল সে। ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলাল, বেহায়ার মত ক্যালেন্ডারটা পর্যবেক্ষণ করল পনেরো সেকেন্ড, তারপর ফিরল রানার দিকে।

'ব্যবসা বিশেষ ভাল চলছে বলে তো মনে হচ্ছে না? কি বলেন মিস্টার মাসুদ রানা? তেমন সুবিধে হচ্ছে না, তাই না?' মৃদু মৃদু হাসছে লোকটা।

'আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, মিস্টার খালেক?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা। বুঝে নিয়েছে সে সূক্ষ্ম কায়দা করে এ লোককে ভাগানো যাবে না সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিয়ে সোজাসুজি চাইল সে লোকটার চোখের দিকে।

'আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাই আমি ' বলল লোকটা। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গেছে ওর ঠোঁট থেকে।

'আমার সম্পর্কে তথ্য।' বিস্ময় ফুটে উঠল রানার কণ্ঠে। 'ভণিতা ছেড়ে দয়া করে আপনার উদ্দেশ্য এবং বক্তব্য বলে ফেলুন, মিস্টার খালেক। আমি ব্যস্ত আছি. কাজ পড়ে আছে-অনেক।'

'আপনার কাজ আর একটু বাড়াবার জন্যেই এসেছি আমি! কিন্তু আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য না জানলে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এই কঠিন মিশনের জন্যে আপনি ঠিক উপযুক্ত লোক কিনা। মানে···'

'মিশন?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। তারপর জোর করে ঠোঁটে একটু হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলে বলল, 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মাত্র—মিশন বা স্পাইং আমার লাইন নয়।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' একটু যেন বিদ্রূপের আভাস পাওয়া গেল খালেকের কণ্ঠে। 'এক কাজ করা যাক। আপনি যখন নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবেনই না, তখন আমিই বলছি। কোথাও ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন।' রানার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠতেই চট করে বলল, 'আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আমার সব কথা শুনলে আপনার মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়েছে বলে মনে করবেন না আপনি।'

দুই হাঁটুর ওপর ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে খুলে ফেলল সেটা এস.এম. খালেক। একটা কাগজ বের করে নিয়ে বন্ধ করে নামিয়ে রাখল সেটা আবার মেঝের ওপর। তারপর পড়তে আরম্ভ করল

'মাসুদ রানা। পিতা—পরলোকগত জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরী। জন্ম—ঢাকা, ১৯৩৬ সালের ৯ এপ্রিল। শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি.এ.। অবিবাহিত। পাকিস্তান আর্মিতে ঢোকেন ১৯৫৬ সালে, সাতান্ন সালে নিয়ে আসা হয় আর্মি ইন্টেলিজেন্সে, মেজর পদে ইস্তফা দিয়ে একষট্টিতে চলে যান পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। পাকিস্তানের হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেন ছ'মাস আগে পর্যন্ত। কিন্তু অত্যন্ত রগচটা আর একরোখা টাইপের লোক বলে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছেন। টেন্ডেন্সী ফর ইন্‌-সাবোরডিনেশন— লেখা আছে আপনার সার্ভিস রেকর্ডে।'

রানার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল এবার লোকটা।

'তাই একদিন বাধল গোল। আচ্ছা, হঠাৎ পি.সি.আই. ছেড়ে দিলেন কেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ভাল লাগেনি তাই। একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল···'

'আসলে বের করে দেয়া হয়েছে আপনাকে পি.সি.আই. থেকে।' সবজান্তার মত মুচকে হাসল সে আবার। 'হায়ার অফিসারের সাথে হাতাহাতি করার অপরাধে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে আপনাকে। কিছুদিন ভবঘুরের মত ঘুরে ফিরে ধর-পাকড় করে চাকরি যোগাড় করে ফেললেন আপনি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে। চীফ সিকিউরিটি অফিসার। রাইট?'

থমকে গেছে রানা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'রাইট। আমার সম্পর্কে অন্যান্য সব তথ্য যোগাড় করা অসম্ভব নয়, কিন্তু শেষের এই খবর তো আপনার জানার কথা নয়!' শুধু এস.এম. খালেক কেন, এ খবরটা রিসার্চ সেন্টারের বাইরে দশজনের বেশি লোকের পক্ষে জানা এক কথায় অসম্ভব।

'জানার কথা নয়, কিন্তু জানি। এরকম আরও অনেক খবরই জানি আমি, যেগুলো আমার জানার কথা নয়। যেমন ধরুন, এই খবরটাও আমার জানা আছে

যে তিন সপ্তাহ আগে এই গোপন রিসার্চ সেন্টার থেকেও ডিসমিস করা হয়েছে আপনাকে। এবং তার কারণটাও অজানা নেই আমার। ওখানকার চীফ সায়েন্টিস্ট এবং ডাইরেক্টর জেনারেল ডক্টর শরীফের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে চাকরি যায় আপনার। রাইট?'

আর যাই হোক, এই লোক যে ইনস্যুরেন্সের পলিসি নেবার জন্যে চাপাচাপি করবে না, এটুকু বুঝে নিয়েছে রানা। কৌতুক ভরা দুটো চোখ এখন হাসছে রানার দিকে চেয়ে! মুখের ভাবের একটুও পরিবর্তন হতে দিল না রানা—শুধু সাবধান হয়ে গেল ভিতর ভিতর। কথা বলেই চলল লোকটা।

'চীফ সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে আপনি জানতে পেরেছেন, রোগ জীবাণুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে রিসার্চ হচ্ছে, এই ভান করে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে আসলে তৈরি করা হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব অর্গানিজম, ভাইরাস। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আণবিক শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে এই সব ভাইরাস ওয়ার অফিসের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে। সহযোগিতা করছেন ডক্টর শরীফের মত কয়েকজন পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিভাবান মনীষী বৈজ্ঞানিক। অল্পদিনেই এদেশ পৃথিবীর অন্যতম চার শক্তির একটি বলে পরিগণিত হতে চলেছে—এখবর আমার জানা আছে। মাত্র কয়েকটা উড়োজাহাজ হলেই পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রতিটি প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি এখন আমরা এই ভাইরাস ছড়িয়ে। আক্রান্ত দেশের নিরীহ জনসাধারণ কি নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করবে, সেটা উপলব্ধি করতে পেরে আপনি আপনার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি এবং তারই ফলে বাধে তুমুল বচসা। এবং তারই ফলে আজ আপনার এই অবস্থা—প্রাইভেট ডিটেকটিভ উইদাউট ক্লায়েন্টস। রাইট?'

'রাইট। সংগ্রামই জীবন।' বলল রানা মৃদু হেসে। তারপর উঠে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। চাবি লাগিয়ে দিল দরজায়। চাবিটা পকেটে রেখে ফিরে এসে বসল সে তার সুইভেল চেয়ারে। বলল, 'একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিস্টার খালেক যে কথাটা বেশি বলে ফেলেছেন আপনি। রিসার্চ সেন্টার এবং আমার সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখেন আপনি। এবার বলে ফেলুন কোন্ সূত্রে এসব খবর জেনেছেন।'

এক টুকরো ধূর্ত হাসি খেলে গেল এস.এম. খালেকের মুখে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। আরও একটু আয়েশ করে নড়েচড়ে বসল।

'অতি নাটকীয় করে তুলছেন আপনি ব্যাপারটা। এর কোন দরকার ছিল না, মিস্টার রানা। আপনি কি বোকা মনে করছেন আমাকে? ডু আই লুক লাইক এ ফুল?'

'সরি, ইয়েস। বাট ইউ কান্ট হেল্প ইট।' ফস্ করে বলে বসল রানা।

এমন চাঁচাছোলা উত্তর আশা করেনি লোকটা। একটু থতমত খেয়ে গেল সে প্রথমে, তারপর হেসে ফেলে বলল, 'রসিকতা করছেন করুন। কিন্তু এইসব খবর কি করে জানলাম আর কেনই বা আপনাকে বলছি বুঝতে পারবেন একটু পরেই

তার আগে আমার পরিচয় পত্রটায় একটু নজর বুলিয়ে নিন।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিল লোকটা। ব্যাম্বু বন্ড উড় ফিনিশ ভিজিটিং কার্ড। মিডিয়াম সাইজ। মাঝখানে একটা মনোগ্রামের নিচে ইংরেজীতে লেখা: ওয়ার্লড পিস কাউন্সিল। বাম ধারে নিচে লেখা: এস.এম. খালেক, সেক্রেটারি ফর সাউথ ঈস্ট এশিয়া।

'নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন!' চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে এগিয়ে বসল লোকটা। দুই হাত টেবিলের উপর ভাঁজ করে রাখা। একাগ্র একটা ভাব ফুটে উঠেছে মুখে। 'ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলের নাম প্রায় প্রতিদিনই পেপারে উঠছে আজকাল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সেরা সব লোক এ কাউন্সিলের মেম্বার। বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টাররাও আমাদের দলে। শান্তি চাই আমরা। কেবল এই মহাদেশের জন্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যে। জেনেভায় আমাদের হেড অফিস। আমাদের দেশেরও অনেক জ্ঞানী-গুণী, যাঁরা পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট নন এবং উন্নয়নের ব্যাপারে আশাবাদী, তাঁরা আমাদের পিছনে আছেন। বিশেষ করে এদেশের অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকজন পিছনে আছেন আমাদের—নাম বলতে চাই না।' কাষ্ঠ হাসি হাসল লোকটা। 'এমনকি রিসার্চ সেন্টারের কয়েকজন প্রভাবশালী সায়েন্টিস্টও আছেন আমাদের সঙ্গে!'

শেষের কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না রানা। আগের কথাগুলো সত্য হতেও পারে নাও পারে, শেষের কথাগুলো··· কিন্তু সত্যি যদি না হবে তাহলে এসব তথ্য যোগাড় করল কি করে এই লোক? ওয়ার্লড পিস কাউন্সিল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে রানা। আধাগোপনীয় এদের কার্যকলাপ। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সম্পর্কের মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে এই সংস্থার সাহায্যে আলোচনা চালানো আজকের দুনিয়ায় একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্ডটা রানার হাত থেকে ফিরিয়ে নিল এস.এম. খালেক। পকেটে রেখে বলল, 'আপনাকে এসব বলার কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমি নিতান্তই একজন ভদ্রলোক, সর্বস্বীকৃত এবং সম্মানিত একটি সংস্থার পক্ষ থেকে আপনার উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে চাই। শুধু শুধুই গাল-গল্প করতে আসিনি আমি।'

'তা বুঝতে পেরেছি।' বলল রানা

'ধন্যবাদ। তাহলে আমার প্রাথমিক কাজ সারা হলো।' সন্তুষ্টচিত্তে ব্রীফকেসটা কোলের উপর তুলে নিল খালেক। কাগজটা যত্নের সাথে ওর ভেতর রেখে দিয়ে লম্বাটে ধরনের একটা স্টীলের টিউব বের করল এবার। 'আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া—এরা সবাই তৈরি করছে ভাইরাস, এবার এদেশ যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। সমস্ত পৃথিবীর চোখ এখন এদেশের উপর। সবাই বিস্মিত এবং আতঙ্কিত। টঙ্গির মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের অপ্রতিহত অগ্রগতি চমকে দিয়েছে সবাইকে। কেঁপে উঠেছে ব্যালান্স অভ পাওয়ার। কল্পনা করুন, কী চরম অবস্থা! তাই এগিয়ে আসতে হলো ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলকে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কথাগুলো গুছিয়ে নিল লোকটা, তারপর

বলল, 'এই জার্ম ওয়ারফেয়ার বা ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল অ্যাসল্টের বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোথাও কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই। সবাই নিজের নিজের ভাইরাস নিয়ে চোখ পাকাচ্ছে আর স্নায়ুযুদ্ধ চালাচ্ছে একে অপরের বিরুদ্ধে। কিন্তু মাঝখান থেকে কাজ করে বসেছে ড. শরীফ। দুই বছর কঠোর সাধনার পর এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই এই ভ্যাকসিন। ভুল বললাম। ''নেই'' না ''ছিল না'' বলাই উচিত! কারণ তিনদিন আগে রিসার্চ সেন্টার থেকে সরানো হয়েছে এই ভ্যাকসিন। এটাকে কালচার করে পৃথিবীর সবাইকে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।' ভ্যাকসিন ভর্তি স্টীলের টিউবটা ঠেলে দিল লোকটা টেবিলেব উপর। গড়িয়ে চলে এল সেটা রানার নাগালের মধ্যে, কিন্তু ধরল না ওটা রানা। একটি কথাও বলল না সে। শুধু চেয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার ভিতর।

'এটা নিয়ে জেনেভায় পৌঁছে দিতে হবে আপনাকে। পাঁচ হাজার টাকা দেব আমরা আপনাকে এক্ষুণি, কাজ শেষ হলে দেব আরও পাঁচ হাজার! আহার, বাসস্থান ও যাতায়াত খরচা আমরাই বহন করব। বিপজ্জনক মিশন, সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার পক্ষে এটা এমন কিছু কঠিন কাজ বলে মনে করি না আমি। আপনার সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে দেখেছি আমরা, এটা আপনার পক্ষে অতি সহজ কাজ।'

'তাছাড়া জীবাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার মতামত...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনাকে মনোনীত করবার আগে আপনার নীতিগত বৈশিষ্ট্যও বিবেচনা করে দেখেছি আমরা।' একটু যেন অসহিষ্ণু মনে হলো এস.এম. খালেকের কণ্ঠস্বর। 'সবদিক চিন্তা করেই আপনার ওপর এই কাজের ভার দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের কাজের জন্যে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন আপনি।'

'প্রশংসা করে শুধু শুধু লজ্জা দেবেন না। এত প্রশংসা করলে গর্ব হয়ে যাবে আবার আমার।' বলল রানা।

'যাক, এবার পরিষ্কার কথায় আসা যাক—কাজটা কি হাতে নিচ্ছেন, মিস্টার মাসুদ রানা?' বলল লোকটা রানার চোখে চোখ রেখে।

'না।'

'না?' আঁতকে উঠল যেন লোকটা। বলল, 'নিষেধ করছেন? পৃথিবীর মানুষের জন্যে আপনার যে অনুভূতি, যে সমবেদনা, সেটা তাহলে ভুয়ো? শুধু শুধুই ঝগড়া করেছিলেন ডক্টর শরীফের সঙ্গে?'

'শুধু শুধু কেন হবে। তবে দরদাম করবার অধিকার প্রত্যেক ব্যবসায়ীর আছে পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর খুঁজে পাননি আপনারা—তাছাড়া অনেক কথা বলে ফেলেছেন আমাকে! কাজেই চাপ দিলে...'

'তারমানে আপনি বলতে চান কাজটা গ্রহণ করতে অন্য কোন রকম আপত্তি নেই আপনার?'

'ঠিক তাই। অন্য কোন আপত্তি নেই।' মৃদু হেসে বলল রানা।

'কত দিতে হবে?'

'যেতে বিশ, আসতে বিশ। মোট চল্লিশ হাজার

'এটাই কি শেষ কথা?'

'জ্বি। শেষ কথা।'

'আমাদের যদি দু'একটা কথা বলার থাকে...'

'তাহলে বাড়ি গিয়ে বলুন। আমাকে আর কোন কথা বলা বৃথা। বিজনেস ইজ বিজনেস—এর মধ্যে আর অন্য কোন কথা বলার সযোগ নেই।'

কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লোকটা রানার দিকে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে রানার মত একজন লোক টাকার জন্যে এমন চামার হয়ে যেতে পারে। তারপর হঠাৎ একটানে ব্রীফকেসটা আবার তুলে নিল কোলের উপর। কয়েক তাড়া পাঁচশো টাকার নোট বের করল সে ব্রীফকেস থেকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'বিশ হাজার! নিন!'

'নেব। কিন্তু আমার হয়ে একটু কষ্ট করে গুনে দিতে হবে নোটগুলো আমার চোখের সামনে।'

'আশ্চর্য!' বিরক্ত হলো লোকটা যারপর নাই। 'পরিষ্কার বুঝতে পারছি দুই দুটো চাকরি থেকে কেন বরখাস্ত করা হয়েছে আপনাকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তাদের কোন দোষ নেই।' এক, দুই করে গুনতে আরম্ভ করল লোকটা। গোনা শেষ করে বলল, 'হয়েছে? পুরো বিশ হাজার বুঝে পেয়েছেন? খুশি এখন?'

'খুব খুশি।' বলল রানা। ডান দিকের ড্রয়ার খুলল টান দিয়ে, নোটগুলো তুলে রাখল ওর মধ্যে।

ব্রীফকেসটা নামিয়ে রাখার জন্যে ঝুঁকেছিল লোকটা। হঠাৎ কিছু একটা আঁচ করে ঝট্ করে চাইল সে রানার দিকে। বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর দুই চোখ। আতঙ্ক ফুটে উঠল দৃষ্টিতে।

'এটাকে পিস্তল বলে।' বলল রানা আলাপী ভঙ্গিতে। 'এর নাম হচ্ছে ওয়ালথার পি.পি.কে.। ম্যাগাজিনে সাতটা এবং চেম্বারে একটা—মোট আটটা গুলি আছে এতে। সেফটি ক্যাচ এখন অফ। এটার ক্যালিবার হচ্ছে থারটি টু। এর বুলেট আপনার বুকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আপনার পিছনে আপনার যমজ ভাই যদি বসে থাকত তাকেও ভেদ করে ওই দেয়ালে গিয়ে লেগে এক ইঞ্চি পুরু প্লাস্টার খসিয়ে ফেলবার ক্ষমতা রাখে। কাজেই ধীরে ধীরে হাত দুটো মাথার উপর উঠিয়ে ফেলুন।'

দুই

ধীরে ধীরে দুই হাত মাথার উপর তুলল এস.এম. খালেক। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রানার হাতে ধরা ওয়ালথারের দিকে। ঢোক গিলল একবার।

কিন্তু সামলে নিতেও বেশিক্ষণ সময় লাগল না। রানা বুঝে নিল লোকটার ভিতরের ক্ষমতা। জীবনে বহুবার এরকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে লোকটা। এবং রানাও জীবনে বহু লোককে এরকম অবস্থার সম্মুখীন করেছে। তাই আরও সাবধান হয়ে গেল সে। ক্ষীণ একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল লোকটার ঠোঁটে। লোকটা ভয়ঙ্কর।

'হঠাৎ এরকম আশ্চর্য ব্যবহারের কারণ জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাস মাত্র নেই, একটু যেন উষ্মা প্রকাশ পেল। 'আর টাকা নেই আমার কাছে।'

'জানি। টাকাগুলো এখন আমার ড্রয়ারে। এবং প্রতিটি পাঁচশো টাকার নোটের উপর আপনার আঙুলের ছাপ আছে। কাজেই টাকা চাইছি না। বোকামি হয়ে গেছে আপনার গোড়াতেই। আপনার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে আমি রিসার্চ ল্যাবে ছিলাম। কেবল ছিলাম বললে ভুল হবে—চীফ সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে ছিলাম। এবং তার মানে, রিসার্চ ল্যাবের সবকিছু আমার নখদর্পণে।'

'বুঝলাম না। একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

'বুঝবেন। আগে বলুন এই টিউবের ভ্যাকসিন কোন্ ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল?'

'দেখুন, আমি ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলের একজন এজেন্ট মাত্র।'

'জানেন না? তাহলে শুনুন। কয়েকটা ব্যাপারে আপনাকে জ্ঞান দান করা যাক। প্রথমত, রিসার্চ ল্যাবে আজ পর্যন্ত যতগুলো ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে তার একটিও আসলে সেখানে নেই। অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি এলাকায় ইলেকট্রিফায়েড স্টোর রুমে চব্বিশ ঘন্টার কড়া প্রহরার মধ্যে রয়েছে সেগুলো। তাছাড়া আসলে ভ্যাকসিনের জন্যে পৃথিবীর কোন দেশের বিশেষ মাথা ব্যথা নেই—প্রায় সবাই তৈরি করেছে ভ্যাকসিন। কাজেই এই টিউবটা যদি রিসার্চ ল্যাব থেকে চুরি করা হয়ে থাকে, এর মধ্যে ভ্যাকসিন নেই। কোন একটা ভাইরাস আছে এর মধ্যে।' পিস্তল ধরা হাতটা স্থির হয়ে আছে। পাথরের মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে গেছে এস.এম. খালেক! মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে।

'দ্বিতীয়ত, আমার ভাল করেই জানা আছে ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলের লোক হোক আর যেই হোক, রিসার্চ ল্যাব থেকে ভাইরাস সরানো এক কথায় অসম্ভব। অতি ধূর্ত লোকের পক্ষেও অসম্ভব। প্রতিদিন ছ'টার সময় ল্যাবরেটরি থেকে ডক্টর শরীফ যেই বেরিয়ে যান, ওমনি চোদ্দ ঘন্টার জন্যে টাইমক্লক চালু হয়ে যায়—এর আগে আর খুলবে না দরজা। খুলতে হলে যে ওপেনিং কমবিনেশন দরকার তা জানেন কেবল দুইজন লোক—ডক্টর শরীফ, এবং বর্তমান সিকিউরিটি চীফ সাবের খান। কাজেই যদি ওখান থেকে সত্যি সত্যিই এই ভাইরাস সরানো হয়ে থাকে, তাহলে বল প্রয়োগ করে সরানো হয়েছে। কিংবা খুন-খারাপি করে। কাজেই ইনভেস্টিগেশন দরকার।

'তৃতীয়ত, সত্যি সত্যিই যদি এদেশের কোন ক্ষমতাশালী লোক আপনাদের পিছনে থাকত তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করে আমার সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না—ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে এটা নির্বিঘ্নে চলে যেত জেনেভায়।

'এবং সবশেষে, আপনার সামান্য একটা ভুলের কথা উল্লেখ করব। সেটা হচ্ছে আপনার নামটা। ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলের ঈস্ট পাকিস্তান সেক্রেটারি মিস্টার এস. এম. খালেক আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। আমরা সবাই মোটা খালেক বলে খেপাই ওকে। এই গত পরশুদিনও ক্লাবে তাস খেলেছি আমরা একসাথে।'

ভীতি প্রকাশ পেল না লোকটার চেহারায়। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রানার চোখের দিকে। হাত দুটো তেমনি মাথার ওপর তোলা। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এবার? এবার কি করতে যাচ্ছেন আপনি?'

'স্পেশাল Q-4 ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেব আপনাকে। সেই সাথে আমাদের কথাবার্তার একটা টেপও যাবে। এই যে বোতামটা দেখছেন, এটা টিপে দিয়েছিলাম আমি আপনি ঘরে ঢোকার আগেই। আমাদের সব কথা টেপরেকর্ড হয়ে গেছে। বাকি কাজটুকু ওরাই করবে।'

'আপনার ব্যাপারে ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার, বুঝতে পারছি। আরও অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার। যাক, একটা সমঝোতায় তো আসতে পারি আমরা?'

'আমাকে কেনা যায় না।'

'পঞ্চাশ হাজার দিলে?'

'না।'

'এক লাখ দিলে? এক ঘণ্টার মধ্যে যদি এক লাখ টাকা দিই!'

মৃদু হাসল রানা। বাম হাতে রিসিভারটা তুলে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর ঘুরাতে আরম্ভ করল ডায়াল। তিনটে নাম্বার ঘুরাতে না ঘুরাতেই দরজায় টোকা পড়ল দুটো। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল রানার মুখের হাসি।

'ওই কোণায় গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ান।' হুকুম করল রানা চাপা কণ্ঠে। 'কোন রকম কৌশল করবার চেষ্টা করলে গুলি করব। সাবধান!'

পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা কোণের দিকে। উঠে দাঁড়াল ওরা দু'জনেই। কিন্তু কোণে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে দেখা গেল না লোকটার মধ্যে।

'বাইরের এই ভদ্রলোকটি আমাদের দু'জনেরই পরিচিত বন্ধু। আমার মনে হয় কোণে গিয়ে দাঁড়াবার কোন প্রয়োজন...'

'তিন পর্যন্ত গুনব। তারপর গুলি করতে বাধ্য হব। এক...'

দ্বিরুক্তি না করে কোণে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। দরজার কাছে চলে এল রানা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কে?'

'Q-4 ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ। আমি কর্নেল শেখ। দরজা খোলো, রানা।'

'কর্নেল শেখ!' অত্যন্ত পরিচিত নাম। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রাক্তন চীফ-অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানেরই একটি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাখা Q-4 ব্রাঞ্চের চীফ। দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে আলাদা ভাবে মাথা ঘামানোর

প্রয়োজন পড়ায় বছর দেড়েক হলো এই বিশেষ ব্রাঞ্চ তৈরি করেছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান এবং তীক্ষ্ণধী কর্নেল শেখের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব। রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই কর্নেল শেখ। কণ্ঠস্বরটাও মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও সাবধানের মার নেই। কর্নেল শেখের গলার স্বর যদি নকল করে থাকে লোকটা? 'আইডেন্টিটি কার্ডটা ঠেলে দাও দরজার নিচে দিয়ে।'

তিন সেকেন্ডের মধ্যেই দরজার এপাশে চলে এল একটা কার্ড। একনজর চোখ বুলিয়েই বিনা দ্বিধায় দরজা খুলে দিল রানা। কারণ ও ভাল করেই জানে, এই কার্ড নকল হওয়া সম্ভব নয়।

গদাই লশকরী চালে ঘরে ঢুকল খাকী পোশাক পরিহিত প্রকাণ্ড দেহী কর্নেল জাফর শেখ। স্বল্পভাষী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, অত্যন্ত করিৎকর্মা মানুষ, চালচলনে ধীরস্থির, গুরুগম্ভীর। রিসার্চ সেন্টারের চীফ সিকিউরিটি অফিসারকে Q-4 ব্রাঞ্চের চীফের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হয়। যতক্ষণ সব ঠিক আছে ততক্ষণ নাক গলাবে না এরা, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কোন রকম গোলযোগ উপস্থিত হলে সাথে সাথে রিসার্চ সেন্টারটা চলে যায় Q-4 ব্রাঞ্চের কন্ট্রোলে। প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই ব্রাঞ্চের হাতে। পি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া আর কারও কাছে কোন কাজের জন্য জবাবদিহি দিতে হয় না Q-4 ব্রাঞ্চকে।

'ঠিক আছে, রানা,' পিস্তলধরা রানার উদ্দেশে বলল কর্নেল শেখ। 'পিস্তলটা এবার রেখে দিতে পারো। আর কোন ভয় নেই—পুলিস তো এসেই গেছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, শেখ এই পিস্তলের জন্যে লাইসেন্স আমার—আর তোমরা অনধিকার প্রবেশ করেছ আমার অফিস ঘরে।' কোণের দিকে দেখাল রানা মাথা ঝাঁকিয়ে। 'এই লোকটাকে সার্চ করো তারপর পিস্তল রাখব আমি—তার আগে নয়।'

ঘরের কোণে পিছন ফিরে দাঁড়ানো লোকটা ঘুরে দাঁড়াল এবার ধীরে ধীরে। হাত দুটো তোলাই আছে মাথার উপর, কিন্তু মুখে কৌতুকের হাসি। হাসছে কর্নেল শেখের দিকে চেয়ে। কর্নেল হাসছে মিটিমিটি।

'তোমাকে কি সার্চ করবার দরকার আছে, রায়হান?' প্রশ্ন করল শেখ।

'না, স্যার। কোন অস্ত্র নেই আমার কাছে। আল্লার কসম। শুধু শুধু সার্চ করলে সুড়সুড়ি লাগে, স্যার আমার।'

একবার কর্নেল শেখ, আর একবার কোণে দাঁড়ানো এস.এম. খালেক, ওরফে রায়হানের দিকে চাইল রানা। তারপর শোলডার হোলস্টারে পুরে রাখল পিস্তলটা। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে। বোঝা গেল এতক্ষণ তামাশা হচ্ছিল। কিন্তু কি ব্যাপার, কর্নেল শেখ?'

'তামাশা নয়, রানা, রুটিন চেক। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কতখানি জরুরী, একটু পরেই বুঝতে পারবে। এ হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চের একজন ইন্সপেক্টর, অল্প কিছুদিন আগে ফিরেছে পিণ্ডি থেকে। ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হবে, না আমার কথাই যথেষ্ট?'

এই কথার কোন উত্তর দিল না রানা। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে নোটগুলো বের করে আনল সে, তারপর স্টীলের টিউব আর টাকাগুলো রায়হানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দূর হয়ে যান এসব নিয়ে। তুমিও, শেখ। আউট। ইয়ার্কি মারবার জায়গা এটা নয়, এটা আমার প্রাইভেট অফিস। কোন কথা শুনতে চাই না আমি—এবার তোমরা এসো।'

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, রানা,' বলল কর্নেল শেখ। 'এতটা উত্তেজিত হয়ে ওঠা ঠিক হচ্ছে না। সব কথা শুনে…' রানাকে তেড়ে উঠতে দেখে চট্ করে বলল, 'জাস্ট এ মোমেন্ট। যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যেতে চাই। সাবেরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলে তুমি। তার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা তোমার পবিত্র কর্তব্য।'

বরফের মত জমে গেল রানা। বোকার মত চেয়ে রইল সে কর্নেল শেখের মুখের দিকে। যেন কথাটা ওর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে—মানে বুঝতে পারেনি সে। বেরিয়ে যাবার জন্যে কর্নেল শেখ নড়েচড়ে উঠতেই সংবিৎ ফিরে পেল সে। চট্ করে ধরে ফেলল ওর হাত।

'কি বললে! সাবেরের হত্যাকারী! কি বলছ তুমি, শেখ!'

'ঠিকই বলছি। রিসার্চ ল্যাবের সিকিউরিটি চীফ—সাবের খান। গত রাত দুটোর সময় পাওয়া গেছে ওর লাশ C ব্লকের এক নাম্বার ল্যাবরেটরির স্টীলের দরজায় ঠিক সামনেই, করিডরে। সিকিউরিটি গার্ড পেট্রল দিতে গিয়ে…'

একটি কথাও আর ঢুকছে না রানার কানে। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। ব্যস্ত-সমস্ত মতিঝিলের রাস্তা। দ্রুত চলে যাচ্ছে গাড়িঘোড়া। উজ্জ্বল রোদ ঝিক্ করে উঠছে কোন কোন গাড়ির চকচকে পিঠে। কেউ জানে না, ওরা কেউ জানে না, সাবের—রানার অকৃত্রিম বন্ধু সাবের আজ আর নেই। মরে গেছে। মরে গেছে সাবের।

ভয় পেয়েছিল। রানার মনে পড়ল, ভয় পেয়েছিল সাবের খান। কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না কাজটা নিতে। ইনামের আকস্মিক মৃত্যুর পর সিকিউরিটি চীফ হয়েছিল রানা। রানার আকস্মিক পদত্যাগের পর কাজটা নিতে হয়েছিল ওকে উপরওয়ালার চাপে। কোন ওজর আপত্তি টেকেনি ওর। এখন কোথায় সেই উপরওয়ালা? সাবেরের প্রাণবন্ত চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। তিন বছরের মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাবের বাড়ির সামনের লনে অফিস থেকে ফিরেই—বারান্দায় চা হাতে দাঁড়িয়ে স্বামীর ঢং দেখে মিটিমিটি হাসছে তার কোমলস্বভাবা স্ত্রী—রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে হৈ-হৈ করে ডাকল সাবের—আয় দোস্ত, আয়…

হালকা ভাবে হাত রাখল কর্নেল শেখ রানার কাঁধের ওপর। রানা ও সাবেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা আছে তার। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট হিসেবে বহু দুঃসাহসিক অভিযানে একসাথে কাজ করেছে ওরা দু'জন। বহুবার প্রাণ বাঁচিয়েছে একে অপরের।

কিছু একটা সান্ত্বনাবাণী বলতে যাচ্ছিল কর্নেল শেখ, হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা, কিভাবে মারা গেল সাবের?'

'সেটা জানা যায়নি এখনও। লাশের কাছে যেতে দেয়া হয়নি কাউকে। নিয়ম তো জানোই—একবার অ্যালার্ম বেল বাজলে পুরো রিসার্চ ল্যাবরেটরি চলে আসবে স্পেশাল Q-4 ব্রাঞ্চের আওতায়। সমস্ত দায়িত্ব এখন আমার। একজন ডাক্তারকেও লাশের কাছে যেতে দেয়া হয়নি। কেবল সিনিয়র গার্ড লাশের ছয় ফুটের মধ্যে গিয়েছিল—তাও আবার গ্যাস-টাইট স্যুট পরা অবস্থায়। মারা যে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে ছটফট করে মরেছে। মৃত্যুর আগে বমিও করেছে। সিনিয়র গার্ডের অনুমান হচ্ছে, খুব সম্ভব প্রুসিক অ্যাসিড বা সায়ানাইডে মারা গেছে সাবের।'

ফিরে এল ওরা টেবিলের কাছে। রানা বসল নিজের চেয়ারে, সামনের চেয়ারে বসল শেখ, ইঙ্গিত পাওয়ার পরও অল্প একটু ইতস্তত করে বাকি চেয়ারটায় বসল ইন্সপেক্টর রায়হান।

'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছে গার্ড। স্টীলের দরজার জন্যে যে চোদ্দ ঘণ্টার টাইম ক্লক রয়েছে সেটার কাঁটা পরিবর্তন করা হয়েছে। সন্ধে ছ'টা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত চালু থাকে টাইম ক্লক—কিন্তু কে যেন সেটাকে রাত বারোটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত চালু থাকার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ, বেলা দুটোর আগে এক নম্বর ল্যাবের দরজা খোলা যাবে না। অবশ্য ওপেনিং কমবিনেশন জানা থাকলে...'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার চোখ। বুঝতে পেরেছে সে।

'ইন্সপেক্টর রায়হানকে আমার কাছে পাঠাবার উদ্দেশ্যটা কি, শেখ? এত সব বানানো গল্পেরই বা কি অর্থ? আর তুমিই বা ঠিক সময় মত এসে উপস্থিত হলে কি করে?'

'কিছু মনে কোরো না, রানা। কথাটা সাদামাঠা ভাবেই বলছি। দুটো কারণ আছে এর। প্রথমত তোমাকেই সন্দেহ করেছিলাম আমি হত্যাকারী হিসেবে।'

'কি বললে? আরেকবার বলো কথাটা।'

'ছাঁটাই করা হয়েছিল তোমাকে রিসার্চ ল্যাব থেকে। কিন্তু লক্ষ্য রেখেছিলাম আমি তোমার ওপর। তোমার পরবর্তী কার্যকলাপ আবছা ঠেকেছে আমার কাছে। রিসার্চ ল্যাব সম্পর্কিত তোমার মতামতও জানা আছে আমার। এবং এ-ও জানি তুমিই হচ্ছ একমাত্র বাইরের লোক, রিসার্চ ল্যাবের খুঁটিনাটি সবকিছু যার নখদর্পণে। সিকিউরিটি সেট-আপতো জানা আছেই, এক নম্বর ল্যাবের স্টীলের দরজার ওপেনিং কমবিনেশনও তোমার জানা। বাইরে থেকে রিসার্চ ল্যাবে ঢোকা এবং কাজ উদ্ধার করে বেরিয়ে যাওয়া একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। কাজেই...'

'কাজেই তোমার ধারণা আমিই খুন করেছি সাবেরকে।'

'ধারণা নয়, সন্দেহ। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাই সন্দেহ ছিল আমার। অত্যন্ত দ্রুত কাজ করতে হয়েছে আমাকে। তোমার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই রায়হানকে পাঠাতে হয়েছে এবং তার আগে পাঠাতে হয়েছে দুইজন মাইক্রোফোন এক্সপার্টকে; যাতে তোমাদের প্রতিটি কথাবার্তা আমি শুনতে পাই

পাশের ঘরে বসে।

'প্রথম কয়েক মিনিট বেশ ঘাবড়ে দিয়েছিলে কিন্তু তুমি আমাকে।' মৃদু হাসল কর্নেল শেখ। 'যাক, সন্দেহ মুক্ত তুমি এখন। কিন্তু একটু কৌশল না করলে এত সহজে তোমাকে ক্রিয়ার বলে ধরে নিতে পারতাম না।'

'বুঝলাম, বুদ্ধিমান লোক তুমি। কিন্তু এর ফলে হত্যাকারীকে ধরা যাচ্ছে না।'

'যাচ্ছে। এবার আমার দ্বিতীয় কারণটা বলছি। এটা হচ্ছে: তুমি যদি হত্যাকারী না হও তাহলে আমার বিশ্বাস একমাত্র তুমিই খুঁজে বের করতে পারবে কে হত্যাকারী। সাবের মৃত, কাজেই রিসার্চ ল্যাবের সিকিউরিটি সেট-আপ এখন একমাত্র তোমারই জানা আছে! কাজেই তোমাকে এ কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া এক নম্বর ল্যাবরেটরির দরজা খোলার কমবিনেশনও জানা আছে কেবল তোমারই...'

'কেন? ডক্টর শরীফও জানেন ওপেনিং কমবিনেশন।'

'তোমার সামনে ডক্টর শরীফের প্রসঙ্গ তুলতে দ্বিধা করছিলাম এতক্ষণ, আসলে ডক্টর শরীফকে পাওয়া যাচ্ছে না গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে। হাওয়ার মত মিলিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। সোয়া ছয়টায় খাতায় সই করে বেরিয়ে গেছেন ল্যাবরেটরি থেকে। ব্যস, হাওয়া। আর কোন খবরই নেই।'

চমকে উঠল রানা খবরটা শুনে। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলতে আরম্ভ করল। ভয়ঙ্কর এক অশুভ আশঙ্কায় কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। কথা বলেই চলল কর্নেল শেখ।

'তাহলে আমার সঙ্গে টঙ্গি যাচ্ছ তুমি? কি বলো? তোমার সহযোগিতা নাও পেতে পারি মনে করে একটা অক্সি-এসেটিলিন টীম আমি ইতিমধ্যেই রওনা করে দিয়েছি টঙ্গির উদ্দেশে।'

'অক্সি-এসেটিলিন টীম।' বিস্ময় ফুটে উঠল রানার চোখে। 'খেপেছ নাকি তুমি, শেখ?'

'মানে?'

'কখন পাঠিয়েছ?'

'এই ঘণ্টা খানেক হলো। কেন?'

'এক্ষুণি নিষেধ করো। ওই দরজাটা সম্বন্ধে কিছুই জানো না তুমি? আশ্চর্য। এক্ষুণি ফোনে বারণ করে দাও যেন ওই দরজার কাছে কেউ না যায়।'

'কেন?'

'আগে নিষেধ করো তুমি তারপর কারণ ব্যাখ্যা করছি।'

রানার কণ্ঠে জরুরী ভাবটা বুঝতে পারল কর্নেল শেখ। ঝট্ করে তুলে নিল টেলিফোন রিসিভার। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিরল রানার দিকে।

'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার আর কিছুই নয়, দরজাটা স্পেশাল স্টীলের তৈরি। কোন এসেটিলিন যন্ত্র দিয়েই ওটাকে দুই ঘণ্টার আগে নরম করা যাবে না। কিন্তু আসল অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে ভয়ঙ্কর এক বিষাক্ত গ্যাস পোরা আছে দরজার ভিতর। এবং কেবল

তাই নয়, এই দরজার ভিতরে একটা ইনসুলেটার-মাউন্টেড প্লেট আছে, ওটা ছোঁয়া মাত্র টু থাউজেন্ড ভোল্টের ছোট্ট একটা শক খাবে।'

'আমি জানতাম না।' বলল কর্নেল শেখ শিউরে উঠে। 'আমি মনে করেছিলাম...'

'তুমি মনে করেছিলে স্টীলের দরজাটা খুললেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে—তাই না? দরজার ওপাশে ঘাপটি মেরে বসে আছে সাবেরের হত্যাকারী।' মুচকে হাসল রানা। সিগারেট ধরাল একটা। 'একটা সন্দেহ মনের মধ্যে জাগেনি তোমার একবারও যে, যদি কেউ ভিতরে গিয়ে থাকে, তাহলে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিছু একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে তার? অসাবধানতা বশত কোন একটা শিশি কিংবা কালচার ট্যাঙ্ক ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে? ধরা যাক বটুলিনাস টক্সিনের একটা সীলড শিশি ভেঙে ফেলেছে লোকটা। তাহলে? বারো ঘন্টা খোলা বাতাসে না থাকলে এই ভাইরাস অক্সিডাইজড হয় না। তার আগে যে-ই এর সংস্পর্শে আসবে সে-ই মারা যাবে। ভেবে দেখোনি একবার কথাটা?'

হাঁ হয়ে গিয়েছে কর্নেল শেখের মুখ। স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠেছে ওর দৃষ্টিতে। মাথা নাড়ল সে বোকার মত। ভেবে দেখেনি সে এই সম্ভাবনার কথা। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'সেই জন্যেই তোমার সাহায্য আমার এত দরকার, রানা।'

'তোমার দরকার হলে কি হবে, তোমাদের বড় কর্তার দরকার নেই আমাকে। আমার সাহায্য নিতে কিছুতেই রাজি হবে না বুড়ো...'

'আমি অনেক চেষ্টা করে রাজি করিয়েছি বড় কর্তাকে। তোমার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত নিম-রাজি হয়েছে বুড়ো, এখন তুমি রাজি হলেই হয়।'

'আমি রাজি হতে পারি কেবল একটি মাত্র শর্তে।'

'কি শর্ত?'

'আমার কাজে কেউ ডিসটার্ব করতে পারবে না। কারও মাতব্বরি সহ্য করব না আমি।'

'ঠিক আছে। নিজের খুশিমত কাজ করবে। যখন যা সাহায্য দরকার, পাবে তুমি চাওয়া মাত্র। আর কিছু?'

'আর একটা ব্যাপার। মনে রেখো, তোমার বা তোমার বসের খাতিরে একাজ হাতে নিচ্ছি না আমি। আগে গিয়েছে ইনাম, এবার গেল সাবের। এরা দু'জনই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কাজেই যদি নাগাল পাই, আর হত্যাকারীর নাক নকশা যদি ঠিক জায়গা মত না পাও তাহলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

তিন

অনীতার জন্যে একটা নোট রেখে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে আসছিল ওরা

তিনজন। দেখল মিশমিশে কালো বেঁটে খাটো একটি লোক দ্রুত পায়ে আসছে এদিকে। অনীতার কামরার অর্ধেক পর্যন্ত চলে এসেছে। লোকটা যেমন রোগা তেমনি বেঁটে আর তেমনি কালো। খোঁচা খোঁচা গোঁপ-দাড়ি সারা মুখে। দুই চোখে শিশুর সারল্য।

খাকী কোর্তা দেখেই আচম্বিতে ব্রেক কষল লোকটা। তারপর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে চট্ করে ঘুরে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল সমান গতিতে। চলন্ত কলের পুতুলকে যেন কেউ ঘুরিয়ে দিয়েছে—এমনি ভাবে যেন ভুলে অন্য অফিসে ঢুকে পড়েছিল, বুঝতে পেরে বেরিয়ে যাচ্ছে কোন ভদ্রলোক।

'কি খবর, গিলটি মিঞা?' ডাকল রানা।

রানার কণ্ঠস্বর শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল লোকটার। থমকে দাঁড়াল সে, তারপর ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পিছন দিকে। কর্নেল শেখের খাকী কোর্তাটা আবার চোখে পড়তেই দৌড় দেবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় কাছে এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখল রানা।

'কি ব্যাপার, গিলটি মিঞা? কখন এলে? আর কথা নেই বার্তা নেই চম্পট দেবারই বা চেষ্টা করছ কেন?'

'ব্যাপার কিছুই নয়, স্যার। এই অল্প কিছুক্ষণ হয় এইচি। ভাবলুম অনেক দিন দেখা-সাক্কেত নেই, একটু খোঁজ লিয়ে যাই। তা এই দারোগা সায়েবকে দেকেই, বিশ্বেস করুন, কেমন যেন গুলিয়ে গেল মাতাটা। ধড়ফড় করতে আরাম্বো করলো বুকের ভেতর। ভাবলুম, কেটে পড়ি, পরে না হয় এক সোমায়…'

'অনীতার চিঠি পাওনি তাহলে তুমি?'

'পেইচি। চিটি পেয়েই তো এইচি। গতরাতে একটা থ্রি সেভেনটি…' চট্ করে সামলে নিল গিলটি মিঞা। 'একটা কাজ ছিলো হাতে, হঠাৎ অনীতা বৌদির চিটি গিয়ে উপস্থিত। কাজটা ফেলে রেকেই চলে এলুম।'

'বেশ করেছ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার। কিন্তু এখন তো বলা যাচ্ছে না, যেতে হচ্ছে এক জায়গায়। তুমি ইচ্ছে করলে আসতে পারো সাথে। কাজ আছে কিছু?'

'কাজ আর কি? কিচু কাজ নেই, স্যার। দিনের বেলা আবার কাজ কি? তা চলুন স্যার, চলুন কোতায় যাবেন।'

একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে ছিল, কর্নেল শেখকে দেখে দরজা খুলে দিল ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার। ওরা উঠে বসতেই দ্রুত ছুটল গাড়ি টঙ্গির পথে। আধঘন্টা পরই দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের বেঢপ সাইজের প্রকাণ্ড দালান। গায়ের রং কালচে। কেমন যেন গম্ভীর, থমথমে। চারশো গজ লম্বা পরপর তিনটে সমান্তরাল ব্লক, প্রত্যেকটা তেতলা।

ব্লক তিনটের চারপাশে পাঁচশো গজ ফাঁকা। গাছপালা তো দূরের কথা, ছোটখাট ঝোপ-ঝাড় বা উলু খাগড়াও নেই। ছোটখাট ঝোপের আড়ালে হয়তো কোন মানুষ আত্মগোপন করতেও পারে, কিন্তু দুই ইঞ্চি লম্বা ঘাসের আড়ালে কারও আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। তাই চারপাশে পাঁচশো গজ পর্যন্ত সবুজ

ঘাস—তারপর তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

শুধু তারের বেড়া বললে ভুল হবে। এই বেড়ারও একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। পনেরো ফুট উঁচু ঘন কাঁটা তার, ওপর দিকটা বাইরের দিকে বাঁকানো। এতই বাঁকানো যে সবচেয়ে উপরের তারটা সবচেয়ে নিচের তার থেকে চার ফুট বাইরে। বিশ ফুট তফাতে একই রকম আরেকটা কাঁটা তারের বেড়া, তবে এটার মাথাটা ভিতর দিকে বাঁকানো। এই বিশ ফুট এলাকা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে রাতের বেলায় ছেড়ে দেয়া হয় দশটা ট্রেইন্ড্ ব্লাড হাউন্ড, মওকা মত পেলে মানুষ খুন করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করবে না এরা। দ্বিতীয় বেড়ার চার ফুট ওপাশে দুটো প্রায়-অদৃশ্য চিকন তারের আরেকটা বেড়া। দিনের বেলায়ই চোখে পড়ে না, রাতের বেলা একেবারে অদৃশ্য। দ্বিতীয় বেড়া ডিঙিয়ে কেউ যদি লাফিয়ে পড়ে, ঠিক এই দুটো তারের উপর পড়বে—এবং সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে অ্যালার্ম সাইরেন আর সবশেষে আরও দশ গজ তফাতে রয়েছে পাঁচটা তারের মানুষ-সমান উঁচু আর একটা বেড়া। প্রত্যেকটি তার কংক্রিট পোস্টের ভিতর বসানো ইনসুলেটারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, ইলেকট্রিফায়েড।

অতি কৌতূহলী জনসাধারণকে সাবধান করবার জন্যে পনেরো গজ অন্তর অন্তর কয়েক রকমের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনটায় লেখা: সাবধান! বিপদ! কোনটায় বা: প্রবেশ নিষেধ, সংরক্ষিত এলাকা। কোথাও: কুকুর হইতে সাবধান। কোথাও: বিদ্যুৎবাহী তার দ্বারা সংরক্ষিত। আর কয়েকটি সাইনবোর্ডে হলুদের ওপর উজ্জ্বল লাল দিয়ে লেখা: অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করা হইবে। একমাত্র পাগল অথবা সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছাড়া আর কারও সাহস হবে না এই আদেশ উপেক্ষা করা।

ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা কাঁকরের রাস্তায় পড়ল মাইক্রোবাস। রাস্তার দু'পাশে মাঠ ভর্তি উলুখাগড়া আর কাঁটা ঝোপ। কোয়ার্টার মাইল গেলে রিসার্চ সেন্টারে প্রবেশের একমাত্র গেট। কাঠের পোস্ট দেখে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। মেশিন-পিস্তল হাতে দু'জন সার্জেন্ট এগিয়ে এল দু'দিক থেকে। কর্নেল শেখের উপর চোখ পড়তেই স্যালুট করল। উপরে উঠে গেল কাঠের পোস্ট, এগিয়ে চলল গাড়ি। কিছুদূর গিয়ে একটা স্টীলের কোলাপসিবল গেটের সামনে থেমে গেল গাড়িটা। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলে এল ওরা 'রিসেপশন' লেখা একটা ঘরে।

তিনজন অপেক্ষা করছে এই ঘরে ওদের জন্যে। দু'জনকে চেনে রানা ভালভাবেই। ডিপুটি ডাইরেক্টার ডক্টর হাসমত আর ডক্টর শরীফের চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর সুফিয়ান। এই রিসার্চ সেন্টারে ডক্টর শরীফের পরেই ডক্টর হাসমতের স্থান। দোহারা গড়ন, সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, চোখ দুটো চঞ্চল। ঠোঁটের উপর পাতলা একফালি গোঁফ। উচ্চতা মাঝারি, কিন্তু ডক্টর সুফিয়ানের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের পাশে বেঁটেই মনে হচ্ছে। রিসার্চ সেন্টারের জন্মের পর থেকেই আছেন তিনি এখানে। রিসার্চই এঁর জীবন মরণ। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একমাত্র এঁরই কোয়ার্টার রিসার্চ সেন্টারের ভিতরে। ব্যাচেলার মানুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ। আজ পর্যন্ত একদিনও এঁকে সেন্টার থেকে বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। দিনরাত রিসার্চ নিয়ে ডুবে আছেন,

বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্বই লোপ পেতে বসেছে এঁর কাছে। ডক্টর হাসমতের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ডক্টর আবু সুফিয়ান। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। রানার সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে এসেছিল অতি অল্প সময়েই। অত্যন্ত প্রতিভাবান মাইক্রোবায়োলজিস্ট। ভদ্রলোক যেমন চিকন তেমনি লম্বা। কমপক্ষে সাড়ে ছয় ফুট। শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড হলেও এক তিল বাড়তি মেদ বা মাংস নেই। হাড্ডি সর্বস্ব। মনে হয় প্রত্যেকটি হাড় গোনা যাবে বাইরে থেকে। কাঁধের ওপর শরীরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান একটি প্রকাণ্ড মাথা! মাথা ভর্তি ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো দেখে মনের ভাব বুঝবার কোন উপায় নেই—দু'চোখে সবুজ কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগানো। এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় এর কাজে। এখানে সবার মধ্যে অত্যন্ত সম্মানের আসন করে নিয়েছে সে অল্প সময়ের মধ্যেই। আর তৃতীয় ব্যক্তিটিকে চিনতে না পারলেও এর পরিচয় বুঝে নিতে এক সেকেন্ড দেরি হলো না রানার। ভদ্রলোক টঙ্গি থানার ছোট দারোগা।

'আপনি এখানে কেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ। 'আপনাকে ডাকলই বা কে, আর গেট দিয়ে ঢুকতেই বা দেয়া হলো কেন?'

'আমি ডেকেছি।' বললেন ডক্টর হাসমত। 'গত রাতের একটা ঘটনার ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনে এসেছিলেন উনি, আমি দেখতে পেয়ে ভিতরে নিয়ে এসেছি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কেবল কর্নেল শেখ, কোন কথা বলল না। গলা পরিষ্কার করল দারোগা ইয়াকুব আলী।

'ব্যাপারটা আমাকেই বলতে দিন। 'গত রাতে, এই সাড়ে এগারোটার দিকে, এখানকার গার্ড হাউজ থেকে একটা টেলিফোন পেয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। এরা বলছিল এখানকার তিনজন গার্ড জীপে করে এই এলাকার চারদিকে টহল দিতে গিয়ে তাড়া করেছিল একজন লোককে। লোকটা একটা যুবতী মেয়েকে জোর-জবরদস্তি অপমান করবার চেষ্টা করছিল। তারের বেড়ার ঠিক বাইরেই। লোকটা চম্পট দিয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা থানার জুরিসডিকশনে পড়ে বলে ওরা আমাকে টেলিফোন করেছিল। দুটো সেপাই দিয়ে একজন এ. এস. আই-কে পাঠিয়েছিলাম। ওরা কিছুই দেখতে না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল। একটু খট্‌কা লাগাতে আমি নিজে এলাম আজ একবার। যখন দেখলাম যে বেড়াগুলো সব কাটা তখন মনে করলাম এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে।'

'বেড়াগুলো কাটা দেখলেন।' বলল রানা। 'কি করে? বেড়া কাটা তো অসম্ভব ব্যাপার।'

'কিন্তু সত্যিই বেড়াগুলো কাটা।' বললেন ডক্টর হাসমত। 'আমি নিজে দেখে এসেছি দারোগা সাহেবের সঙ্গে গিয়ে।'

'কি করে। সারারাত টহল দিচ্ছে পেট্রল জীপ, কুকুর আছে, অ্যালার্ম ওয়্যার আছে, তার ওপর আছে ইলেকট্রিকের বেড়া। এত সব···'

'হ্যাঁ এতসবের পরও কাটা হয়েছে বেড়া।' বললেন ডক্টর হাসমত। 'নিজেই দেখুন না গিয়ে!' উত্তেজনা চেপে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন ডক্টর হাসমত। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, কেবল তিনিই নন, ডক্টর আবু

সুফিয়ানও ঘাবড়ে গেছে ভয়ানক ভাবে, ভয়ও পেয়েছে।

'যাই হোক,' নিজের কথার খেই ধরল আবার ইয়াকুব আলী, 'এ ব্যাপারে গেটে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম আমি, এমন সময় ডক্টর হাসমত আমার পরিচয় পেয়ে সাহায্য চাইলেন। ডক্টর শরীফকে খুঁজে বের করবার ব্যাপারে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করবার অনুরোধ করলেন উনি আমাকে এই ঘরে ডেকে এনে।'

'তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ ডক্টর হাসমতকে। 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার জানা নেই আপনার? আপনাকে বারবার করে বলে দেয়া হয়নি, যে এই ধরনের যে-কোন ইমার্জেন্সী ব্যাপার ঘটলে হয় সিকিউরিটি চীফ, নয় Q-4 ব্রাঞ্চ ডিল করবে, বাইরের কাউকে জানানো চলবে না?'

'সাবের খানের মৃত্যুতে...'

'আহ্ হা।' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল কর্নেল শেখের। 'আশ্চর্য। এই খবরটাও দিলেন রটিয়ে। বাইরের একজনের জানা হয়ে গেল যে মারা গেছে সাবের খান। নাকি আগের খবরটা জানা হয়ে গেছে আপনার, মিস্টার ইয়াকুব?'

'না, স্যার। এইমাত্র শুনলাম।'

'আর ক'জনকে বলেছেন খবরটা?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ ডক্টর হাসমতকে। কণ্ঠস্বরটা একটু কঠোর শোনাল।

'আর কাউকে বলিনি।' ডাঙায় তোলা মাছের মত অস্থির বোধ করছেন বৈজ্ঞানিক ঝামেলায় পড়ে। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে একটু।

'যাক, বাঁচা গেল।' একটু যেন আশ্বস্ত হলো কর্নেল শেখ! 'কিছু মনে করবেন না, ডক্টর। সিকিউরিটির ব্যাপারে যে কড়াকড়ি নিয়ম আছে, সেটা আমার তৈরি নয়। অনেক ওপরতলা থেকে জারি করা হয়েছে এ আদেশ। কাজেই একটু সাবধানে কথা বলাই ভাল। ডিপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে আপনার এখন করণীয় আর কিছুই নেই। পুরো রিসার্চ সেন্টার এখন আমাদের চার্জে। সাহায্য চাইলে সাহায্য করবেন, নিজে থেকে দয়া করে আর কিছু করতে যাবেন না।'

'কিন্তু C-ব্লক যখন খোলা হবে, আমি সামনে থাকতে চাই।'

'ঠিক আছে, থাকবেন।' রানার দিকে ফিরল কর্নেল শেখ। 'বারো ঘন্টার কথা বলেছিলে, সেটা তো পার হয়ে গেছে। কখন খুলতে চাও?'

একটু চিন্তা করল রানা, তারপর চাইল ডক্টর সুফিয়ানের দিকে।

'এক নম্বর ল্যাবের ভেন্টিলেশন সিসটেম চালু করা হয়েছে?'

'না। কিছুই করা হয়নি। যেমন ছিল তেমনি রাখা হয়েছে সবকিছু। আমরা নিজে থেকে কেউ কিছুই করি না।'

'ভিতরে যদি কিছু, মানে, কোন ভাইরাস কনটেইনার ভেঙে গিয়ে থাকে, এতক্ষণে অকসিডাইজেশন হয়ে যাবে?'

'মনে হয় না। বন্ধ ঘরে সময় লাগবে অনেক বেশি।'

কর্নেল শেখের দিকে ফিরল রানা।

'প্রত্যেকটা ল্যাবরেটরিতে এয়ার ফিল্টারের ব্যবস্থা আছে। বাতাস বাইরে বেরুবার কোন উপায় নেই! বাতাস টেনে নিয়ে যাওয়া হয় একটা এয়ার টাইট

কম্পার্টমেন্টে, সেখান থেকে পরিশোধন করে ফেরত পাঠানো হয়। এই সুইচটা অন করে দিলে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ঢুকতে পারব আমরা এক নম্বর ল্যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল শেখ। ডক্টর সুফিয়ানকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। টেলিফোন করে সুইচ অন করে দেবার হুকুম দিয়ে দিল সে। কর্নেল শেখ ফিরল ইয়াকুব আলীর দিকে।

'রিসার্চ সেন্টারের ভিতরের কিছু তথ্য জেনে ফেলেছেন আপনি, মিস্টার ইয়াকুব, যেগুলো আপনার জানবার কথা নয়। অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের গরম গরম কথাগুলো কি আমার উচ্চারণ করতে হবে, না মনে আছে?'

'মুখস্থ আছে, স্যার।' মৃদু হাসল ইয়াকুব আলী। 'আমার অনিচ্ছাকৃত উপস্থিতি আপনাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে বলে আমি দুঃখিত। যাচ্ছি আমি।'

'ডক্টর শরীফ সম্পর্কে কি ইনভেস্টিগেশন করলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা ইয়াকুব আলীকে।

'গতকাল সোয়া ছয়টার সময় বেরিয়েছেন উনি এখান থেকে। আউট রেজিস্টারে সই আছে। কিন্তু এখানকার সমস্ত বেবীট্যাক্সি আর রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেও জানা যায়নি কোন্‌দিকে গেলেন উনি। ওঁর বাসায় খবর নিয়েছি, গতকাল বাড়ি ফেরেননি উনি...'

'বেশ চট্‌পট্‌ কাজগুলো করছেন দেখা যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আমাদের হয়ে আরও কিছু কাজ করতে হতে পারে। তৈরি থাকবেন।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ইয়াকুব আলী। ডক্টর হাসমত এবং ডক্টর সুফিয়ানও চলে গেল ওয়েটিং লাউঞ্জের দিকে। সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড গোলাম রসুল এসে ঢুকল ঘরে, স্যালুট করল কর্নেল শেখকে। রানাকে দেখে একটু অবাক হলো, কিন্তু মুখে বলল না কিছুই।

'তুমিই প্রথম দেখেছিলে সাবেরের লাশ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি না, খোদাবক্স। আমাকে খবর দিতেই গ্যাস স্যুট পরে কাছাকাছি গিয়ে দেখে এসেছিলাম একবার লাশটা। তারপর ডক্টর হাসমতকে ফোন করে বন্ধ করে দিয়েছি C-ব্লক।'

'ভাল করেছ। কাটা তার দেখেছ তুমি?'

'জ্বি, স্যার। চারজন গার্ড দিয়ে দিয়েছি জায়গাটি পাহারা দেবার জন্যে।'

'গত রাতের সেই নারী ঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে এই তার কাটার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় তোমার?'

'থাকাই স্বাভাবিক। মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করবার জন্যেই এইসব লোক পাঠানো হয়েছিল।'

'মোট কয়জন কাজ করে C-ব্লকে?' এবার জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ।

'ডাক্তার, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, কেমিস্ট, টেকনিশিয়ান নিয়ে মোট ষাট-পঁয়ষট্টিজন।'

'তারা সবাই কোথায়?'

'ওয়েটিং লাউঞ্জে। C-ব্লক বন্ধ দেখে চলে যেতে চেয়েছিল অনেকে, কিন্তু

বসিয়ে রাখতে বলে দিয়েছেন ডক্টর হাসমত। বসে আছে সবাই।'

'বেশ। তুমি ইন্সপেক্টর রায়হানকে পৌঁছে দাও ওখানে। পরিচয় করিয়ে দেবে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলবেন ইন্সপেক্টর, তার ব্যবস্থাও করে দাও। আর যে-কুকুরটা কাল রাতে ডিউটিতে ছিল তার-কাটা এলাকায়, বিশ মিনিট পর সেটাকে পাঠিয়ে দেবে এখানে—জীপের বোকা গার্ডগুলোকেও সঙ্গে পাঠিয়ো। আমরা এবার একটু কাটা বেড়াটা দেখতে যাব।'

রানা, কর্নেল শেখ আর গিলটি মিঞা চলে এল বাইরের কাটা তারের বেড়ার কাছে। পরীক্ষা করল কাটা তার। ইঙ্গিত পেয়ে দূরে সরে গেল গার্ড চারজন।

'কি দিয়ে কাটা হয়েছে তারটা মনে হয়, রানা? করাত না প্লায়ার্স?'

'পেলাস্ দিয়ে কেটেচে।' জবাব দিল গিলটি মিঞা। 'লোকটা আবার বাঁইয়া—বাঁ হাতে লিয়েছিলো পেলাস্টা।'

অবাক হয়ে গিলটি মিঞার দিকে চাইল কর্নেল শেখ। তারপর চাইল রানার দিকে।

'ঠিকই বলেছ, গিলটি মিঞা,' বলল রানা কর্নেল শেখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে। 'কিন্তু লোকটা তার কাটল, অথচ ডিউটিরত ব্লাড হাউন্ড দেখতে পেল না ওকে...'

'দেকেচে।' এবারও জবাব দিল গিলটি মিঞা। 'কুত্তা শালা ঠিকই দেকেচে! কিন্তু উপায় ছিল না কিচুই। লাচার হয়ে এত বড় মারটা হজম করতে হয়েচে ব্যাটাকে।'

'তার মানে?'

'সহজ মানে। বড় কায়দামত পেয়েছিল লোকটা কুত্তাটাকে।'

লোকটার জয়ে এবং কুকুরটার পরাজয়ে আন্তরিক খুশি হয়েছে গিলটি মিঞা। কুকুর মাত্রেই তার শত্রু। লোকটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল সে।

'বড় চালু লোক। এক হাতে খুব করে কাপড় পেঁচিয়ে লিয়েছিলো লোকটা—আরাক হাতে ছিলো একটা হাতুড়ি। হাতটা যেই তারের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়েচে ওমনি গ্যাক করে কেমড়ে ধরেছে কুত্তাটা। ব্যস, দুটো তার একটু ফাঁক করে কুত্তার মাতাটা বাইরে টেনে লিয়ে এসেচে লোকটা। তারপর ধাঁই করে বসিয়ে দিয়েচে এক ঘা চাঁদি বরাবর। আনতে তো পেঠিয়েচেন, পরীক্ষে করে দেকলেই বুজতে পারবেন স্যার,—লরোম হয়ে গিয়েচে শালার ঘিলু।'

'সম্ভব,' মাথা নাড়ল কর্নেল শেখ। 'এবং বুঝতে পারছি এটাই সবচেয়ে সহজ পন্থা। ক্লোরোফর্ম করা বা বিষাক্ত ডার্ট ছুঁড়ে মারা, এসব বইয়ের ব্যাপার। অন্ধকার রাত্তিরে এর চেয়ে আর সহজ কোন উপায় হতেই পারে না।' আরেকবার বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল সে গিলটি মিঞার আপাদমস্তক।

ভিতরের বেড়া, ওয়ার্নিং সাইরেনের তার এবং ইলেকট্রিক ফেন্স পরীক্ষা করল ওরা একে একে। ভিতরের বেড়াটা কাটা, কিন্তু ওয়ার্নিং সাইরেনের তার এবং ইলেকট্রিক ফেন্স অক্ষত রয়েছে। ইলেকট্রিক তারগুলোর ওপাশে বারো ফুট লম্বা বাঁশ পড়ে আছে একটা। বোঝা গেল ওয়ার্নিং সাইরেনের চিকন তার দুটো অতি

সাবধানে এড়িয়ে গেছে অনুপ্রবেশকারী, আর বাঁশের সাহায্যে পোল-ভোল্ট দিয়ে পার হয়েছে ইলেকট্রিক ফেন্স। রানা এবং গিলটি মিঞার মধ্যে চোখাচোখি হলো একবার কর্নেল শেখের অলক্ষ্যে। পরীক্ষা শেষ করে রিসেপশন রুমের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।

'তুমি ঘুরে ফিরে রিসার্চ সেন্টারটা দেখে এসো, গিলটি মিঞা। ফিরে এসে রিসেপশনে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।' মাঝপথে এসে বলল রানা গিলটি মিঞাকে।

'কিন্তুক এঁটকে দেবে না তো আবার কেউ?'

'আটকালে কর্নেল সাহেবের কথা বলবে।'

গিলটি মিঞা চলে গেল। ওরা দু'জন এসে ঢুকল রিসেপশনে। প্রথমেই চোখ পড়ল ওদের কুকুরটার ওপর। মুখে মাযল পরানো। শিকলটা রয়েছে একজন মোটাসোটা প্রহরীর হাতে। ঘরের এককোণে অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন গার্ড। বোঝা গেল এরাই সেই নারীত্রাতা।

এগিয়ে গিয়ে কুকুরটাকে পরীক্ষা করল রানা। সত্যিই! মাথার বেশ খানিকটা জুড়ে ফোলা আর থলথলে মনে হচ্ছে। হাত দিতেই গোঁ গোঁ করে ছটফট আরম্ভ করল। গলার কাছে লোমগুলো সরিয়ে ক্ষত-চিহ্ন পাওয়া গেল। গার্ডকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল অদ্ভুত ব্যবহার করছে হাউন্ডটা আজ সকাল থেকে। মেজাজ করে উঠছে ওর রক্ষকের উপরও। সাধারণত এরকম হয় না।

কুকুর এবং গার্ডকে বিদায় দিয়ে ফিরল রানা পেট্রল জীপের সেন্ট্রিদের দিকে। প্রত্যেকেই রানার চেনা।

'কাল তুমিই চার্জে ছিলে, রওশন?'

'জ্বি, স্যার।' মাথা ঝাঁকাল অল্পবয়সী সেন্ট্রি রওশন।

'কি ঘটেছিল বলো। কিছুই গোপন করবে না।'

'জ্বি, স্যার। রাত সোয়া এগারোটার দিকে এক চক্করের শেষে মেইন গেটে ও. কে. রিপোর্ট করে আবার রওনা দিয়েছিলাম। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ হেড লাইটের আলোয় দেখলাম একজন ভদ্রমহিলা দৌড়াচ্ছে। এলোমেলো চুল, ব্লাউজ ছেঁড়া, শাড়ির আঁচল লুটাচ্ছে মাটিতে। আমি ড্রাইভ করছিলাম। জীপটা থামিয়েই লাফ দিয়ে নামলাম, অন্যেরাও নেমে এল আমার পিছন পিছন। ওদেরকে নামতে বারণ করা উচিত ছিল আমার...'

'তোমার নিজেরও উচিত ছিল জীপ থেকে না নামা!' বাধা দিল কর্নেল শেখ। 'যাক, কি উচিত ছিল না ছিল সেটা না শুনিয়ে ঘটনাটা বলো।'

'দৌড়ে গেলাম আমি মেয়েটার কাছে। হাতে, মুখে কাপড়ে কাদা। ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি বললাম...'

'আগে কখনও দেখেছ মেয়েটাকে?'

'না, স্যার।'

'দেখলে চিনতে পারবে?'

মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'মনে হয় না,

স্যার। চোখ ঢেকে কাঁদছিল...'

'কথা বলেছিল সে তোমাদের সঙ্গে?'

'জ্বি, স্যার। মেয়েটা আমাকে বলল...'

'গলার স্বর চিনতে পারবে? আবার যদি শুনতে পাও তোমাদের মধ্যে কেউ চিনতে পারবে ওর স্বর?'

'না, স্যার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথা বলছিল, আবার শুনলে চিনতে পারব বলে মনে হয় না।'

'আচ্ছা, বোঝা গেল।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কর্নেল শেখ। 'গুণ্ডা আক্রমণের বানানো কাহিনী বলছিল নিশ্চয়ই মেয়েটা, আর ঠিক সেই সময়ই উলু খাগড়ার জঙ্গল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ছুটল একজন রাস্তার দিকে। তোমরাও তিন গর্দভ মেয়েটাকে রেখে ছুটলে ওর পিছন পিছন। তাই না?'

মাথা নেড়ে সায় দিল তিনজনই।

'লোকটার চেহারা দেখতে পেয়েছ?'

'আবছা মত দেখেছি, স্যার। অন্ধকারে চেনা যায়নি।'

'লোকটা নিশ্চয়ই দৌড়ে গিয়ে রাস্তার ওপর রাখা একটা গাড়িতে উঠে চম্পট দিয়েছে? গাড়ির পিছনে কোন নম্বর ছিল না। গাড়িটা চেনাও যায়নি।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রওশন।

'তারপর ফিরে এসে আর মেয়েটিকে খুঁজে পাওনি কোথাও। এই তো তোমাদের গল্প?' দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকানি দেখে বলল, 'এবার যেতে পারো তোমরা। আর ভবিষ্যতে এরকম বীরত্ব দেখাতে গেলে চাকরি তো যাবেই, কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। যাও।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন। খানিকক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করল কর্নেল শেখ—রানার ম্যাচের শব্দ শুনে ফিরে এল বাস্তব জগতে।

'ভয়ঙ্কর এক পাল্লায় পড়া গেছে। রীতিমত গ্যাং ওয়ার্ক। সবকিছু ঘোলা ঠেকছে আমার কাছে, রানা।'

চুপচাপ সিগারেট টানছে রানা। জবাব দিল না।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কর্নেল শেখ। কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল রানার পাঁজরে। 'একঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এক নম্বর ল্যাব খুলবে না? চলো।'

'চলো।'

চার

C-ব্লকের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ডক্টর হাসমত, ডক্টর সুফিয়ান আর সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড গোলাম রসুল কাছেই ছিল, এগিয়ে এল ওদের দেখে। একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঢাকা থেকে আমদানী করা দু'জন ফিঙ্গার প্রিন্ট

স্পেশালিস্ট--তারাও এগিয়ে এল।
'তালা দিয়ে দেয়ার পর আর কেউ ভেতরে ঢোকেনি তো?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ।
'না, স্যার।' জবাব দিল সিকিউরিটি গার্ড। 'দু'জন গার্ড দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম।'
'মাসুদ রানা সাহেব যে ভেন্টিলেশন সুইচ অন করতে বলেছিলেন, ভেতরে না ঢুকে সেটা অন করা হলো কিভাবে?'
'ডুপ্লিকেট সুইচ আছে, স্যার। ইলেকট্রিক রিপেয়ারের দরকার হলে কিংবা মেইনটেন্যান্স চেক করতে হলে যাতে মেইন ব্লকের মধ্যে না ঢুকেও কাজ সারা যায় সেজন্যে টারমিনাল, ফিউয বক্স, জাংশন সব তেতলার একটা ঘরে রয়েছে।'
'গুড। এবার খুলে ফেলো দরজা।'
খুলে গেল দরজা। ঢুকেই বাম দিকের করিডর ধরে এগোলে প্রায় দুশো গজ দূরে এক নম্বর ল্যাবরেটরির স্টীলের দরজা। সারা করিডর জুড়ে কিছুদূর পর পর গ্যাস টাইট দরজার ব্যবস্থা। C-ব্লকে ঢুকবার বা বেরোবার একটি মাত্র দরজা, কাজেই পুরো দুশো গজ হাঁটতে হলো ওদের। পথে আরও ছয়টা স্টীলের দরজা পড়ল ডান পাশে। কোনটা ফটো-ইলেকট্রিক সেল সিসটেমে খোলে, কোনটা আবার পনেরো ইঞ্চি লম্বা এলবো হ্যান্ডেল দিয়ে খোলে।
এক নম্বর ল্যাবের সামনে এসে পৌঁছল ওরা। মাটিতে পড়ে রয়েছে সাবের খান উপুড় হয়ে। প্রকাণ্ড স্টীলের দরজার পাশেই। কিন্তু হাসিখুশি সেই সাবের বলে চেনাই যায় না আর। প্রকাণ্ড শরীরটা কুঁকড়ে পড়ে আছে মাটিতে, অসহায় ভঙ্গিতে। বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা আতঙ্কে--বিস্ফারিত দুই চোখ কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দাঁতে দাঁত চাপা, ঠোঁট দুটো সরে গেছে দাঁতের উপর থেকে যন্ত্রণায়। ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে। খানিকটা বমি করেছে সাবের মৃত্যুর আগে।
নিচু হয়ে বসে কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর হাসমত।
'ঠিকই আঁচ করেছ গোলাম রসুল, সায়ানাইড। হাতের তালুতে একবিন্দু রক্তের দাগও আছে। হ্যান্ডশেক করবার ছলে সায়ানাইড ইনজেক্ট করা হয়েছে ওর শরীরে।'
রানাও দেখল লাল বিন্দুটা। বলল, 'একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। খুনী সাবেরের অত্যন্ত পরিচিত। কেবল পরিচিতই নয়, এমন একজন, যাকে এখানে দেখে কিছুমাত্র আশ্চর্য হয়নি সে, কথা বলবার আগে বা পরে হ্যান্ডশেক করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই খুনী যে-ই হোক, সে যে C-ব্লকের কোন লোক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। যদি তাই না হত তাহলে হ্যান্ডশেক তো দূরের কথা, খুনীর দশ হাতের মধ্যে আসত না সাবের। কাজেই খুব বেশি দূরে খুঁজতে হবে না আমাদের।'
'হতে পারে,' বলল কর্নেল শেখ। 'আবার নাও হতে পারে। ব্যাপারটাকে যত সহজ করে দেখছ অত সহজ নাও হতে পারে। অনেক কিছু সত্য বলে ধরে নিয়ে

এই সিদ্ধান্তে আসছ তুমি। কে জানে, হয়তো সাবেরকে এখানে খুন করা হয়নি—কেউ হয়তো লাশটা ফেলে রেখে গেছে এখানে সবাইকে ভুল পথে চালিত করবার জন্যে। অত্যন্ত ধূর্ত লোকের কাজ এটা—অত সহজ ভাবে দেখলে…'

'সহজ ভাবে দেখবার কারণ আছে। অত রাতে যে কোন লোককে এখানে দেখলে সাবেরের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কেন সন্দেহ করেনি তা বলতে পারব না—কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, সাবেরকে এখানেই হত্যা করা হয়েছে, আর কোথাও নয়।' ডক্টর হাসমতের দিকে চাইল রানা। 'সায়ানাইডে কতক্ষণ লাগে মরতে?'

'বড় জোর পনেরো সেকেন্ড।'

'দেখা যাচ্ছে বমি করেছে সাবের এটুকু সময়ের মধ্যেই।'

'এতেই প্রমাণ হয়, এখানেই মৃত্যু হয়েছে তার। তাছাড়া ওই দেখো দেয়ালে সাবেরের নখের দাগ। পড়ে যাবার সময় দেয়াল খামচে অবলম্বন খুঁজেছিল ও।'

সবাই দেখল দেয়ালের দাগটা। তারপর সাবেরের নখের দিকে চোখ গেল সবার। বাম হাতের তিনটে নখের ভিতর সাদা—দেয়ালের চুন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সবাই সবার দিকে। C-ব্লকের প্রত্যেকটি কর্মচারী এখানে সন্দেহের পাত্র।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন ডক্টর হাসমত, এমন সময় একজন গার্ড এক হাতে একটা চারকোণা বাক্স আর অন্য হাতে কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা তারের খাঁচা নিয়ে এসে নামিয়ে রাখল মেঝের ওপর। তারপর বিনা-বাক্য-ব্যয়ে সবার উদ্দেশে একটা স্যালুট ঠুকে চলে গেল পিছন ফিরে।

'এগুলো নিয়ে এল কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হাসমত।

উত্তর দিল রানা। 'আমি একা ঢুকতে চাই ল্যাবরেটারির ভেতর। এই বাক্সটার মধ্যে ক্লোজড সার্কিট ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ফিট করা গ্যাস-টাইট স্যুট আছে একটা। ওটা পরে ঢুকব আমি ভিতরে। হাতে থাকবে ওই খাঁচাটা। ওর মধ্যে আছে একটা গিনিপিগ। স্টীলের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে তারপর ল্যাবের আসল দরজাটা খুলব আমি। পাঁচ মিনিট পরও যদি গিনিপিগটা বেঁচে থাকে তাহলে বোঝা যাবে ল্যাবের ভিতরে ভয়ের কিছুই নেই।'

বিস্ময় ফুটে উঠল ডক্টর হাসমতের চোখে-মুখে। ডক্টর সুফিয়ানকেও কেমন যেন বিচলিত মনে হলো। ছটফট করছে দু'জন অস্বস্তিতে। কর্নেল শেখ লক্ষ করল না এসব। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের কাজে লাগিয়ে দিল সে। দরজার গোল হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ল ওরা দু'জন। নিচু হয়ে বাক্সটার মধ্যে থেকে বের করল রানা গ্যাস-স্যুট। এমনি সময় হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরল ডক্টর আবু সুফিয়ান। অল্প অল্প কাঁপছে ওর হাত। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলে লাল হয়ে গেছে মুখটা।

'যাবেন না, মিস্টার রানা।' গলার স্বরটা নিচু কিন্তু স্পষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ পেল তাতে। 'দয়া করে যাবেন না ওর ভিতর। আমি নিষেধ করছি!'

একটু যেন অবাক হয়ে চাইল রানা ডক্টর সুফিয়ানের দিকে। এই ল্যাবরেটরিতে সিকিউরিটি চীফ হিসেবে কাজ করতে গিয়ে প্রত্যেকটি লোকের ডোশিয়ারের সাথে পরিচিত হয়েছে সে। ডক্টর আবু সুফিয়ানের কর্মময় অতীতের

সব কথাই জানা আছে রানার। অত্যন্ত প্রতিভাবান এই মাইক্রোবায়োলজিস্টকে শ্রদ্ধা করে না এমন লোক রিসার্চ সেন্টারে খুব কমই আছে। আমেরিকার ফোর্ট ডেট্রিকে গবেষণা করছিল, এবং অত্যন্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিল ডক্টর আবু সুফিয়ান—কিন্তু যেইমাত্র ডক্টর শরীফের ডাক পেয়েছে ওমনি রিজাইন দিয়ে চলে এসেছে দেশে।

অবশ্য এজন্যে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল আমেরিকান সরকারকে। এই বৈজ্ঞানিক যদি এতখানি বিচলিত বোধ করে থাকে তাহলে এর পিছনে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে।

'কেন? ভিতরে যেতে নিষেধ করছেন কেন?' ঝট করে ফিরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। 'আপনার এই অনুরোধের পিছনে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে?'

'আছে।' উত্তর দিলেন ডক্টর হাসমত। অত্যন্ত গম্ভীর তাঁর মুখ। চোখ দুটো ভীত চঞ্চল। 'এক নম্বর ল্যাবের রিসার্চ সম্পর্কে ডক্টর সুফিয়ানের চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। কিছুক্ষণ আগে উনি সবকিছু বলেছেন আমাকে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সব শুনে আমিও ভয় পেয়ে গেছি। আমিও ওঁর সাথে এ ব্যাপারে একমত।' হাসবার চেষ্টা করলেন ডক্টর হাসমত, কিন্তু হাসি ফুটল না, মুখ বিকৃত হলো মাত্র। 'ওঁর মতে এখন ভিতরে ঢোকা উচিত তো নয়ই, যদি সম্ভব হয়, এক নম্বর ল্যাবরেটরির চারদিকে পাঁচ ফুট চওড়া কংক্রিট ওয়াল তুলে চিরতরে এটাকে কবর দিয়ে দেয়া উচিত।'

ভুরু কুঁচকে মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি কথা শুনল কর্নেল শেখ। গম্ভীর হয়ে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ডক্টর সুফিয়ানের দিকে ফিরে বলল, 'অর্থাৎ আপনি চান না যে এক নম্বর ল্যাবের দরজা খোলা হোক। এতে আপনার ওপর আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়তে পারে—একথাটা ভেবে দেখেছেন?'

'এসব রসিকতায় হাসি আসছে না আমার। তাছাড়া এসব কথা আমার ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, কর্নেল জাফর শেখ। এসব ভাববেন আপনারা। আমি সাবধান করছি, এর সঙ্গে কেবল মিস্টার রানারই নয়, আমার-আপনার-সবার নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত আছে।'

'কি রকম?'

'যদি শুনতে চান তাহলে আসুন, ওই ঘরে গিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা গোপনীয়। তাছাড়া এখানে,' চট্ করে একবার সাবেরের লাশের দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল ডক্টর সুফিয়ান, 'মানে এই ধরনের দৃশ্যের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নই আমি। যদি…'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলুন ও ঘরে।' ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত স্পেশালিস্ট দু'জনের দিকে চেয়ে বলল শেখ, 'তোমরা কাজ সেরে চলে যেয়ো বাইরে গোলাম রসুলের সঙ্গে।'

পাশেই একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল সবাই। দরজা বন্ধ করে দিল ডক্টর সুফিয়ান।

'আপনাদের মূল্যবান সময় আমার নষ্ট করা উচিত নয়, কাজেই অত্যন্ত সংক্ষেপে সারব আমি সব কথা।' একটা সিগারেট ধরাল ডক্টর আবু সুফিয়ান এবং

সেই ফাঁকে গুছিয়ে নিল কথাগুলো মনে মনে। 'আজকের এই পারমাণবিক যুগে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে দিন গুনছে থারমোনিউক্লিয়ার হলোকাস্টের জন্যে—যেদিন এই সবুজ পৃথিবী আর বুদ্ধিমান মানবজাতি লুপ্ত হয়ে যাবে চিরতরে।' বার কয়েক ছোট ছোট টান দিল সে সিগারেটটায়। 'কিন্তু আমার মনে সে ভয় নেই! কারণ আমি জানি আণবিক যুদ্ধ ঘটবে না কোনদিনই। ঘটতে পারে না। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ একে অন্যকে নানান ভাবে হুমকি দিচ্ছে। মিসাইল ফিট করে রাখা আছে, কেবল একটি বোতাম টেপার অপেক্ষা। কিন্তু আসলে কারও মনোযোগ আজ আর এসবের মধ্যে নেই। মিসাইলের কথা চিন্তা করতেও ভুলে গেছে আজ ওরা। কপাল কুঁচকে চিন্তা করছে ওরা আমাদের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের কথা। হ্যাঁ, এই রিসার্চ সেন্টারের কথা ভাবছে সবাই, আর মাথার চুল ছিঁড়ছে।' দুটো টোকা দিল আবু সুফিয়ান বামদিকের দেয়ালে। 'এই দেয়ালের ওপাশে আছে এক চরম অস্ত্র। বিশ্ব শান্তি এখন নির্ভর করছে এই অস্ত্রের ওপর। গোটা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন এক ভয়ঙ্কর অমোঘ অস্ত্র আবিষ্কার করেছি আমরা।'

অপ্রকৃতিস্থ হাসি ডক্টর সুফিয়ানের মুখে। দ্রুত কয়েক টান দিল সে সিগারেটে, তারপর মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে আগুনটা নিভিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরাল আরেকটা সিগারেট। 'কথাগুলো অতিনাটকীয় মনে হচ্ছে, তাই না? বাস্তব চিরকালই নাটককে ছাড়িয়ে যায়। কাজেই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অত্যন্ত গোপনীয় এক তথ্য জানতে পারবেন আপনারা এক্ষুণি। ডক্টর হাসমত এবং মিস্টার মাসুদ রানা অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কিছু আগে থেকেই জানেন, তবু আরও একবার ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করবার অনুরোধ করব আমি ওঁদের।

'আমাদের এই রিসার্চ সেন্টারে আমরা চল্লিশ রকমের প্লেগ জার্ম ডেভেলপ করেছি। এর মধ্যে থেকে দুটোর কথা বলব আমি। একটা হচ্ছে বটুলিনাস টক্সিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই তৈরি হয়েছিল এটা পাশ্চাত্য দেশে—এখন আরও অনেক রিফাইন করা হয়েছে। এখন এটা এমন এক পর্যায়ে গেছে এবং এমন এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হাইড্রোজেন বোমা এখন এর কাছে নস্যি। মাত্র ছয় আউন্স বটুলিনাস টক্সিন যদি সমান পরিমাণে ছড়িয়ে দেয়া হয় সারা পৃথিবীতে, তাহলে আজ বারো ঘণ্টার মধ্যে এই গ্রহ থেকে মুছে যাবে মানুষের নাম। একজনও থাকবে না! কল্পনা করতে পারেন?' ঘাম দেখা দিয়েছে ডক্টর সুফিয়ানের কপালে, নাকে আর চিবুকে। একাগ্র কণ্ঠে বলে চলল সে। 'একটা এরোপ্লেন দিন, আর মাত্র এক চিমটি বটুলিনাস পাউডার দিন আমাকে; ঢাকা নগরীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেব আমি আজ সন্ধ্যার মধ্যে। যুদ্ধের জন্যে এমন অস্ত্র আর হয় না। বারো ঘণ্টা খোলা বাতাসে থাকলেই অক্সিডাইজড হয়ে যায় এই টক্সিন—আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এই টক্সিন ছড়িয়ে দেয়ার ঠিক বারো ঘণ্টা পর নির্ভয়ে সৈন্য পাঠিয়ে দেয়া যায় আক্রান্ত দেশে। একটি বুলেটও ক্ষয় হবে না কোন পক্ষের। একটি মানুষও জীবিত থাকবে না। একজনও না।'

পকেট থেকে কম্পিত হাতে আবার সিগারেট বের করল ডক্টর সুফিয়ান।

হাতের কম্পন গোপন করবার চেষ্টা করল না সে। খুব সম্ভব লক্ষও করেনি সে যে তার মনের মধ্যেকার আতঙ্ক প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে সবার সামনে।

'আপনি বলতে চান এই চরম অস্ত্র কেবল আমাদেরই আছে?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। কণ্ঠস্বরটা একটু অস্বাভাবিক লাগল রানার কানে। তবে কি ভয় পেয়েছে কর্নেল শেখও?

'এটা আমাদের সেই চরম অস্ত্র নয়, কর্নেল শেখ। বটুলিনাস টক্সিন কেবল আমরা কেন, রাশিয়া, আমেরিকা, ক্যানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সবারই আছে। ইউরালে গবেষণা করছে রাশিয়া, টরন্টোতে ক্যানাডা, ফোর্ট ডেট্রিকে আমেরিকা, গ্ল্যাসগোতে ইংল্যান্ড, প্যারিসে ফ্রান্স—প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সবাই। বটুলিনাস টক্সিন সবাই তৈরি করেছে—কিন্তু আমরা তৈরি করেছি কালকূট। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে না। কালকূট হচ্ছে পৃথিবীর চরম অস্ত্র। এরই জন্যে পৃথিবীর সবার সদাসতর্ক দৃষ্টি এখন এদের ওপর।'

'ওই আগের টক্সিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর এটা? শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। 'আগেরটাই যথেষ্ট ছিল না?'

'বটুলিনাস টক্সিনের কয়েকটা অসুবিধা আছে। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে কথা বলছি। এই টক্সিন সংক্রামক নয়। হয় নাক দিয়ে নয় মুখ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে একে মানুষের শরীরে। গ্যাস-স্যুট পরে এর আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া বেশির ভাগ বটুলিনাসের বিরুদ্ধেই টিকা আবিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু এই নতুন ভাইরাস—কালকূটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন রাস্তা নেই। দাবানলের মত সংক্রামক এই ভাইরাস, গুজবের মত দ্রুত এর বিস্তৃতি।

'পোলিও ভাইরাস বা ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস থেকে তৈরি করা হয়েছে কালকূট। এর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বিশ লক্ষ গুণ বিশেষ এক প্রক্রিয়ায়—সে সব ব্যাখ্যা এখন না করলেও চলবে, বুঝবেনও না। কিন্তু যেটা সহজেই বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে—কালকূটের ক্ষয় নেই। এর বিরুদ্ধে কোন টিকা তো নেই-ই, এক্সট্রিম হিট বা কোল্ড দিয়েও এটাকে নষ্ট করা যায়নি। এই ভাইরাস অক্সিডাইজডও হয় না। আমরা জানতাম প্রতিকূল পরিবেশে একমাসের বেশি কোন ভাইরাস বাঁচে না, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, কালকূটের আয়ু অনির্দিষ্টকাল। সৃষ্টি করেছি, কিন্তু মারতে পারছি না আমরা এটাকে।'

'কোন টিকা নেই...'

'না। কোন টিকা নেই।' কর্নেল শেখকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল ডক্টর সুফিয়ান। 'এবং টিকা আবিষ্কারের আশাও ত্যাগ করেছি আমরা। কয়েকদিন আগে হঠাৎ ডক্টর শরীফ মনে করেছিলেন কালকূটের টিকা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল সেটা ভুল। কোন আশাই নেই আর। সেজন্যে আমাদের সমস্ত গবেষণা এখন চলেছে অন্য এক ধারায়। আমরা চেষ্টা করছি নির্দিষ্ট আয়ুর কালকূট তৈরি করতে। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন পড়লেও আমরা কালকূট ব্যবহার করতে পারব না। কারণটা সহজ—নিজেরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব তাহলে। কিন্তু যখন আমরা নির্দিষ্ট আয়ুর কালকূট তৈরি করতে পারব, এবং অক্সিডাইজেশনে এর মৃত্যুর

ব্যবস্থা করতে পারব, তখন এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এবং সেদিন পৃথিবীর 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে এই দেশ! এ অস্ত্রের কাছে আণবিক অস্ত্র কিছুই নয়। যত প্রচণ্ড ভাবেই আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হোক না কেন, কিছু লোক রক্ষা পাবেই। হিসেব করে দেখা গেছে, রাশিয়ান সমস্ত আণবিক অস্ত্র যদি একসাথে প্রয়োগ করা হয় আমেরিকার ওপর, তাহলে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে মাত্র সাত কোটি লোক। তার বেশি নয়। পরে অবশ্য র‍্যাডিয়েশনের জন্যে মারা যাবে আরও এক-আধ কোটি। কিন্তু প্রায় অর্ধেক লোক বেঁচে যাচ্ছে। কয়েক জেনারেশনের মধ্যে আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু কালকূট দিয়ে যদি আক্রমণ করা হয় তাহলে কোনদিন আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে না কাউকে। কারণ দাঁড়াবার জন্যে একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।'

'যত দিন তৈরি না হচ্ছে?' ঢোক গিলল কর্নেল শেখ। 'মানে, যতদিন অন্ন আয়ুর কালকূট আবিষ্কার না হচ্ছে ততদিন?' গলাটা ভেঙে এল শেষের দিকে! ভয় পেয়েছে সে।

'ততদিন?' মাথা নিচু করে মেঝের দিকে চাইল ডক্টর আবু সুফিয়ান। তারপর হঠাৎ মাথাটা সোজা করে বলল, 'একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কালকূট তৈরি হয়েছে অত্যন্ত রিফাইন্ড পাউডারের আকারে। গাঢ় নীল এর রং। মনে করুন লবণ তোলার ছোট্ট চামচের এক চামচ কালকূট নিয়ে বেরিয়ে গেলাম আমি এই ল্যাবরেটরি থেকে—বাইরে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে উপুড় করে দিলাম চামচটা। এর ফলে কি ঘটবে জানেন? রিসার্চ সেন্টারের প্রত্যেকটি লোক মারা যাবে এক ঘন্টার মধ্যে, সন্ধে নাগাদ সারা টঙ্গির প্রত্যেকটা লোক মারা যাবে, কাল সকালে ঘুম থেকে কেউ উঠবে না ঢাকায়, এক সপ্তাহের মধ্যে গোরস্থান হয়ে যাবে পুরো ইন্দো-পাকিস্তান। সবাই মারা যাবে—ওয়ান অ্যান্ড অল। মহামারী প্লেগ এর কাছে কিছুই না। পনেরো দিনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ। এর আগেই জাহাজ, উড়োজাহাজ, পাখ-পাখালী, মাছ আর সামুদ্রিক জীবজন্তুর সাহায্যে রওনা হয়ে গেছে কালকূট অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার উদ্দেশে। এক মাসের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে কালকূট। বড় জোর দু'মাস।

'ভেবে দেখুন, কর্নেল, একটু ভাল করে ভেবে দেখুন। মানুষের কল্পনা শক্তিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে না? এই গ্রহের প্রত্যেকটি প্রাণী মারা যাচ্ছে। কেন? কারণ আমি একটা লবণের চামচ উপুড় করেছিলাম। কোন পথ নেই— এই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই। কালকূটকে আটকাবার ক্ষমতা নেই কারও। আজ হোক, কাল হোক; পৃথিবীর সবখানেই পৌছবে গিয়ে কালকূট--হাওয়ায় ভেসে, সমুদ্রের স্রোতে ভেসে। কল্পনা করুন একবার, আজ থেকে দু'মাস পরের পৃথিবীর কথা কল্পনা করে দেখুন।' চাপা কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল ডক্টর সুফিয়ান, 'শান্ত, স্তব্ধ, মৃত এক গ্রহ। নাম তার পৃথিবী।'

ছ্যাঁৎ করে দিয়াশলাই জ্বালল রানা। চমকে উঠল ঘরের সবাই। সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল সে। তারপর বলল, 'আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হয়েছে আশা করি?'

'না। আর একটি কথা আছে। যার জন্যে এতসব কথার অবতারণা।' সরাসরি রানার দিকে চাইল এবার ডক্টর সুফিয়ান। 'ঢুকতে চাইছেন, কিন্তু ওই দরজার ওপাশে কি আছে জানেন?'

'কি আছে?'

'কালকূট! কালকূট আছে এক নম্বর ল্যাবে। আমি ডিটেকটিভ নই, কিন্তু এটুকু বুঝবার বুদ্ধি আমার আছে যে এত কৌশল করে যে-লোক গতরাতে ঢুকেছিল এই ল্যাবে সে শুধু শুধুই আসেনি। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল তার। ভয়ঙ্কর এক বেপরোয়া খেলায় মেতেছে এক বেপরোয়া লোক। ওই ল্যাবের ভিতর সে ভয়ঙ্কর কিছু করে রেখে গেছে কিনা কে জানে?'

'কি বলতে চাইছেন আরেকটু পরিষ্কার করে বলুন, ডক্টর সুফিয়ান।'

'বেপরোয়া লোক, দ্রুত কাজ সারতে হয়েছে তাকে। দেয়াল আলমারির একমাত্র চাবি আমার কাছে। কাঠের ফ্রেমে কাঁচ বসানো আলমারির ডালা। আলমারিতে সাজানো রয়েছে বটুলিনাস টক্সিন আর কালকূটের সীল করা কাঁচের বোতল। এবার ব্যাপারগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে নিন। যদি ভাইরাস চুরি করতেই এসে থাকে লোকটা তাহলে ভাঙতে হয়েছে তাকে আলমারির কাঁচ। তাড়াহুড়োতে হাতের ধাক্কায় এক আধটা বোতল ভেঙে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? আর যদি সেটা কালকূটের বোতল হয়, তাহলে? বলুন, সম্ভাবনা আছে কি নেই?' এক পা কাছে এল সে। 'মিস্টার রানা, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। সম্ভাবনাটা এখানে হাজার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদি কোটি ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও থাকত, তাহলেও সেটা এক নম্বর ল্যাবরেটরিকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিযুক্ত কারণ হত! যদি সত্যি সত্যিই তিনটে কালকূটের বোতলের একটি ভেঙে গিয়ে থাকে এবং আপনার ঢুকবার সময় এক কিউবিক সেন্টিমিটার বাতাস বেরিয়ে আসে বাইরের পৃথিবীতে...' আবেদনের ভঙ্গিতে দুই হাত উপরে তুলল ডক্টর সুফিয়ান। 'মানুষ জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে আমাদের সিদ্ধান্তের উপর। কোন রকম ঝুঁকি নেবার অধিকার আমাদের নেই। আমার একান্ত অনুরোধ দয়া করে খুলবেন না ওই দরজা।'

থামল ডক্টর সুফিয়ান। আধ মিনিটের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করছে সবাই যথাসাধ্য। হঠাৎ ডক্টর সুফিয়ানকেই প্রশ্ন করে বসল কর্নেল শেখ।

'আপনি কি বলেন তাহলে? দরজা খোলা ঠিক হবে না?'

'দরজা খোলা তো উচিত নয়ই, পাঁচ ফুট চওড়া কংক্রিটের দেয়াল তুলে কবর দিয়ে দেয়া উচিত ওটাকে যত শীঘ্রি সম্ভব।'

'ডক্টর হাসমতেরও কি একই মত?'

'হ্যাঁ। কোন রকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।'

এবার রানার দিকে ফিরল কর্নেল শেখ।

'তোমার মতামতও জানা দরকার। দুইজন এক্সপার্ট সায়েন্টিস্টের অভিমত পাওয়া গেছে। এখন তুমি কি বলো, রানা?'

'আমি বলি, মাথা গুলিয়ে গেছে তোমাদের কালকূটের ভয়ে। এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছ যে সহজ ভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। ডক্টর সুফিয়ান যে ভয় করছেন সেটাকে আমি মিথ্যা ভয় বলব না, বলব অমূলক ভয়। ওঁর সমস্ত ভয়ের ভিত্তি হচ্ছে—কেউ ল্যাবরেটরিতে ঢুকে সমস্ত ভাইরাস চুরি করে পালিয়েছে। এটা কল্পনা। আরও খানিকটা কল্পনা যোগ করেছেন উনি এর সঙ্গে—চুরি করতে গিয়ে লোকটা হয়তো এক-আধটা ভাইরাসের বোতল ভেঙে ফেলে থাকতে পারে। এবং সেই ভাইরাস যদি কালকূট হয়ে থাকে তাহলে দু'মাসের মধ্যে পটল তুলবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী। কিন্তু একটা কথা ভাবছেন না আপনারা, লোকটা যদি কালকূট চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে? তাহলে সর্বনাশ ঘটবার সম্ভাবনা হাজার গুণ বেড়ে যায় না?' মৃদু হাসল রানা। 'চোখ থেকে আতঙ্কের পর্দাটা সরিয়ে একবার ভাল করে চেয়ে দেখুন; বুঝবার চেষ্টা করুন। বাইরের পৃথিবীতে ভাইরাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন লোক, এটাই বেশি ভয়ের কথা, না ল্যাবের ভিতর হয়তো কোন বোতল ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে, সেটাই বেশি ভয়ের? সাধারণ যুক্তিতে কি বলে?

'কাজেই ভেতরে ঢুকে জানতে হবে আমাদের সত্যিকার অবস্থাটা। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। চোর এবং খুনী যে-ই হোক ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য আছে ওর। যে করে হোক আটকাতে হবে ওকে। ভেতরে ঢোকা ছাড়া কোন ব্যাপারেই স্পষ্ট কোন ধারণা করা যাচ্ছে না। তাই যাচ্ছি আমি।'

হতবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল সবাই। পাগল নাকি লোকটা! নাকি খোদ শয়তান? ভয় বলতে কিছু নেই। নড়েচড়ে উঠলেন ডক্টর হাসমত—কিছু বক্তব্য আছে তাঁর।

'কিন্তু…কিন্তু…যদি…'

'আপনাদের ভয়ের কিছুই নেই, ডক্টর হাসমত। গ্যাসস্যুট পরে যাচ্ছি আমি ভেতরে। হাতে থাকবে ওই খাঁচা। যদি গিনিপিগটা বেঁচে থাকে, ভাল। যদি মরে যায়, আমি আর বেরিয়ে আসছি না বাইরে। ঠিক আছে? চলবে এতে?'

হাঁ হয়ে গেছে সবার মুখ। অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সহজ, কিন্তু নিজের জীবন নিয়ে…আশ্চর্য!

'অসম্ভব!' বললেন ডক্টর হাসমত। 'আপনি অত্যন্ত সাহসী লোক হতে পারেন, মিস্টার রানা—কিংবা নির্বোধ—যাই হোক, একটা কথা ভুলে যাবেন না, ডক্টর শরীফের অবর্তমানে আমি এই রিসার্চ সেন্টারের চীফ। আমার সিদ্ধান্তই এখানে চরম সিদ্ধান্ত।'

হাসল রানা। 'স্বাভাবিক অবস্থায় তাই, কিন্তু এখন আপনি জানেন, স্পেশাল Q-4 ব্রাঞ্চের হাতে চলে গিয়েছে সমস্ত ক্ষমতা। কাজেই কষ্ট করে আপনার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার দরকার নেই। Q-4 ব্রাঞ্চের চীফ কর্নেল শেখ এখানে উপস্থিত আছেন।'

কর্নেল শেখের জন্যে ইশারাই কাফি। রানার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু ডক্টর আবু সুফিয়ানের বক্তব্যও হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে জিজ্ঞেস করল সে, 'স্পেশাল এয়ার ফিলট্রেশন

ইউনিটের কথা শুনলাম। তার ফলে ভেতরের বাতাস শুদ্ধ হয়ে যাবে না?'

'অন্য কোন ভাইরাস হলে হতে পারে।' জবাব দিল ডক্টর আবু সুফিয়ান, 'কিন্তু কালকূটের বেলায় অসম্ভব। কালকূটের মৃত্যু নেই এবং ক্লোজড সার্কিট ফিলট্রেশন ইউনিটের কাজ হচ্ছে কোন ঘর থেকে দূষিত বাতাস টেনে নিয়ে পরিশোধন করে আবার সেই ঘরে ফেরত পাঠানো। কালকূটকে পরিশোধন করা যায় না।'

আবার বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। চিন্তা করছে সবাই।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কালকূট কিংবা বটুলিনাস টক্সিন-এ আক্রান্ত গিনিপিগ কতক্ষণে মারা যাবে?'

'পনেরো সেকেন্ড।' বলল ডক্টর সুফিয়ান। 'বড় জোর আধ মিনিট। এর পরেও পেশী সঙ্কোচন হয়তো চলবে কিছুক্ষণ। কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে ওর।'

'কাজেই আমাকে খামোকা বাধা দেয়া উচিত নয়। প্রথমে আমি দেখব গিনিপিগটার কি অবস্থা হয়। যদি দেখি ঠিকই আছে, আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করে তারপর বেরিয়ে আসব আমি।'

'রানা।' দায়িত্বশীল অফিসারের মুখোশটা খুলে গেল কর্নেল শেখের। সংযমের বাঁধ হঠাৎ ভেঙে গেছে যেন তার। রানার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল সে, চোখে রাখল চোখ। 'এছাড়া আর কোন উপায় নেই? যেতেই হবে তোমাকে?'

'তুমি গেলে আমি আর যেতাম না!' হাসল রানা। 'কিন্তু ভেবে দেখলাম তুমি দুই সন্তানের পিতা, একজনের স্বামী। আমার ওসব বালাই নেই—মুক্ত পুরুষ। কাজেই যেতে হবে আমাকেই। বীরত্ব দেখাবার জন্যে যাচ্ছি না, বুঝতেই পারছ। যাচ্ছি কর্তব্যবোধে! ভেবে দেখি, যদি সত্যিই কেউ চুরি করে থাকে কালকূট, যে-ই করে থাকুক কাজটা, মাথা খারাপ তার। এই মুহূর্তে ডি. আই. টি বিল্ডিং-এর মাথায় উঠে বোতলগুলো সে একটা একটা করে নিচের রাস্তায় ফাটাচ্ছে কিনা কে জানে? কাজেই...'

'বুঝলাম আপনি একজন মহৎ ব্যক্তি।' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডক্টর সুফিয়ান। 'কিন্তু কি করে বুঝব, গিনিপিগটা মারা গেলেও আপনি বেরিয়ে আসবেন না? হাজার হলেও মানুষ আপনি। চোখের সামনে ওটাকে মারা যেতে দেখলে এবং অক্সিজেন ফুরিয়ে এলেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন আপনি। যদি তার ফলে সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকে মারা যায় তাতে কি এসে যাবে একজন মৃত্যু-পথ-যাত্রীর। দম বন্ধ হয়ে আসলে আপনি কতখানি কর্তব্যপরায়ণ থাকবেন তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'ঠিক বলছেন। সন্দেহ করবার অধিকার আছে আপনার। ধরা যাক আমি বেরিয়ে আসব। আমার পরনে কি থাকবে তখন? গ্যাস-স্যুট পরনে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই। যদি ওই ল্যাবের বাতাস দূষিত থাকে আর আপনার পরনে গ্যাস-স্যুট না থাকে, তাহলে আপনার বেরিয়ে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না।'

'বেশ এবার আসুন সবাই আমার সঙ্গে।' বেরিয়ে এল সবাই ঘর থেকে রানার

পিছন পিছন। করিডরে বেরিয়ে পিছনের একটা দরজা দেখাল রানা আঙুল তুলে। ওই দরজাটা গ্যাস টাইট। দরজাটা বন্ধ করে ওপাশে থাকবেন আপনারা সবাই। সামান্য একটু ফাঁক করে রাখবেন কেবল, যাতে আমার কার্যকলাপ দেখা যায়। যখনই ওই স্টীলের দরজা খুলে বেরিয়ে আসব আমি, আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাবেন আমাকে। পাবেন তো?'

'কি বলছেন একটু বুঝিয়ে বলুন।' বিরক্ত কণ্ঠ ডক্টর হাসমতের।

'বলছি?' একটানে শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। ক্লিক করে অফ হয়ে গেল সেফটি ক্যাচ। 'আঁতকে উঠবেন না, ভয় নেই। এটা রাখুন আপনার হাতে। যখন স্টীলের দরজা খুলে বেরিয়ে আসব তখন যদি আমার পরনে গ্যাস-স্যুট আর ব্রিদিং অ্যাপারেটাস থাকে—বিনা দ্বিধায় গুলি করবেন। বিশ ফুট দূর থেকে মিস হবার সম্ভাবনা নেই। মোট আটটা গুলি আছে এতে, যে কয়টা খুশি ব্যবহার করবেন, তারপর করিডরের এই দরজা বন্ধ করে দেবেন। C-ব্লকের ভিতরেই আটকা থেকে যাবে কালকূট। তারপর দশ ফুট কংক্রিটের দেয়াল তুলে কবর দিয়ে দেবেন পুরো ব্লকটা।'

পিস্তলটা হাতে নিলেন ডক্টর হাসমত দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে। তারপর মনস্থির করে ঝট্ করে মাথা তুলে চাইলেন রানার দিকে।

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এটা ব্যবহার করব আমি প্রয়োজন হলেই?'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। বুঝব না কেন, আমিই তো বোঝালাম আপনাকে।'

মৃদু হাসল রানা, কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিল না কেউ। এগিয়ে এল ডক্টর সুফিয়ান। রানার দুই হাত ধরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মাফ করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আপনাকে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি কেবল সাহসীই নন, আপনি মহৎ লোক।'

'কথাটা দয়া করে একটা সমাধি প্রস্তরে খোদাই করে লাগিয়ে দেবেন আমার কবরের দশ ফুট চওড়া দেয়ালের গায়ে।'

পাঁচ

যেন চিরতরে বিদায় দিচ্ছে, এমনি ভাবে বিদায় দিল ওরা রানাকে। কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট দু'জন গোলাম রসুলের সঙ্গে। একে একে সবাই চলে গেল করিডরের দরজার ওপাশে। গম্ভীর থমথমে সব মুখ, আড়ষ্ট। কিছু একটা বলা দরকার বুঝতে পারছে যেন সবাই, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। সব শেষে গেল কর্নেল শেখ। একা রইল রানা। মেঝের ওপর পড়ে আছে সাবের খানের লাশ।

দেহের ওপর অস্বস্তিকর ভাবে এঁটে বসেছে গ্যাস-স্যুট, ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের মাত্রাধিক অক্সিজেনের ফলে শুকিয়ে এসেছে গলাটা। কিংবা হয়তো অন্য কোন

কারণে। ভয় পেয়েছে সে? মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে কি ভয় পেল রানা? তা নইলে বাইরের পৃথিবীর সবুজ মাঠ, মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, বিরহ-মিলন-সবকিছুকে এত দূরের জিনিস মনে হচ্ছে কেন? হু হু করে উঠছে কেন মনটা সোনালী রোদ আর রূপালী জ্যোৎস্নার জন্যে। জীবনটা কি এতই মূল্যবান? আশ্চর্য! এতই তীব্র এই মায়াবী পৃথিবীর আকর্ষণ!

মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল রানা এসব চিন্তা। শেষ বারের মত চেক করে নিল গ্যাস-স্যুট, মাস্ক আর অক্সিজেন সিলিন্ডার। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল স্টীলের দরজার সামনে। অত্যন্ত জটিল এক কম্বিনেশন বানান করে চলল ডায়াল ঘুরিয়ে। আধ মিনিট পর ঘটাং করে ভারী একটা শব্দ পাওয়া গেল দরজার মধ্যে থেকে। শেষবার ডায়াল ঘুরাতেই শক্তিশালী ইলেকট্রো ম্যাগনেট টেনে তুলে ফেলল ভারী সেন্ট্রাল বোল্ট। গোল চাকার মত হ্যান্ডেলটা তিন পাক ঘুরিয়ে ধাক্কা দিতেই ধীরে ধীরে খুলে গেল আধ টন ওজনের স্টীলের দরজা।

গিনিপিগের খাঁচাটা তুলে নিল রানা, তারপর যত দ্রুত ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা! ভেতর থেকে গোল হ্যান্ডেলটা তিন পাক ঘোরাতেই ক্লিক করে অটোমেটিক লক হয়ে গেল দরজার।

এর পরই ল্যাবরেটরিতে ঢুকবার ফ্রস্ট্রেড গ্লাস ডোর। রাবার সীলড। দেরি করে লাভ নেই। এগিয়ে গিয়ে পনেরো ইঞ্চি এলবো হ্যান্ডেলটা চাপ দিয়ে ঠেলা দিল রানা। খুলে গেল দরজা।

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। লাইট জ্বালার দরকার হলো না। উজ্জ্বল ওভারহেড নিয়ন বাতিটা জেলে রেখেই চলে গেছে অনুপ্রবেশকারী। হয়তো অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল ওকে এখান থেকে, তাই লাইটের দিকে লক্ষ দেবার সময় হয়নি তার।

রানাও লাইটের দিকে লক্ষ্য দিল না। এই মুহূর্তে তার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছে গিনিপিগটা। গিনিপিগের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছে সে। দৃষ্টি সরাতে পারছে না চেষ্টা করেও। একটা বেঞ্চের ওপর খাঁচাটা নামিয়ে ওপরের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানা ওটার দিকে। যেন সম্মোহন করছে ওটাকে।

পনেরো সেকেন্ড। ডক্টর সুফিয়ান বলেছে বড় জোর ত্রিশ সেকেন্ড। এক দুই করে গুনে চলল রানা মনে মনে। প্রতিটা সেকেন্ড যাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে ঘন্টা বাজছে কানের পাশে। ঠিক পনেরো সেকেন্ড যেতেই তড়াক করে এক লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেলো জন্তুটা। সাথে সাথে লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ডটাও। রানার মনে হলো এক লাফে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দশ হাত তফাতে পড়েছে হৃৎপিণ্ডটা। পড়ে ধুকপুক করছে প্রবলভাবে। ঘেমে উঠছে রানা। রবার গ্লাভসের ভিতর ভিজে গেছে হাতের তালু—জিভ শুকিয়ে কাঠ। কয়েক সেকেন্ড ভুল হয়ে গেল গুনতে।

ত্রিশ সেকেন্ড। কালকূটের বোতল ভেঙে গিয়ে থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল গিনিপিগটার। কিন্তু ভূত বাবাজী এখন পিছনের দুই পায়ে ভর

দিয়ে বসে ছোট্ট দুই অস্থির হাতে তুমুল বেগে নাক ঘষছে।

আরও আধ মিনিট সুযোগ দিল রানা ওটাকে। কিন্তু মরবার কোন আগ্রহই দেখা গেল না প্রাণীটার মধ্যে। হাঁফ ছাড়ল রানা। অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। তবু আরও দুটো মিনিট দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে নেয়াই উচিত।

খাঁচাটা খুলে গিনিপিগটাকে ধরে বাইরে বের করে আনল রানা। একেবারে তরতাজা রয়েছে ব্যাটা। এক ঝটকা দিয়ে হাত থেকে ছুটে লাফিয়ে নামল সে নিচে, তারপর ছুট দিল চেয়ার টেবিলের তলা দিয়ে। বেশ কিছুদূরে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে নাক ঘষল খানিকক্ষণ, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল একছুটে কয়েকটা বেঞ্চের তলায়। মুচকে হাসল রানা, তারপর একটানে মাস্ক এবং ব্রিদিং অ্যাপারেটাস খুলে ফেলে শ্বাস নিল বুক ভরে।

ওয়্যাক করে বমি হয়ে যাবার যোগাড় হলো রানার। দুর্গন্ধ, ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনকেও হার মানিয়ে দেয়, ঘরের ভিতরে এমনি তীব্র দুর্গন্ধ। গিনিপিগটার অমন পাগলের মত নাক ঘষার কারণ বোঝা গেল স্পষ্ট।

নাক টিপে ধরে এগোল রানা। আধ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেল সে যা খুঁজছিল। লাইট নেভানোর কথা কেন মনে ছিল না অনুপ্রবেশকারীর—কেন এত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়েছিল, বুঝতে পারল রানা স্পষ্ট। প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়েছে সে এখান থেকে। নষ্ট করবার মত এক সেকেন্ড সময়ও ছিল না আর হাতে।

ডক্টর শরীফকে আর খোঁজার দরকার নেই। মেঝের উপর শুয়ে আছেন তিনি। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা অ্যাপ্রন গায়ে, চশমাটা খুলে পড়ে আছে মাথার পাশে। মৃত। যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে মুখ। সাবেরের মতই অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছেন ডক্টর শরীফ। তবে সায়ানাইডে মৃত্যু হয়নি তাঁর। সারা শরীর নীল হয়ে গেছে চোখ দুটো পর্যন্ত আতঙ্কে নীল। বীভৎস লাগছে দেখতে বিস্ফারিত দুই চোখ। বিকট দুর্গন্ধ।

আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে গেল রানা। কিন্তু স্পর্শ করল না সে মৃতদেহটা মৃত্যুর কারণ আঁচ করতে পেরেছে সে, কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে স্পর্শ করা ঠিক হবে না। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল সে। ডক্টর শরীফের ডান কানের পাশে ছোট্ট একটা কাটা চিহ্ন। মৃত্যুর আগে শক্ত কোন জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল ডক্টর শরীফের কানের পাশে।

দেয়ালের কাছে আরও একটা জিনিস লক্ষ করল রানা। গাঢ় নীল কাঁচের টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা—একটু দূরে লাল একটা প্লাস্টিক সীল। কোন বোতল ভাঙা হয়েছে এখানে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মেরে। বোতলে কি ছিল বোঝা গেল না

পাশের ঘরে ঢুকল রানা রাবার সীলড দরজা খুলে। অসংখ্য ইঁদুর, খরগোশ, গিনিপিগ রাখা আছে খাঁচার মধ্যে। সারা ঘর জুড়ে কেবল প্রাণী আর প্রাণী। ছোট ছোট লাল চোখ মেলে চাইল সবাই রানার দিকে। পাশের ঘরে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, দিব্যি আরামে আছে ওরা. এদের কোন ক্ষতি হয়নি। দরজা বন্ধ করে ল্যাবরেটরি ঘরে ফিরে এল রানা।

দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। যদি কিছু ঘটবার হত তাহলে ঘটে যেত এতক্ষণে। কিছুই হয়নি যখন এখনও, হবার আশঙ্কা খুবই কম। তবু আরও পাঁচটা মিনিট ব্যয় করল রানা ল্যাবরেটরির ভিতর। তারপর গিনিপিগটাকে তাড়া করে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল। ওটাকে আবার খাঁচায় পুরে খাঁচা হাতে বেরিয়ে এল রানা ল্যাব থেকে। বাইরের স্টীলের দরজাটা খুলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ভুলেই গিয়েছিল রানা, গ্যাস-স্যুট পরে বাইরে বেরোলেই গুলি করবেন ডক্টর হাসমত। হয়তো লক্ষই করবেন না যে মাস্ক এবং ব্রিদিং অ্যাপারেটাস ব্যবহার করছে না সে। গ্যাস-স্যুটটা খুলে রেখে বেরিয়ে এল রানা বাইরে।

পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর হাসমত। সোজা রানার বুকের দিকে ধরা আছে সেটা। রানার মনে হলো আগেই ওঁকে বলে দেয়া উচিত ছিল যে ওয়ালথারের ট্রিগার হচ্ছে হেয়ার-ট্রিগার। সামান্য ছোঁয়া লাগলেই গুলি বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বলল সে, 'অল ক্লিয়ার। ভিতরের বাতাস পরিষ্কার।'

পিস্তল নামিয়ে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর হাসমত। খুলে গেল দরজাটা।

'ওয়েলকাম, ব্রেভ-ম্যান। থ্যাঙ্ক গড, আপনাকে জীবিত দেখতে পাব ভাবিনি, ভেবেছিলাম বেহেস্তে মিট করে অ্যাপোলজি চেয়ে নেব।'

হাসল রানা। বলল, 'আপনার অ্যাপোলজির জন্যে বেহেস্তে গিয়ে অপেক্ষা করছেন আরেকজন। চলে আসুন সবাই ভেতরে।'

কথাটা বলে আবার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকল রানা। সবচেয়ে আগে ঘরে ঢুকল কর্নেল শেখ। ঢুকেই নাক কুঁচকে বলল, 'এমন বিকট গন্ধ কিসের?'

'বটুলিনাস!' জবাবটা এল ডক্টর হাসমতের কণ্ঠ থেকে। হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখের চেহারা। ফিস্ ফিস্ করে বললেন আবার, 'বটুলিনাস!'

'কি করে বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গন্ধ। গন্ধেই বুঝতে পেরেছি। মাস খানেক আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল একজন টেকনিশিয়ান। এই একই গন্ধ!'

'আরও একটা নাম লিখতে হবে আপনাদের অ্যাক্সিডেন্টের খাতায়। নামটা হচ্ছে: ডক্টর মাহমুদ শরীফ। আসুন এই দিকে।'

চমকে উঠল সবাই। কথা বলল না কেউ। রানার পিছনে পিছনে এগোল ঘরের একটা কোণের দিকে। মৃতদেহটা দ্রুত একবার পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল শেখ।

'কাল সাড়ে ছয়টায় তাহলে বেরিয়ে গেল কে?' নিজের মনেই প্রশ্ন করল সে। 'কানের পাশে কাটা দাগ কেন?'

উত্তর দিল রানা। 'বেরিয়ে গিয়েছিল ডক্টর শরীফের ছদ্মবেশে তাঁর প্রেতাত্মা। প্রথমে পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘা মেরে অজ্ঞান করে নেয়া হয়েছিল এঁকে। তারপর ভাইরাসের একটা বোতল এই দেয়ালের গায়ে আছড়ে ভেঙে ছুটে বেরিয়ে গেছে লোকটা ঘর থেকে।'

'পিশাচ!' ভারী গলায় বললেন ডক্টর হাসমত। 'নরকের পিশাচ।'

রানা এগিয়ে গেল ডক্টর সুফিয়ানের দিকে। একটা লম্বা টুলের ওপর বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে সে। সারা শরীর কাঁপছে তার বেতস পাতার মত। কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল রানা। 'একটু সামলে নিন, ডক্টর সুফিয়ান। বেশিক্ষণ এই ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে হবে না আপনাকে। একটু সাহায্য করবেন না আমাদের?'

'নিশ্চয়ই।' নিরুৎসাহ ভারী কণ্ঠে বলল ডক্টর সুফিয়ান। তারপর চাইল রানার দিকে। দুইগালে জলের ধারা। 'উনি···উনি আমার গুরু ছিলেন, মিস্টার রানা। বলুন, কি সাহায্য করতে হবে।'

'ভাইরাসের আলমারিটা একটু চেক করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। ভাইরাসের আলমারি।' ভীত দৃষ্টিতে চাইল সে একবার ডক্টর শরীফের মৃতদেহের দিকে। 'ভুলেই গিয়েছিলাম। চলুন, এক্ষুণি দেখছি।'

একটা দেয়াল-আলমারির দিকে এগিয়ে গেল ডক্টর সুফিয়ান। হাতল ধরে টান দিল বার কয়েক। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বন্ধ। তালা লাগানোই আছে।'

'আপনার কাছে চাবি আছে না?'

'হ্যাঁ। একটা মাত্র চাবি আছে এই আলমারির। এবং সেটা আছে আমার কাছে। এই চাবি ছাড়া এ আলমারি খোলা অসম্ভব। খুলতে হলে ভাঙতে হবে। কাজেই কেউ হাত দেয়নি এতে।'

'হাত না দিলে ডক্টর শরীফ মারা গেলেন কিসে? ম্যালেরিয়ায়? খুলুন আলমারি।' অধৈর্য হয়ে বলল রানা।

কাঁপা হাতে চাবি ঘুরাল ডক্টর সুফিয়ান। প্রত্যেকটি চোখ এখন ওর হাতের উপর নিবদ্ধ। দু'পাট খুলে গেল দরজার। হাত বাড়িয়ে একটা চৌকোণা বাক্স বের করে আনল সে বাইরে। ঢাকনি তুলে ঝুঁকে পড়ল বাক্সের উপর। হঠাৎ ঝুলে পড়ল তার কাঁধ দুটো, মাথাটা যেন নিচু হয়ে গেল একটু—লিক হয়ে গেছে যেন গাড়ির চাকা।

'নয়!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ডক্টর সুফিয়ান। 'একটাও নেই! নয়টা ছিল, সব গায়েব। ছয়টা ছিল বটুলিনাস—তারই একটা ব্যবহার করেছে সে ডক্টর শরীফের ওপর।'

'আর তিনটে?' রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। 'বাকি তিনটে?'

'কালকূট!' কাঁপা গলায় বলল ডক্টর সুফিয়ান। 'কালকূট ছিল। নেই

ছয়

রিসার্চ সেন্টারের অফিসার্স মেসে খাওয়া দাওয়া সেরে নিল ওরা। খাওয়ার রুচি ছিল না কারও। দুই দুইটা বীভৎস মৃতদেহ চোখের সামনে দেখে কর্নেল শেখেরও রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মুখের। শুধু গোগ্রাসে গিলে চলছিল গিলটি মিঞা। দুই ঘন্টা

ধরে পুরো রিসার্চ সেন্টারে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, কাজেই খিদেও লেগেছিল। ডক্টর হাসমত একটু আধটু মুখে তুলেছিলেন, কিন্তু প্লেটের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল ডক্টর সুফিয়ান, কিচ্ছু খেতে পারল না। মৃদু কণ্ঠে আলাপ করছিল রানা ডক্টর হারুন আর ডক্টর সাদেকের সঙ্গে।

'চৌদরি সায়েব যে কিচুই মুখে তুলচেন না?'

হঠাৎ প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা সুফিয়ানের দিকে চেয়ে। জবাব দিল না ডক্টর সুফিয়ান, শুধু চেয়ে রইল কিছুক্ষণ গিলটি মিঞার দিকে। একটু পরেই উঠে চলে গেল সে বাথরুমে। যখন ফিরে এল, কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। সবাই বুঝল উঠে গিয়ে বমি করে এসেছে ডক্টর সুফিয়ান। খাবার টেবিল থেকে একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে, সিগারেট ধরাল।

কাজ শেষ করে ফিরে এল ইন্সপেক্টর রায়হান। এতক্ষণ জবানবন্দি নিয়েছে সে C-ব্লকের প্রত্যেকটি কর্মচারীর। একটা প্লেট নিয়ে বসে পড়ল সে গিলটি মিঞার পাশে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্পেশালিস্টরা এল আরও পরে। বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিল ওরা।

খাওয়া শেষ করে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করল রানা। মেইন গেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গতকাল সন্ধ্যায় আউট রেজিস্টারের চার্জে ছিল রশিদ আহমেদ। তাকে ডাকিয়ে এনে প্রশ্ন করল কয়েকটা, সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড গোলাম রসুলের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলল কিছুক্ষণ। ইন্টারনাল গার্ডদের কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলল সে।

গতকাল রাত এগারোটার পরে আর কেউ সাবের খানকে দেখেনি। এগারোটার রাউন্ড সেরে সে তার কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল। C-ব্লক থেকে ঠিক একশো গজ দূরে দোতলায় সিকিউরিটি চীফের কোয়ার্টার। কোয়ার্টার থেকে একটা কাঁচের স্কাই লাইট দিয়ে C-ব্লকের লম্বা করিডরটা পরিষ্কার দেখা যায়। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা আলো জ্বলে করিডরে, কাজেই সহজেই অনুমান করা গেল, C-ব্লকের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেই খোঁজ নেবার জন্যে ঢুকেছিল অত রাতে সাবের ওখানে। কিন্তু ডক্টর শরীফের ব্যাপারটা ভালমত বোঝা গেল না। ডিউটিতে যারা ছিল তারা সবাই বলছে ডক্টর শরীফকে ঠিক সোয়া ছয়টায় বেরিয়ে যেতে দেখেছে ওরা, তাছাড়া খাতায় তো সই আছেই। কিন্তু তাহলে এক নম্বর ল্যাবের ভিতর পাওয়া গেল কি করে ওঁর লাশ?

টেলিফোন এল। দারোগা ইয়াকুব আলী জানাচ্ছে যে একটা মরিস মাইনর গাড়ি পাওয়া গেছে ডক্টর সাদেকের বাড়ির কাছাকাছি একটা আম বাগানে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে। নাম্বার প্লেট নেই সেটায়। আর টাঙ্গাইলের থানা জানাচ্ছে যে একটা মরিস মাইনর গাড়ি চুরি গেছে বলে এক ভদ্রলোক এজাহার দিয়েছেন থানায়। সন্ধে সাতটার সময়ে চুরি গেছে সেটা।

আবার একবার ঘুরে এল রানা কাঁটাতারের বেড়া যেখানে কাটা হয়েছে সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পায়চারি করল সেখানে চিন্তামগ্ন চিত্তে আসলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজেছে সে একটা বিশেষ জিনিস। খুঁজে বের করে জুতোর ফিতে বাঁধার

ছলে দেখে নিয়েছে সে সেটা ভাল করে। রিসেপশনে ফিরে এসে ফোন করল রানা কয়েক জায়গায়।

ঠিক তিনটের সময় রানার ফোক্স-ওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেড নিয়ে পৌঁছে গেল অনীতা গিলবার্ট রিসার্চ ল্যাবের সামনে। কর্নেল শেখের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিলটি মিঞাকে সাথে করে চড়ে বসল রানা পিছনের সীটে। গাড়ি ছেড়ে দিল অনীতা।

'কোন্‌দিকে যেতে হবে?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল অনীতা।

'সোজা গুলশান।'

সারা রাস্তায় আর একটি কথাও বলল না রানা। চোখ বুজে পড়ে রইল সীটে হেলান দিয়ে। গভীর চিন্তামগ্ন সে। গিলটি মিঞার সাথে বক বক করতে করতে চলল অনীতা দক্ষ হাতে স্টীয়ারিং ধরে।

গুলশানে পৌঁছল গাড়ি। রানার নতুন বাসা। অনীতা চলে যেতে চেয়েছিল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে, বারণ করল রানা।

'তোমাদের দু'জনের সঙ্গেই কথা আছে আমার। একটু বিশ্রাম করে নাও, চা খেতে খেতে সব কথা ভেঙে বলব। সন্ধের সময় বেরোতে হবে আমার সঙ্গে।'

'জো হুকুম।'

রাঙার মা দেশে গেছে বেড়াতে, তাই তার অনুপস্থিতিতে রান্নাঘরের মালিক এখন মোখলেস উদ্দিন তালুকদার। সামনের লনে চেয়ার টেবিল পেতে দিয়েছে সে তিনজনের জন্যে। কিন্তু গিলটি মিঞা বসল না চেয়ারে, সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে! চা নাস্তা দিয়ে গেল মোখলেস। সমস্ত ব্যাপার ভেঙে বলল রানা ওদেরকে। আজ সন্ধ্যার প্ল্যানের কথাও বলল।

'উঁহু, অসম্ভব।' বলল অনীতা বিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হতে হবে শুনে। 'টেডি কামিজে বউ সাজা যায় নাকি? শাড়ি পরতে হবে! আর তার জন্যে যেতে হবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে। অন্তত দেড় ঘন্টা লাগবে আমার তৈরি হতে। তাছাড়া চান-টান করে স্নিগ্ধ না হতে পারলে মানাবে কেন আমাকে বউ হিসেবে? কি রকম রুক্ষ বাউণ্ডুলে হয়ে আছে চেহারাটা দেখছ না?'

'চান করলেও বাউণ্ডুলে স্বভাব তোমার যাবে না।' বলল রানা।

'যাবে, স্যার।' মত প্রকাশ করল গিলটি মিঞা। 'শাড়ি পরে কপালে একটা টিপ দিলে অনীতা বৌদিকে যা মানাবে না। এক্কেবারে সুচিত্রার···'

'বৌদি! আমি আবার বৌদি হলাম কবে?' অবাক হলো অনীতা গিলটি মিঞার সম্বোধন শুনে।

'হননি একনও, জানি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? একটা কলমা বই তো নয়। যা বলছিলুম, শাড়ি পরলে এক্কেবারে সুচিত্রার মতন, বুজলেন বৌদি, এক্কেবারে···'

'তুমিই একমাত্র বুঝলে, তোমার দাদা বুঝল না কোনদিন, আর বুঝবেও না। যাক, কিন্তু এখন শাড়ি পাই কোথায়?'

'আচে। পঁচিশ-তিরিশটা ফাস্‌-কেলাস শাড়ি বেলাউজ আচে একটা

স্যুটকেসের মধ্যে! আমার ঘরে, খাটের তলায়।'

রানাও অবাক হলো একটু, তারপর মনে পড়ল। মাঝে গুজব রটেছিল একবার, বিয়ে করেছে রানা। খবরটা পেয়ে লিউ ফু-চুং পাঠিয়েছিল শাড়িগুলো কলকাতা থেকে। যত্ন করে রেখে দিয়েছিল সেগুলো রাঙার মা—বৌ এলে পরবে। স্বভাব কৌতূহলী গিলটি মিঞার চোখ এড়ায়নি সেটা।

অনীতা চলে গেল বাড়ির ভিতর শাসনের ভঙ্গিতে রানাকে একটা বাঁকা চাউনি দিয়ে। আরেক কাপ চা ঢেলে নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। গিলটি মিঞাকে বুঝিয়ে দিল তার কাজ। দুই ঘণ্টা ধরে রিসার্চ ল্যাবে ঘোরাঘুরি করে কি দেখতে পেয়েছে রিপোর্ট দিল গিলটি মিঞা! কিছু পাওয়া যায়নি। ডক্টর হাসমতের কোয়ার্টারের অন্দরে-বাইরে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। গিলটি মিঞা রিপোর্ট শেষ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস যোগাড় করতে গেল বাড়ির ভিতর।

লাল হলুদে মেশানো একটা চমৎকার নাইলেক্সের শাড়ি আঁট সাঁট করে পরে নেমে এল অনীতা বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে। গায়ে কালো সিল্কের ব্লাউজ। মাথা না ভিজিয়ে গা ধুয়ে নিয়েছে সে এইটুকু সময়ের মধ্যেই। মুখে সামান্য প্রসাধন, চোখে কাজল, কপালে লাল টিপ। সত্যিই স্নিগ্ধ কোমল একটা ভাব ফুটে উঠেছে চেহারাটায়। জামাকাপড় মানুষকে অনেক পরিবর্তন করে দেয়। সেই বুদ্ধিমতী, বেপরোয়া, ঋজু ব্যক্তিত্ব সম্পন্না অনীতা গিলবার্ট বলে চেনাই যাচ্ছে না। চমৎকার মানিয়েছে ওকে বাঙালী সাজে। এই প্রথম রানা অনুভব করল, অনীতা সত্যিই সুন্দরী।

কাছে আসতেই কনক সেন্টের মিষ্টি গন্ধ নাকে এল রানার হালকাভাবে। খশখশ শাড়ির শব্দ তুলে পাশের চেয়ারে বসল অনীতা আরাম করে।

'কেমন লাগছে, বস?'

'অপূর্ব। আজ রাতে বাড়ি ফেরা চলবে না তোমার। এটা অফিশিয়াল অর্ডার!'

'যাহ্। পাজি কোথাকার। অনেকদিন পরিনি তো অস্বস্তি লাগছে কেমন যেন। দেখো তো, ব্লাউজটা আঁটো হয়ে গেছে না একটু?'

গায়ের আঁচল সরিয়ে দেখাল অনীতা। জিভটা শুকিয়ে এল রানার। বুকের ভিতর গুড় গুড় করে বেজে উঠল আদিম জংলী ঢাকের বাদ্য। হাঁ করে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। অনীতার শরীরের সঙ্গে এঁটে বসা ব্লাউজটার দিকে, তারপর ঢোক গিলে বলল, 'ওই ব্লাউজ গায়ে ফিট করতে হলে তোমাকে একটু শ্রিঙ্ক করতে হবে, নীতা। এখন দয়া করে ঢাকো ওগুলো, মাথাটা খারাপ করে দিয়ো না আমার। অনেক কাজ পড়ে আছে আজ।'

'প্রথমেই যাবে কার বাড়িতে?'

'ডক্টর সাদেক। ওখান থেকে যাব ডক্টর হারুনের ওখানে।'

'সত্যি সত্যিই আমাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছ নাকি?'

'কিছুই বলব না। যে যা খুশি যেন ভেবে নিতে পারে সেজন্যে আবছা রাখব তোমার পরিচয়।'

'ডক্টর সাদেককে সন্দেহ করবার কারণ কি? গাড়িটা তার বাড়ির কাছে তো আর কেউ রেখে আসতে পারে? অবশ্য এমনও হতে পারে নিজেই বুদ্ধি করে নিজের বাড়িটার সামনে রেখেছে গাড়িটা। তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। আসলে ডক্টর হারুনের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি আছে বলে প্রথমে যাচ্ছি ডক্টর সাদেকের ওখানে। ডক্টর হারুন একজন প্রতিভাবান রিসার্চ কেমিস্ট হতে পারে, কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে অত্যন্ত বেহিসেবী। নিজের ওপর এত বেশি আস্থা তার যে মাস তিনেক আগে হঠাৎ জমানো সব টাকা খাটিয়ে বসল সে শেয়ার মার্কেটে। কোম্পানি ডুবল, সেই সঙ্গে ডুবল সে-ও। টাকাগুলো উদ্ধার করবার জন্যে শুনেছি বাড়ি বন্ধক দিয়ে রেস খেলেছিল। সে টাকাও গেছে। কাজেই তার সম্পর্কে একটু ভালমত খোঁজ নেয়া দরকার।'

টঙ্গি ব্রিজ পার হতেই একটা মোটর সাইকেল চলতে আরম্ভ করেছে গাড়ির পিছন পিছন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। লক্ষ করল রানা, কিন্তু কাউকে বলল না কিছু। সিনেমা হলটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামাল রানা। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল মোটর সাইকেলটা। ওয়ান ফিফটি সি. সি. কাওয়াসাকি মোটর সাইকেল। আরোহীকে চেনা গেল না, মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল।

ডক্টর আবু সুফিয়ানের বাড়ির কাছে নেমে গেল গিলটি মিঞা। গাড়ি এগিয়ে চলল টঙ্গির একটা আবাসিক এলাকার দিকে। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা ডক্টর সাদেকের প্লাস্টার খসে পড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর একতলা বাড়ির সামনে। অনীতার কাঁধে হাত রাখল রানা।

'সাবধান। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কাজে নেমেছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল অনীতা।

গাড়ি থেকে নামার আগেই খুলে গেল বাড়ির দরজা। খুব সম্ভব আগেই তৈরি হয়ে ছিল ডক্টর সাদেক, ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেয়েই বেরিয়ে আসছে দরজা খুলে। রানাকে দেখে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখের চেহারা। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই—C-ব্লকের সাথে জড়িত প্রত্যেকটি লোকেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাবে রানাকে দেখে। প্রথমত তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে এই ভেবে, দ্বিতীয়ত রিসার্চ সেন্টার থেকে ডিসচার্জ করে দেয়ার পর আবার আজ এখানে রানার ঘোরাঘুরি করবার কারণ বুঝতে না পেরে—দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে।

'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল ডক্টর সাদেক। 'এখানে আপনাকে আশা করিনি। সারাদিনে এক হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আপনাদের লোকের কাছে—আরও কি বাকি রয়ে গেছে দুই একটা? যদি থাকে দয়া করে নিচু গলায় কথা বলবেন। আমার মা অসুস্থ।'

খবরটা জানা ছিল রানার। আজ বলে নয়, গত তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী ডক্টর সাদেকের মা—হঠাৎ ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ডক্টর সাদেকের ওপর। তিন ভাই, ছয় বোন—ডক্টর সাদেকই সবচেয়ে বড়। ভাই-বোনেরা সবাই লাইন দিয়ে স্কুল, কলেজ,

ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। যা বেতন পায় সব শেষ হয়ে যায় সংসারের খরচ চালাতেই। বাধ্য হয়ে কলেজ ডিঙোবার পর দুটি বোনের পড়া ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে—বাড়িতেই থাকে, বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি এখনও।

ডক্টর সাদেকের পিছু পিছু বসবার ঘরে ঢুকল রানা, রানার পিছনে অনীতা। অনাড়ম্বর আসবাব—কয়েকটা পুরানো স্টাইলের কারুকার্য করা পিঠ উঁচু চেয়ারের বসবার জায়গায় চৌকোণা তুলোর গদি পাতা, একটা সস্তা দামের কাঠের টেবিল। বসল ওরা।

দুলে উঠল ঘরের ভেতরের দিকের পর্দা। ঘরে ঢুকলেন ডক্টর সাদেকের বৃদ্ধা মা। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধা মনে হয়, হাতের চামড়া ঢিলে, নীল রগ ফুটে উঠেছে। একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। ক্লান্ত ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে দিল ডক্টর সাদেক। রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে শীর্ণ একটা হাত তুলে বললেন, 'বসো, বাবা।' অনীতাকে দেখে বললেন, 'বাহ্, ফুটফুটে সুন্দর বউ তো তোমার! এসো, মা, আমার কাছে এসে বসো!'

বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বসল অনীতা। রানার দিকে সরাসরি চাইলেন এবার তিনি।

'সাদেকের কাছে শুনলাম সব। বড় ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে তোমাদের আপিসে।' একটু থামলেন তিনি, হাসবার চেষ্টা করলেন। 'ওকে কি গ্রেফতার করতে এসেছ, বাবা? সারাদিন খাওয়া হয়নি ওর।'

'আপনার ছেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা মাত্র যোগসূত্র আছে। সেটা হচ্ছে, দুর্ভাগ্যবশত উনি এক নম্বর ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন! আমরা ওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে সন্দেহমুক্ত করবার চেষ্টা করছি।' বলল রানা বিনয়ী ভঙ্গিতে।

'ওকে সন্দেহমুক্ত করবার কোন দরকার নেই, বাবা।' দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা। 'আমি জানি, এসব ব্যাপারে ওর কোন হাত নেই।'

'ঠিক বলছেন। আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু কর্নেল শেখের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়। পুলিসের কাজ পুলিস করবে। অনেক কষ্টে কর্নেলকে রাজি করিয়ে আমি নিজে এসেছি! নইলে ওদের কোন অফিসার এসে বিরক্ত করত আপনাদের।'

'কেন কাজটা করতে গেলে, বাবা?' একটু যেন তীক্ষ্ণ শোনাল বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর।

'কারণ আমি আপনার ছেলেকে ভাল করে চিনি। Q-4 ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টররা চেনে না। তারা নানান ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন করে মিছেমিছি ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলত আপনাদের।'

'তা ঠিক, বাবা। তবে প্রয়োজন হলে তুমি যে পুলিসের চেয়ে কম কঠোর হবে না, এটুকু বলে দিতে পারি আমি। সাদেকের কপাল ভাল যে এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন পড়বে না।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধা। এইটুকু কথা বলেই হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি। 'এসব কথা বলার জন্যে কিছু আবার মনে কোরো না, বাবা। মায়ের মন তো, থাকতে পারলাম না বিছানায়। যাক, তোমরা কাজের কথা বলো, আমি আর বৌমা গল্প করি গিয়ে। তুমি, মা আমাকে ধরে একটু বিছানায় দিয়ে আসবে? আমার দুটো মেয়েই এখন রান্নাঘরে।'

'নিশ্চয়ই।' উঠে দাঁড়াল অনীতা। একহাতে জড়িয়ে নিয়ে গেল বৃদ্ধাকে পাশের ঘরে।

ওরা আড়াল হতেই ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিল ডক্টর সাদেক। 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রানা। মা আসলে…'

বাধা দিল রানা। 'মা আসলে মা-ই। ওঁর জন্যে আপনার বিব্রত হতে হবে না, ডক্টর সাদেক। আমার হয়ে কথা বলবার জন্যে মা যদি দয়া করে বেঁচে থাকতেন, আমি ধন্য হতাম।' মুখটা একটু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডক্টর সাদেকের। কাজের কথায় এল রানা। 'কাল সারা রাত বাড়িতেই ছিলেন বলেছেন আপনি ইন্সপেক্টর রায়হানকে। কথাটা ঠিক! আপনার মা এবং বোনেরা সাক্ষ্য দেবেন?'

'ঠিক হোক আর বেঠিক হোক আমার স্বপক্ষে তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন এটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'স্বাভাবিক! কিন্তু জেরার সামনে টিকতে পারবেন না তাঁরা বেঠিক হলে। পাঁচ মিনিটে বেরিয়ে যাবে সত্যটা। কজেই আপনি যদি সত্যিই এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকতেন তাহলে এই ঝুঁকি নিতে পারতেন না। আপনার কথা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা তাই পঁচানব্বই ভাগ। কিন্তু আপনি সারারাত ঘরেই ছিলেন একথা কি হলপ করে বলবেন আপনার মা এবং বোনেরা?'

'তা বলতে পারবেন না। মা ঘুমিয়ে পড়েন সাড়ে আটটা ন'টার দিকে, বোনেরাও বড় জোর সাড়ে দশটা পর্যন্ত জাগে। আমি ঘন্টা দুয়েক ছাতে কাটিয়ে সাড়ে বারোটার দিকে ঘুমোতে যাই। গতকাল এর ব্যতিক্রম হয়নি।'

'ছাতে মানে আপনার অবজারভেটরী তো? শুনেছি ওটার কথা। কিন্তু সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আপনি ছাতেই যে ছিলেন তার কোন প্রমাণ আছে?'

'না কোন প্রমাণ নেই।' ভুরু কুঁচকাল ডক্টর সাদেক। 'কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় কি? আমার একটা সাইকেলও নেই, আর অত রাতে এই শহরে রিকশা বা বাস চলে না। কি করে যাব আমি? সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাকে যদি এই বাড়িতে দেখা যায় তার মানে সোয়া এগারোটার মধ্যে আমি কোন অবস্থাতেই পৌঁছতে পারি না রিসার্চ সেন্টারে। এখান থেকে ঝাড়া পাঁচ মাইল দূর।'

'বুঝলাম। একটা কথার জবাব দিন। আপনি জানেন কি কৌশলে কাজটা করা হয়েছে? মানে শুনেছেন কিছু? খুনী এবং চোর যাতে নির্বিঘ্নে পালাতে পারে সেজন্যে মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং মনোযোগ আকর্ষণকারীরা পালিয়েছিল টাঙ্গাইল থেকে চুরি করে আনা একটা মরিস মাইনর গাড়ি করে—এ ব্যাপারে শুনেছেন কিছু?'

'টুকরো টুকরো কিছু কিছু শুনেছি। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ চুপ করছে সবাই, আবার ফিসফাস কানাঘুষোও চলছে। গুজব ছড়াচ্ছে চারদিকে।'

'আপনি জানেন, যে সেই মরিস মাইনর গাড়িটা পাওয়া গেছে এ বাড়ির একশো গজের মধ্যে?'

'একশো গজের মধ্যে!' চমকে উঠল ডক্টর সাদেক। তারপর অন্যমনস্কভাবে

চেয়ে রইল কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে। 'এটা আমার পক্ষে একটা দুঃসংবাদ!'

'তাই কি?'

একটু চিন্তা করল ডক্টর সাদেক। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, 'না। এখন বুঝতে পারছি এটা দুঃসংবাদ নয়, বরং সুসংবাদ।'

'কি রকম?'

'ক'টার সময় চুরি গিয়েছিল গাড়িটা?'

'সন্ধে সাতটায়।'

'টাঙ্গাইল থেকে গাড়ি চুরি করে আনতে হলে আমার টাঙ্গাইল যেতে হয়—সময়ে কুলায় না। সোয়া ছয়টায় রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে যদি সোজা টাঙ্গাইল রওনা দিতাম গাড়ি চুরির উদ্দেশ্যে, সাতটার আগে পৌঁছাতেই পারতাম না ওখানে। কাজেই সাড়ে দশটার পর ওই গাড়িতে করে রিসার্চ সেন্টারে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর আমিই যদি দোষী হতাম, তাহলে নিজের বাড়ির কাছাকাছি এনে ফেলে রাখতাম না গাড়িটা। এবং তৃতীয়ত, আমি গাড়ি চালাতে জানি না।'

'বাহ্, এই তো মোক্ষম যুক্তি! অকাট্য।'

'আরও! আরও অকাট্য যুক্তি আছে তো আমার।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ডক্টর সাদেক। 'আশ্চর্য! একবারও মাথায় আসেনি কথাটা আগে। চলুন, আমার সঙ্গে ছাতে, অবজারভেটরীতে।'

ছাতের চিলেকোঠায় উঠে গেল রানা ডক্টর সাদেকের পিছন পিছন। Perspex cupola-তে সেট করা একখানা রিফ্লেক্টার টেলিস্কোপ। ঘরের একাংশ কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। 'এই আমার একমাত্র হবি।' বলল ডক্টর সাদেক গর্বের সঙ্গে। 'আমি পৃথিবীর অনেকগুলো অ্যাসট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার তোলা ছবি ছাপা হয়। 'অ্যামেরিকান সাইন্স ডাইজেস্টে মাঝে মাঝেই আমার আর্টিকেল ছাপা হয়। গতকাল রাত দশটার পর থেকে জুপিটারের রেড স্পট আর স্যাটেলাইট Io-র নিজের ছায়া নিজেই গোপন করবার ছবি তুলেছি আমি। একটা নয়—কয়েকটা। এই দেখুন, আমাকে এইসব ছবি তুলে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করে ব্রিটিশ অ্যাসট্রোনমিক্যাল মান্থলির এডিটর ডানিয়েল কোহেনের চিঠি।'

চিঠিটায় চোখ বুলাল রানা। বর্ণে বর্ণে সত্যি।

'এবার ছবিগুলো দেখতে পারেন।' কালো পর্দার ওপাশে চলে গেল ডক্টর সাদেক। রানা বুঝল, ওটাই ওর ডার্ক রুম। কয়েকটা ছয় বাই আট ইঞ্চি ছবি হাতে বেরিয়ে এল ডক্টর সাদেক। ছবিগুলো হাতে নিল রানা, কিন্তু মর্ম বুঝল না। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর ছোট বড় হরেক রকম সাদা দাগ—পান খেয়ে কারও সাদা পাঞ্জাবীর পিঠে পিক ফেললে যেমন দেখতে হবে, অনেকটা সে রকম। 'অপূর্ব এসেছে না ছবিগুলো?' জিজ্ঞেস করল ডক্টর সাদেক উৎসাহী কণ্ঠে।

'সেটা আপনার কোহেন সায়েব বলতে পারবেন, আমার কাছে তো জঘন্য লাগছে। আচ্ছা, এই ছবি দেখে কি কারও বলে দেয়া সম্ভব ঠিক করে কখন কোথায় তোলা হয়েছে এগুলো?'

'নিশ্চয়ই। এই জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে এলাম এখানে এই বাড়ির ল্যাটিচুড আর লঙ্গিচুড বের করে নিয়ে যে কোন অ্যাসট্রোনমার পাঁচ মিনিটে বলে দিতে পারবে ঠিক কখন তোলা হয়েছে এই ছবিগুলো। নিয়ে যান, এগুলো নিয়ে যান আপনি সাথে করে।'

'তার দরকার হবে না।' ফিরিয়ে দিল রানা ছবিগুলো। হাসল একটু। 'এগুলো সেই ব্রিটিশ জার্নালে পাঠিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছে করলে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছাও জানাতে পারেন তাদের। যথেষ্ট সময় নষ্ট করা গেছে, এবার যেতে হবে আমাকে।'

ডক্টর সাদেকের ছোট বোন হাসিনার সঙ্গে গল্প করছিল অনীতা বৈঠকখানায় বসে। রানাকে দেখে ছোট্ট করে সালাম দিল হাসিনা। অল্প কথায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অনীতাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল রানা। আকাশের সাদা মেঘ কালচে হয়ে গেছে সবার অজান্তে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি হতে পারে। কামিনী ফুলের মাদক গন্ধ এল নাকে। দ্রুত কাজ সারার প্রয়োজন বোধ করল রানা। বৃষ্টির আগেই ডক্টর হারুনের সাথে কথাবার্তা সারতে হবে।

'তুমি উল্লেখযোগ্য কিছু জানতে পারলে, বেগম সাহেব?' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। তেমন কিছুই জানতে পারিনি। আমার কাছে চমৎকার লাগল পরিবারটিকে। বিত্ত নেই, কিন্তু সংস্কৃতি আছে, সংযম আছে, সহজ ভদ্রতাবোধ আছে…'

'হ্যাঁ। তাছাড়া মোটামুটি চলনসই দেখতে মেয়েকে "ফুটফুটে সুন্দর" বলবার ঔদার্য আছে। আর…'

'খবরদার!' চোখ পাকিয়ে ঘুসি তুলল অনীতা। 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে খুনখারাবি হয়ে যাবে। তুমি মনে করেছ আমাকে দেখতে সুন্দর বলেছে বলেই গদগদ হয়ে গিয়ে ওদের প্রশংসা করছি? মোটেও না। সুন্দরকে মানুষ সুন্দর বলবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমার মত সুন্দরী ক'টা আছে সারা দেশে?'

'একটাও না। অন্তত আজ রাত্রিটুকু জোর গলায় বলব একথা। ভজিয়ে ভাজিয়ে যদি কাছে রাখা যায়…'

'উঁহু। মিষ্টি কথায় আজ আর চিঁড়ে ভিজবে না তোমার মুখে এক, মনে আর।'

'ঠিক বলেছ মুখে বলছি "চলনসই"—মনে মনে কি ভাবছি বলো দেখি?'

'জানি না, যাও একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া লোক তুমি, রানা' কপট উষ্মা অনীতার কণ্ঠে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার রিপোর্ট তো শুনলে না শেষ পর্যন্ত।'

'কি বলবে আমার জানা আছে কায়ক্লেশে চলছে ওদের সংসার আগামী বছর মেজো ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরোলে সচ্ছলতা আসবে কিছুটা এদিকে মায়ের অসুখ চরম পর্যায়ে পৌঁছেচে—এখন যায় কি তখন যায়। ডাক্তার

বলেছে, মারী গিয়ে থাকলে আরও দশ বছর আয়ু বেড়ে যাবে ওঁর। কিন্তু সংসারের এই টানাটানির মধ্যে তাঁকে মারী পাঠাতে হলে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে যায়—এজন্যে গোঁ ধরেছেন তিনি সংসার ছেড়ে কোথাও যাবেন না, তাতে মৃত্যু হয় হোক। এই তো তোমার তথ্য?'

'তুমি জানোই যদি সব, তাহলে আমাকে শুধু শুধু বউ সাজিয়ে...'

'শুধু শুধু কেন হবে, একটা কলমা বই তো নয়, হয়তো...উহ্!'

বাম গালে রাম চিমটি খেয়ে থেমে গেল রানা। থেমে গেল গাড়িটাও।

'অ্যাই পাজি... কি হচ্ছে...আহ্ ছাড়ো...'

আর একটি কথাও বলবার উপায় রইল না অনীতার। দুই মিনিট চুপচাপ। ঝড়ের মত শ্বাস বইছে অনীতার, গরম হয়ে উঠেছে কান, গাল। একহাতে জড়িয়ে ধরল সে রানার গলা, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে কাত হয়ে বসল। টিপ্ করে খুলে গেল ব্লাউজের একটা বোতাম, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে রানাকে।

'ছিঃ, লক্ষ্মী...রাস্তার উপর কি পাগলামি করছ।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অনীতা। গলার স্বর কেমন ঝাপসা শোনাচ্ছে।

আবছা অন্ধকার মত জায়গাটা। রাস্তার দু'পাশে খাদ, তার ওপাশে জংলা মত। শিউলী আর পিপুলের ভারি সুগন্ধ মদির করে তুলেছে চারপাশ। রানার বাম হাতটা তুলে নিল অনীতা নিজের হাতে।

হেসে উঠল রানা। 'কোথায় পাগলামি করছি? আমি তো গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করছি আসলে গিলটি মিঞার জন্যে। চুপচাপ বসে না থেকে একটু ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিলাম, এই।' রুমাল বের করে ঠোঁটে লেগে যাওয়া রঙ তুলে ফেলল রানা ঘষে।

'কিন্তু তোমার ব্যস্ততা দেখেই হয়তো পালিয়েছে গিলটি মিঞা। হয়তো লজ্জায় ভেগেছে এই মুল্লুক ছেড়ে। আসছে না কেন?'

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবার পরও যখন এল না গিলটি মিঞা, তখন স্টার্ট দিল রানা গাড়িতে।

'হয়তো কাজ সারতে পারেনি এখনও। ঠিক আছে আমরা ডক্টর হারুনের ওখান থেকে ফিরে আবার আসব এখানে। আবার ব্যস্ত থাকা যাবে কয়েক মিনিট।'

ডক্টর হারুন আর তার আলট্রা-মডার্ন স্ত্রী বসে আছে বৈঠকখানায়—কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রকাণ্ড ফিলিপস নাইন ব্যান্ড রেডিওটা খুলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল মিসেস হারুন, গাড়ির শব্দ শুনে কোলের উপর কাগজ নামিয়ে কান খাড়া করল।

টোকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আহ্বান করল ডক্টর হারুন ওদের, সোফা ছেড়ে উঠল না। রানা যে কার্টসি ভিজিট দিতে আসেনি এটা বুঝে নিয়েছে ওরা, কেমন একটু শঙ্কিত ভাব ওদের চোখে মুখে। হওয়াই স্বাভাবিক। জোড়া খুনের মামলায় জড়িয়ে কারও গলায় ফাঁসির রশি পরাবার জন্যে যে লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাকে দেখে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।

একই কৈফিয়ৎ দিল রানা। অনেক কষ্টে কর্নেল শেখকে রাজি করিয়ে ইত্যাদি। অনীতাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল রানা এখানে। গতকাল রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে কোথায় ছিল এবং কি করেছে জিজ্ঞেস করায় ডক্টর হারুন বলল বাড়িতেই ছিল। দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত কলকাতা রেডিওর অনুরোধের আসর শুনেছে, তারপর সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত রেডিও সিলোন শুনে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'কালকের অনুরোধের আসর শুনেছেন আপনারা?' কথা বলে উঠল অনীতা গিলবার্ট। 'আমিও শুনেছি। ছিঃ, ধনঞ্জয়কে সবশেষে দেয়ার কোন মানে হয়? বলুন?'

'ঠিক বলেছেন।' হেসে উঠল ডক্টর হারুন। 'আমার এক বন্ধু তো রেডিওই খোলে না ধনঞ্জয়ের ভয়ে।'

এরপর আধুনিক গানের ওপর বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা হলো। রানা বুঝল গল্পের ছলে বের করে নিচ্ছে অনীতা ডক্টর হারুনের কথার সত্যতা। গান-বাজনার আলোচনা কিছুই বুঝল না রানা, কিন্তু হাসি হাসি মুখ করে বসে রইল, যেন সব বুঝতে পারছে। মনে মনে অবাক হলো সে সঙ্গীত সম্পর্কে অনীতার অগাধ জ্ঞান দেখে। জমে উঠেছে আলাপ।

'আমার কিন্তু ভাই সবিতার গান অপূর্ব লাগে।' বলল মিসেস হারুন।

'তা তো লাগবেই, সবগুলো সুর আর মিউজিক যে অপূর্ব—সলীল চৌধুরীর। তবে যাই বলেন, গলা হচ্ছে আরতির...'

'কেন, প্রতিমা?'

'হ্যাঁ, প্রতিমার গলাও চমৎকার, কিন্তু একটা কথাও বোঝা যায় না তার গানের।' বলল অনীতা। 'আর সত্যিই যদি শিল্পী বলতে হয় তা হলে সারা কলকাতা জুড়ে একটা নাম লিখে দেয়া যায়—নির্মলা মিশ্র। শুনেছেন? কালকে দিয়েছিল—হায় রে, জীবন নদী মরুতে হারায় রে...। আশ্চর্য সুন্দর গান, তাই না?'

আরও অনেক আলাপ চলতে পারত, এ ধরনের আলাপে কোন পক্ষেরই উৎসাহের অভাব ছিল না। হঠাৎ বেরসিকের মত জিজ্ঞেস করে বসল রানা, 'অনুরোধের আসর শেষ হয় ক'টায়?'

'সাড়ে দশটা।' জবাব দিল ডক্টর হারুন।

'তারপর কি করলেন আপনারা?'

'রেডিও সিলোনের ব্যাপার বিভাগ ধরলাম। শেষ হলো ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের খেয়াল দিয়ে। তারপরই ঘুম।'

'অর্থাৎ বোঝা গেল, এই সময়টুকুর মধ্যে বাইরে কোথাও যাননি আপনারা।' খুক করে একটু কাশি দিল অনীতা। মাথা নিচু করে আড়চোখে চেয়ে দেখল রানা অনীতার কোলের উপর রাখা বাম হাতের তর্জনী ভাঁজ হয়ে আছে। অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলছে ডক্টর হারুন। ঘড়ির দিকে চাইল এবার রানা। ঠিক সাড়ে আটটার সময় ডক্টর হারুনের বাসায় ফোন করতে বলেছিল রানা দারোগা ইয়াকুব আলীকে। এক মিনিট পার হয়ে গেছে নির্ধারিত সময়ের।

বেজে উঠল টেলিফোন। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল ডক্টর হারুন। তারপর বলল, 'আপনার ফোন মিস্টার মাসুদ রানা। খুব সম্ভব আপনাদের Q-4 ব্রাঞ্চের লোক।'

কান থেকে একটু ফাঁক করে রাখল রিসিভারটা, যাতে কথাগুলো শুনতে ডক্টর হারুনের অসুবিধে না হয়। তাছাড়া জোরে কথা বলবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল রানা ইয়াকুব আলীকে। চিৎকার করে বলল সে, 'কে, রানা, ভাবলাম তোমাকে ডক্টর হারুনের ওখানে পাওয়া যেতে পারে তাই একবার চান্স নিয়ে দেখলাম। একটা ব্যাপার ঘটেছে। এক্ষুণি আসতে পারবে একবার?'

'কি ব্যাপার ঘটল?'

'এসেই দেখতে পাবে। ভয়ানক ব্যাপার। খুব সম্ভব রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে এর যোগ আছে। পারবে না আসতে?'

'কোথায় আসতে হবে?'

'আনারকলি সিনেমা হলটার কাছেই।'

'এক্ষুণি আসছি।' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল রানা। একটু ইতস্তত করে বলল, 'কর্নেল শেখের ফোন। ভয়ানক কিছু ঘটেছে সিনেমা হলের কাছাকাছি কোথাও। মিনিট দশেকের জন্যে নীতাকে রেখে যেতে পারি আপনার জিম্মায়? যদি কিছু মনে না করেন, ঘটনাটা শুনলাম ভয়ানক…'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' বলল ডক্টর হারুন। রানার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে সে। 'সঙ্কোচের কিছু নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। নিশ্চিন্তে ওঁকে রেখে যেতে পারেন আপনি।'

বেরিয়ে গেল রানা। ঠিক তিনশো গজ দূরে গিয়ে থামাল গাড়ি। তারপর গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে তিন ব্যাটারির একটা এভারেডি টর্চ বের করে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ফিরে এল ডক্টর হারুনের বাড়িতে।

কাঁচের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল তিনজনকে, জমে গেছে গল্পে। এবার হয়তো মেয়ে শিল্পী ছেড়ে পুরুষ শিল্পীর গুষ্টি উদ্ধার করা হচ্ছে। যাই হোক, এদিক থেকে ভয়ের কিছু নেই অনীতা ব্যস্ত রাখবে ওদের ঠিকই।

বড় সড় একখানা তালা ঝুলছে গ্যারেজের টিনের দরজায়। গিলটি মিঞা এ তালা দেখলে হেসেই খুন হয়ে যেত। ওর পক্ষে এটা পাঁচ সেকেন্ডের কাজ। রানার লাগল পুরো দুই তিন মিনিট।

গাড়িটা বিক্রি করে দিতে হয়েছে ডক্টর হারুনকে দেনা শোধ করার জন্যে। এখন একটা ভেসপা কিনে নিয়েছে ভেসপায় চড়ে অফিসে যেতে আত্মসম্মানে বাধে, তাই বাসে চড়ে রিসার্চ সেন্টারে যায় সে। বিকেলে বেড়ায় ভেসপায় চড়ে। এই মফঃস্বল শহরে কারও তোয়াক্কা না রেখে তার আলট্রা মডার্ন স্ত্রীকে ভেসপার পিছনে বসিয়ে চলাফেরা করে সে। ঝকঝকে ভেসপা স্কুটারটা ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেজের মাঝখানে। মনে হচ্ছে ভালমত পরিষ্কার করা হয়েছে ওটাকে আজ

ভালমত পরীক্ষা করল ওটাকে রানা। তারপর সামনের চাকার মাডগার্ডের

তলা থেকে খানিকটা শুকনো কাদা খুঁচিয়ে তুলে একটা কাগজে মুড়ে রেখে দিল পকেটে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলাল রানা। একটা বেঞ্চের ওপর যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে অনেকগুলো।

হঠাৎ কুঁচকে উঠল রানার ভুরু জোড়া, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চোখ। দ্রুতপায়ে বেঞ্চটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। যা খুঁজছিল, পেয়ে গেছে সে। জিনিসগুলো লুকাবার কোন রকম চেষ্টা নেই। সাবধানে কাগজে মুড়ে নিল রানা জিনিসগুলো। তারপর গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল গল্পে মেতে আছে ওরা এখনও। বাইরে বৃষ্টি নেমে গেছে কাছেই কোথাও। একটা সোঁদা গন্ধ আসছে ভেজা বাতাসের ফিরে গেল রানা গাড়ির কাছে। গাড়িটা ড্রাইভ-ওয়েতে এসে ঢুকতেই দরজা খুলে দিল ডক্টর হারুন।

'আরে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?' খুশি খুশি গলায় অভ্যর্থনা করল ডক্টর হারুন। 'কাজ হয়ে গেল? কি ব্যাপার...' রানার মুখের দিকে চেয়েই হাসি মিলিয়ে গেল তার ঠোঁট থেকে। 'কি ব্যাপার, মিস্টার রানা, কোন দুঃসংবাদ?'

'হ্যাঁ। দুঃসংবাদ।' বুকের রক্ত হিম করে দেয়া কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনার পক্ষে মারাত্মক দুঃসংবাদ। আপনি প্যাঁকে পড়েছেন, ডক্টর হারুন। দারুণ প্যাঁকে পড়েছেন।'

'প্যাঁকে পড়েছি!' ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডক্টর হারুনের চেহারা। 'কি বলছেন আপনি! প্যাঁকে পড়েছি মানে?'

'মানে দেখুন গিয়ে ডিকশনারীতে। আমার সময় কম, তাই ব্যাখ্যা করবার উপায় নেই, সংক্ষেপেই কথা সারতে হচ্ছে। এবং সময়াভাবেই আপনি অসন্তুষ্ট হলেও ভদ্রতা বজায় রেখে যথাযোগ্য শব্দ চয়ন করে কথা বলা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। আমার বক্তব্য তাই সরাসরিই বলছি ডক্টর হারুন আপনি একটা মিথ্যাবাদী।'

'বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন, মিস্টার রানা।' আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডক্টর হারুনের চেহারা মুঠো করে ফেলেছে সে দুই হাত ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু রানার একহারা লম্বা পেটা শরীরটার দিকে চেয়ে মত পরিবর্তন করল। মুখে বলল, 'খবরদার! এই ধরনের অপমান আমি সহ্য করব না।'

'কোর্টে টেনে নিয়ে দাঁড় করালে এর চেয়েও অনেক কঠিন কথা সহ্য করতে হবে, ডক্টর, আগে থেকে প্র্যাকটিস হয়ে থাকা ভাল না? কাল রাতে রেডিওটা কি স্কুটারে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন? যে পুলিস কনস্টেবলটা আপনাকে রাত দশটার পর ভেসপা চালাতে দেখেছে সে তো রেডিওর কথা কিছু বলল না!'

'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না আমি, মিস্টার রানা ভেসপা...'

'দেখুন, সব কিছুরই একটা সীমা আছে' বাধা দিল রানা। 'মিছে কথা সহ্য করা যায়, কিন্তু আপনার ক্যালিবারের একজন লোকের বোকামি সহ্য করা যায় না। আপনি বুঝতে পারছেন না এখনও, যে সত্যিকথা স্বীকার করে ফেলাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ?' অনীতার দিকে চাইল রানা। 'অনুরোধের আসর সম্পর্কে তোমার কিছু বক্তব্য আছে মনে হচ্ছে?'

'কালকের শেষ গান ধনঞ্জয়ের ছিল না, ছিল শ্যামল মিত্রের। নির্মলা মিত্রের গান কাল বাজায়নি। আর অনিবার্য কারণবশত রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত রেডিও সিলোন থেকে কোন ব্রডকাস্ট হয়নি।'

কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেসের মুখ। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানা ওদের দিকে। হঠাৎ মরিয়া হয়ে মিস্টারের দিকে ফিরল মিসেস হারুন।

'বলে দাও, হারুন। নইলে আরও খারাপ হয়ে যাবে অবস্থা।'

অসহায়ভাবে চাইল ডক্টর হারুন স্ত্রীর দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিল, তারপর বসে পড়ল একটা সোফায়। মাথা হেঁট করে বলল, 'বাইরে গিয়েছিলাম আমি কাল রাতে। একটা ফোন কল পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম একজনের সাথে জিন্না রোডে।'

'কে সেই লোকটা?'

'দেখা হয়নি আমার তার সঙ্গে। যেখানে দেখা করবার কথা ছিল সেখানে গিয়ে পাইনি তাকে।'

'কে সে! রহমত কন্ট্রাক্টর?'

'আপনি, আপনি চেনেন ওকে?' অবাক হয়ে চাইল সে রানার মুখের দিকে।

'শুধু আমি কেন, তেজগাঁ থেকে নিয়ে টাঙ্গাইল পর্যন্ত প্রত্যেকটা থানার দারোগা চেনে তাকে ভাল ভাবেই। বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছে সে। ঘুষ, ব্ল্যাকমার্কেটিং ইত্যাদি নানান ধরনের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে টাকা খাটায় সে।'

'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে··· যে আমি···'

'আমি সবজান্তা। আমি জানি এ বাড়ি রহমতের কাছেই বন্ধক দেয়া আছে। তারপরও পাঁচ হাজার টাকা ধার আছে আপনার ওর কাছে—মাসে মাসে সুদ দিতে হচ্ছে।'

'কে বলল, এসব কথা কে বলল আপনাকে?' আবছা গলায় জিজ্ঞেস করল ডক্টর হারুন।

'কেউ বলেনি। আমি নিজে জেনে নিয়েছি। আপনি হয়তো মনে করছেন যে আপনার কার্যকলাপ কাক-পক্ষীও টের পাচ্ছে না, কিন্তু একটা ব্যাপার আপনার জানা উচিত ছিল, যে রিসার্চ সেন্টারে সিকিউরিটির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি, সেখানে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের নামে আলাদা ফাইল আছে—এবং বিশেষ করে প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থা টোকা আছে নিখুঁত ভাবে। যাক, কাজের কথায় আসা যাক, কে ফোন করেছিল? রহমত?'

মাথা নাড়ল ডক্টর হারুন। 'ঠিক সাড়ে দশটায় দেখা করতে বলেছিল ও। আমি আপত্তি করেছিলাম। ভয় দেখাল, টাকার জন্যে কোর্টে দাঁড় করাবে কথা না শুনলে।'

'গিয়ে পেলেন না ওকে?'

'না। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে ওর বাসায় গেলাম। ভাবলাম হয়তো অন্য

কোথাও দেখা করতে বলেছিল, ভুল শুনেছি। কিন্তু বাসাতেও পেলাম না কাউকে। কেউ ছিল না বাসায়। আবার জিন্না রোডে গিয়ে অপেক্ষা করলাম আধঘণ্টা। সেখানেও কেউ এল না। তখন ফেরত চলে এলাম বাসায়।'

'যেতে আসতে দেখা হয়েছিল কারও সঙ্গে?'

'না। রাস্তাঘাটে লোক ছিল না একজনও।'

'তার মানে আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার কোন রাস্তা নেই। নিজের অবস্থাটা একটু চিন্তা করুন, ডক্টর। গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন আপনি ধারে—এই অবস্থার চাপে পড়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন। দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আপনি বাড়িতে ছিলেন না প্রমাণ হয়ে গেছে। টেলিফোনে ডাকা, এবং আবোল-তাবোল ঘোরাঘুরির কথা কেউ বিশ্বাস করবে মনে করছেন? আপনি যে রাত দশটার পর সোজা রিসার্চ সেন্টারে গিয়ে বেড়া কাটেননি তার প্রমাণ কি?'

মাথা নিচু করে চিন্তা করল কিছুক্ষণ ডক্টর হারুন, তারপর বলল, 'আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ,' মিস্টার রানা। কিন্তু বুঝতে পারছি সত্যিই পাঁকে পড়েছি আমি। কোন প্রমাণ নেই আমার। কি করতে চান এখন? ধরে নিয়ে যাবেন এক্ষুণি?'

'ধরে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। আপনার বানানো গল্প ধোপে টিকবে না। কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আপনার এ গল্প বিশ্বাস করবে না, এতই কাঁচা আপনার গল্প। কিন্তু আমি এ গল্প বিশ্বাস করি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ডক্টর হারুন। কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করল মিসেস হারুন। 'আপনি চালাকি করে হারুনের কনফিডেন্স তৈরি করে ওকে হয়তো…'

'বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারি। এই তো?' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'দেখুন, মানুষকে বিপদে ফেলা আমার পেশা নয়। একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, কেউ একজন ডক্টর হারুনের ওপর পুলিসের সন্দেহ ফেলার চেষ্টা করছে। নানান ভাবে টোপ ফেলেছে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক।' ডক্টর হারুনের দিকে ফিরল এবার রানা। 'আগামী দু'দিন বাড়ি থেকে এক-পাও বাইরে যাবেন না আপনি—রিসার্চ সেন্টারে জানিয়ে দেব আমি। এই দুই দিন কারও সঙ্গে দেখাও করবেন না, কথাও বলবেন না। কারও সঙ্গে না। অসুস্থতার ভান করতে পারেন, কিংবা যা খুশি তাই করতে পারেন—কিন্তু খেয়াল রাখবেন কেউ যেন আপনার চেহারা দেখতে না পায়, কিংবা গলার স্বর শুনতে না পারে। আপনার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে স্বাভাবিক ভাবেই সেই লোকটি মনে করবে আমাদের সমস্ত সন্দেহ আপনার উপরই পড়েছে। এবং সেটাই চাই আমি। বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। স্যার আপনার সঙ্গে বোকার মত দুর্ব্যবহার করার জন্যে…'

'আমিও যে খুব ভাল ব্যবহার করেছি এমন নয়। আচ্ছা, চলি এখন, গুড নাইট।'

'চা-টা…' ব্যস্ত হয়ে বলতে গিয়েছিল মিসেস হারুন, হাত তুলে বারণ করল রানা।

'নো থ্যাঙ্কস।'

'তুমি অত্যন্ত দয়ালু লোক, রানা।' খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল অনীতা।

'তাই নাকি?' গিয়ার বদলে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার এই গুণটা আবার আবিষ্কার করলে কবে?'

'এই একটু আগে। হারুন দম্পতিকে ভয় দেখিয়ে ওদের জীবনটা দুর্বিষহ করে রেখে এলেও তোমার কোন ক্ষতি ছিল না। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হত তাতেও। আসল খুনী ওদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারত সর্বক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে আছে ওরা—অর্থাৎ, Q-4 ব্রাঞ্চের সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। তা না করে ওদের ভেঙেচুরে বুঝিয়ে দিলে তুমি অবস্থাটা। নিশ্চিন্ত ঘুম হবে ওদের আজ রাতে।'

'তা হবে। চাই কি রেডিও সিলোন খুলে দিয়ে এক-আধ রাউন্ড কুস্তিও হয়ে যেতে পারে।'

'তোমার খালি নোংরা নোংরা কথা। দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা, উনি মাঝখান থেকে...'

'ও হ্যাঁ, দয়ার কথা হচ্ছিল। ঠিকই বলেছ, দয়ার সাগর আমি! দয়া না দেখিয়ে যদি ওর বিরুদ্ধে যে তিনটে প্রমাণ যোগাড় করেছি সেগুলো দেখাতাম তাহলে এক লাফে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত লোকটা। তাতে ছাতের ক্ষতি হত, ডক্টর হারুনও মাথায় ব্যথা পেতে পারত।'

হাঁ করে চেয়ে রইল অনীতা রানার মুখের দিকে। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝলাম না তোমার কথা।'

'কাগজে জড়ানো তিনটে জিনিস আছে আমার কাছে। এক নম্বর: খানিকটা লাল মাটি। ওদের গ্যারেজে দাঁড় করানো স্কুটারটার মাডগার্ড থেকে খুঁচিয়ে তোলা। ডক্টর হারুন কাজে যায় বাসে করে। তাহলে স্কুটারের মাডগার্ডে ওই লালচে কাদা লাগল কি করে। আশপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে এই রঙের মাটি আছে কেবল রিসার্চ সেন্টারের চারপাশে—ওই মাটি কেন ওখানে ফেলা হয়েছিল সে সব ইতিহাসও আমার জানা আছে। দুই নম্বর: একটা হাতুড়ি। গ্যারেজের ভেতরেই একটা বেঞ্চের ওপর রাখা ছিল ওটা। সাধারণ চোখে কিছুই মনে হবে না, কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, ভাল করে পরীক্ষা করলে এক-আধটা পশম পাওয়া যাবে ওর গায়ে। এবং সে পশম হচ্ছে বাঘা নামে রিসার্চ সেন্টারের একটা ব্লাড হাউন্ডের। তিন নম্বর: একটা প্লায়ার্স। এটাও পাওয়া গেছে বেঞ্চের উপর। এটাকে বেশ ভাল ভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলেই অতি সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে এটা দিয়েই কাটা হয়েছিল রিসার্চ সেন্টারের বেড়া।'

'এই সবই বের করেছ তুমি আজ?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অনীতা।

'হ্যাঁ, সব বের করেছি। আমি একটা জিনিয়াস।'

অল্প একটু চুপ করে থেকে মমতা মাখা শান্ত কণ্ঠে বলল অনীতা, 'রানা, আমি বুঝতে পারছি কোন কারণে ভয়ানক বিচলিত, উদ্বিগ্ন হয়ে আছ তুমি। আজ দুপুর থেকেই দেখতে পাচ্ছি।' রানার ঘাড়ের কাছে চুলে আঙুল চালিয়ে দিল সে। 'মনের

মধ্যে তুফান চলছে তোমার, ঘড়ড়ু ঘড় চলছে ব্রেন—স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। কি হয়েছে তোমার বলবে আমাকে? বললে যদি তোমার মনের ভাব একটু লাঘব হয়··'

'কালকূটের চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি আমি, অনীতা! একজন জোড়া খুনের আসামী কালকূটের বোতল পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কল্পনা করতেই শিউরে উঠছি আমি ভয়ে—যা খুশি তাই করতে পারে সে যে-কোন মুহূর্তে যে করে হোক ঠেকাতে হবে ওকে—কিন্তু পথ পাচ্ছি না।'

'ডক্টর হারুন তাহলে সেই লোক নয়?'

'না। হয়তো অন্য কোন ভাবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু খুন সে করেনি। গত রাতে ডক্টর হারুনের অজ্ঞান্তে তার গ্যারেজের তালা খুলেছিল কেউ। স্পষ্ট আঁচড়ের দাগ দেখতে পেয়েছি আমি তলায়।'

'তাহলে ওই তিনটে জিনিস নিয়ে এলে কেন তুমি···'

'দুটো কারণ আছে তার। প্রথম কারণ হচ্ছে এগুলো আর কারও হাতে পড়লেই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ডক্টর হারুনকে সোজা হাজতে পুরবে। লাল মাটি, হাতুড়ি, প্লায়ার্স—ওরেব্বাবা, অকাট্য প্রমাণ। তার ওপর আবার রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কোথায় কি করেছে তার ঠিক নেই। অবস্থাটা ভেবে দেখো।'

'তুমি না বললে পুলিস একজন দেখতে পেয়েছে ওকে?'

'ভুল। ডক্টর হারুনকে মিথ্যেবাদী বলেছিলাম, কিন্তু ওদিক থেকে আমিও কম যাই না। সত্যি কথাটা এখনও বলেনি ডক্টর হারুন, কিন্তু ওকে বেশি ঘাঁটাতে চাই না আমি। আমি চাই লোকটা একটু নিশ্চিন্তে থাকুক।'

'তার মানে?'

'তার মানেটা আমি নিজেও ঠিক জানি না। আমি জানি একটা মাছি মারবারও সাহস নেই ডক্টর হারুনের, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্রী কোন ব্যাপারে জড়িত আছে সে।'

'কি করে বুঝলে সেটা?'

'কোন কারণ দেখাতে পারব না আমি তোমাকে। কিন্তু আমি জানি, যা বলছি তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। ইচ্ছে করলে একে আন্দাজ বলতে পারো। অনেক সময় হয় না, অবচেতন মনটা কিছু একটা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাবে চেতন মনের কাছে ব্যাপারটা না পাঠিয়ে কেবল যোগফলটা পাঠিয়ে দিয়েছে? ঠিক সেই রকম। আমি জানি, ভয়ানক কোন ব্যাপারের সঙ্গে অষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে ডক্টর হারুন!' যেন আপন মনে কথা বলছে এমনি ভাবে বলে চলল রানা। 'আর জিনিসগুলো সরিয়ে আনার দ্বিতীয় কারণ হলো, এসবের পিছনের আসল লোকটাকে ঘাবড়ে দেয়া। যে লোকটা চাইছে ডক্টর হারুনের ওপর আমাদের সন্দেহ পড়ুক তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রাখতে চাই আমি। যদি পুলিস ডক্টর হারুনকে নির্দোষ মনে করে এড়িয়ে যেত, কিংবা দোষী মনে করে গ্রেফতার করত, তাহলে অবস্থাটা সেই লোকটার আয়ত্তে থাকত। কিন্তু ডক্টর হারুনের সন্দেহজনক ভাবে বাড়িতে বসে থাকা, আর তিনটে জিনিস হাতে পেয়েও

আমাদের রহস্যজনক নীরবতা রীতিমত ঘাবড়ে দেবে সেই লোকটাকে। অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। দ্বিধা এলেই কাজে ব্যাঘাত হয়। এবং তার কাজের ব্যাঘাত ঘটলেই সময় পাব আমরা হাতে। সময় দরকার। যে-কোন মূল্যে যতটা সম্ভব সময় কিনতে হবে আমাদের। বুঝতে পারছ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অনীতা, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি একটা জঘন্য রকমের ধূর্ত লোক, রানা। বুঝতে পারছি, তোমার হাত থেকে খুনীর নিস্তার নেই।'

সাত

নেই।

গিলটি মিঞা নেই। নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল আসেনি গিলটি মিঞা এখনও। এবার এক মিনিট দাঁড়াল রানা, তারপরই গাড়ি ঘুরিয়ে ছুটল ডক্টর আবু সুফিয়ানের বাড়ির দিকে।

মোটর সাইকেল আরোহীদের সাথে দেখা হয়ে গেল একটু যেতেই। রাস্তার পাশে একটা কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ স্টার্ট বন্ধ করে। মোটর সাইকেলের মুখটা গাড়ির দিকে ফেরানো। চট্ করে প্যান্টের বোতাম খুলে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। ব্যস্ত।

কাঁঠাল গাছ ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ যেতেই আবার অনুসরণ করতে আরম্ভ করল মোটর সাইকেল। একটানা আধ মাইল চলার পর স্পীড কমাল রানা। কিন্তু মোটর সাইকেলের স্পীড কমল না। ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেটা।

'পিছন ফিরে দেখো তো, অস্ত্র আছে কিনা।' বলল রানা।

পিছন ফিরল অনীতা। বলল, 'অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, বুঝব কি করে?'

'তুমি চেয়ে থাকো, আমি ফ্ল্যাশ লাইট দিচ্ছি।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল গাড়ির পিছনে ফিট করা ফ্ল্যাশ লাইট। তিন সেকেন্ড থাকল, তারপর নিভে গেল।

'দাঁতে কামড়ে ধরে আছে একটা ছুরি।' বলল অনীতা ভয়ে ভয়ে। 'হাতে কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। তুমি সীট ছেড়ে নিচে নেমে পড়ো। মাথাটা নিচু করে রাখো।'

ফ্ল্যাশ লাইট দেখে ঘাবড়ে গিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে মোটর সাইকেল আরোহী। ওভারটেক করছে এখন। বাম হাতটা মুখের কাছে তুলছে। গিলটি মিঞার সেই 'বাঁইয়া' লোক না তো। মোটর সাইকেল থেকে কি লক্ষ্যস্থির করতে পারবে? এতই এক্সপার্ট?

ঘটাং করে শব্দ হলো একটা। এই সম্ভাবনার কথা ভাবেনি লোকটা। ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন হান্ড্রেডের ডান দিকের বডিতে ট্যাপ খেয়ে গেল। স্টীয়ারিংটা দ্রুত একবার ডান দিকে ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিয়েছে রানা

চোখের নিমেষে। উল্টে পড়েছে মোটর সাইকেল রাস্তার ধারে, ছিটকে গিয়ে আরোহী পড়েছে খাদে। ব্রেক কষল রানা। এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাশের দরজা। বেরিয়ে এল রাস্তায় টর্চ হাতে।

চালু আছে টু-স্ট্রোক-ইঞ্জিনটা। পাঁই পাঁই ঘুরছে মোটর সাইকেলের চাকা মাটিতে শুয়ে শুয়ে। পাশেই পড়ে আছে একটা থ্রোয়িং নাইফ। এদিকে লক্ষ দিল না রানা—এদের মালিককে চাই। এক লাফে রাস্তার ধারে চলে গেল সে। টর্চ জ্বালল। পানি জমে আছে ডিচে—তার ওপাশে ধানখেত। এপাশ ওপাশ টর্চের আলো বুলিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা। আলো দেখে ডাঙা থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা কোলা ব্যাঙ। এবার ধানখেতের ওপর আলো ফেলেই দেখতে পেল রানা লোকটাকে। প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে সে ধানখেতের উপর দিয়ে। একনজর দেখেই বুঝল রানা ওকে তাড়া করা বৃথা, ধানখেত দৌড়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করবার চেষ্টা করছে সে।

ছুরিটা তুলে নিল রানা সাবধানে, একটানে মোটর সাইকেলের ফুয়েল পাইপটা খুলে ফেলল, তারপর এক লাথি দিয়ে খসিয়ে দিল কারবুরেটার। গলগল করে মবিল মেশানো পেট্রল পড়ছে রাস্তার ওপর। গাড়িতে উঠে বসল রানা। অনীতাও উঠে বসেছে সীটের ওপর। রওনা হলো আবার ওরা।

ডক্টর সুফিয়ানের প্রকাণ্ড বাড়িটার চারপাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, একটা বাতিও নেই কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল রানার ব্যাপারটা।

চারটে ব্লাড হাউন্ড। মাঠের মধ্যে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের চারপাশে ঘুরছে প্রকাণ্ড চারটে ব্লাড হাউন্ড। মাঝে মাঝে উপর দিকে চাইছে আর বিকট হুঙ্কার ছাড়ছে। ডক্টর সুফিয়ানের পোষা কুকুর ওগুলো। ভয়ানক দুর্দান্ত বলে আশপাশে কুখ্যাতি অর্জন করে নিয়েছে ওরা অল্পদিনেই।

গাড়ি নিয়ে নেমে গেল রানা মাঠের মধ্যে। সোজা ছুটল ইউক্যালিপটাস গাছের দিকে। হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল গিলটি মিঞার চেহারাটা। মাটি থেকে দশ হাত উপরে চার হাত-পায়ে গাছটা জড়িয়ে ধরে ঝুলছে সে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে নিচের দিকে।

হেড লাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল হাউন্ডগুলোর সবুজ চোখ। কাছে এগিয়ে যেতে একটু দূরে সরে গেল কিন্তু পালিয়ে গেল না।

'গিলটি মিঞা।' ডাকল রানা।

'আর বলবেন না, স্যার, বড় হারামী এই কুত্তোগুলো।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল গিলটি মিঞা।

'নেমে এসো।'

'খেপেচেন, স্যার? নিচে নামলেই শালারা ছিঁড়ে খেয়ে লেবে।'

'তাহলে?'

'তাহালে আর কি? সব্বোশরীল কাঁপচে আমার, কি করবো বলুন তাড়াতাড়ি, নইলে এক্ষুণি পড়ে যাবো গাচ থেকে।'

কুকুরগুলো খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ির চারপাশে ঘুরছে। বাইরে বেরনো এখন আত্মহত্যারই নামান্তর। যতদূর সম্ভব ডক্টর সুফিয়ানের বাড়িতে কেউ নেই, থাকলে কুকুরগুলোর হৈ-হল্লায় কেউ না কেউ এসে উপস্থিত হত তবু গুলি করা যাবে না

কুকুরগুলোকে গাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল রানা কিছুক্ষণ মাঠময়। এবার কিছুটা দমে গেছে এগুলো! কাছাকাছি আসতে সাহস পাচ্ছে না। ইউক্যালিপটাস গাছের গা ঘেঁষে দাঁড় করাল রানা গাড়িটা।

'লাফ দাও, গিলটি মিঞা। গাড়ির ছাতে লাফিয়ে পড়ো এবার।'

ধুড়ুম করে লাফিয়ে পড়ল গিলটি মিঞা গাড়ির ছাতে। সোজা রাস্তার দিকে ছুটল গাড়িটা। পিছন পিছন বেশ কিছুদূর এল হাউন্ডগুলো, তারপর ফিরে গেল আধ মাইল গিয়ে গাড়ি থামাল রানা। তড়াক করে লাফিয়ে নামল গিলটি মিঞা।

'চমৎকার হাওয়া লাগছিলো, স্যার ছাতে শুয়ে। ঘুমিয়ে পড়তাম আরেকটু হলেই।'

'উঠে এসো।'

'কোতায়?'

'তোমার মাথায়। গাড়িতে উঠে এসো।'

'না, স্যার। আপনারা যান, আমার একটু কাজ আচে।'

'কাজ আছে?'

'হ্যাঁ। যে কাজে পেটিয়েচিলেন সেটা তো হোই নি একনো। বাড়িতে ঢুকেচি কি ঢুকিনি, হৈ হৈ করে হারামী কুত্তোগুলো তেড়ে লিয়ে গিয়ে তুলল গাচের মাতায়। ওগুলোর কতা যদি আগে থেকে বলে দিতেন, স্যার, তাহালে আর এ ঝক্কি পোয়াতে হতো না। কি আচে, আমার নামও গিলটি মিঞা। বত্রিশ বচোর ধরে আচি এ লাইনে...'

'ভিতরেই ঢুকতে পারোনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তবে আর বলচি কি, স্যার। চৌদরী সায়েবের সিগরেট কেসটা না লিয়ে ঘরমুখো হবো না আজ আমি। আপনারা বাড়ি চলে যান, আমি আসচি দু'ঘণ্টার মদ্যে।'

'কিসে করে আসবে?'

'সে সব আপনাকে চিন্তে করতে হবে না, স্যার। কতো টারাক, লরী রে-হামেশাই ঢাকা-ময়মনসিং করচে—পৌঁছে যাবো ঠিকই। আপনারা রওনা হয়ে যান, স্যার। বিষ্টি নেমে পড়বে একুনি।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। প্রত্যেককে চেক করা হচ্ছে যখন, ডক্টর সুফিয়ানকে বাদ দেয়ার কোন মানে হয় না। সে-ও তো কাজ করে এক নম্বর ল্যাবে। কাজেই সন্দেহমুক্ত নয় সে-ও। গিলটি মিঞা যেতে চাইছে, যাক।

'শোনো।'

চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল গিলটি মিঞা। 'বলুন, স্যার।'

'এটা রেখে দাও সঙ্গে।'

থ্রোয়িং নাইফটা এগিয়ে দিল রানা। একবার ছুরিটার দিকে, আরেকবার রানার মুখের দিকে চাইল গিলটি মিঞা অবাক হয়ে। কিন্তু কথা না বাড়িয়ে মুচকে হেসে কোমরে গুঁজল সে ছুরিটা।

সত্যিই। ঝমঝম বৃষ্টি নেমে গেল দশ মিনিটের মধ্যে! সেই সঙ্গে তুমুল বাতাস। উড়িয়ে ফেলে দিতে চাইছে গাড়িটা নিচের ধানখেতে। একে রাত্রি, তার ওপর এত ঘন হয়ে বৃষ্টি পড়ছে যে বিশ ফুটের বেশি দেখা যাচ্ছে না সামনে। টঙ্গি ব্রিজ ছাড়িয়ে এসেছে ওরা বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু যতই দক্ষিণে এগোচ্ছে ততই বাড়ছে ঝড়-বৃষ্টি। তাণ্ডবলীলা যেন পৃথিবী জুড়ে। আকাশ চিরে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। গুড় গুড় করে উঠছে আকাশের বুকের ভিতরটা।

'ভয় করছে।' বলল অনীতা।

'ভয় কি, নীতা, আমি তো আছি।' বলল রানা।

'তোমার ভয় করছে না?' একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল অনীতা।

'করছে। কিন্তু ভাবছি, তুমি তো আছ।'

'যাহ্। ঠাট্টা ভাল লাগছে না এখন।' বাঁকা চাউনি দিয়ে কপট কোপ প্রকাশ করল অনীতা।

'তাহলে কি ভাল লাগছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অনীতা, তারপর বলল, 'ভয় ভয় করছে ঠিকই, কিন্তু এই যে এত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলেছি, কিন্তু ভিজছি না একফোঁটাও এজন্যে অদ্ভুত একটা মজাও লাগছে ভেতর ভেতর। তাই না?'

'মজাটা বেরিয়ে যাবে এখন একটা চাকা লিক হলেই।'

যেমনি বলা অমনি বসে গেল পিছনের একটা চাকা।

'এইয্যাঃ! এখন?' শঙ্কিত হয়ে উঠল অনীতার চোখ। 'এখন কি করবে?'

'কি আর করব, হয় বসে থাকতে হবে বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত নয় ভিজতে হবে। বললাম না, মজাটা বেরিয়ে যাবে?'

'তুমি মুখ দিয়ে অমন অলক্ষুণে কথা বের করছ, তোমার মজা বেরোবে। আমার তাতে কি? আমি তো আর ভিজছি না। যাও, গেট আউট। আমি লিভার টান দিয়ে দিচ্ছি, বুট খুলে স্পেয়ার চাকা বের করে ফিট করো।'

'ই···ই···হ্। অর্ডার দিলেই হলো? তোমার দরকার হলে তুমি ফিট করো গে যাও। আমি এই বৃষ্টিতে বেরোব না। বৃষ্টিতে ভিজবার কথা ভাবতেই গা শিরশির করে আমার। তাছাড়া বৃষ্টিতে ভিজলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়।'

রানাকে সিগারেট ধরাবার আয়োজন করতে দেখে এক থাবা দিয়ে কেড়ে নিল অনীতা প্যাকেটটা। 'যাও, এখানে বসে বসে ভেরেন্ডা না ভেজে সত্যিকার পুরুষ মানুষের মত কাজে লাগো গে যাও।'

'সত্যিকার পুরুষ মানুষের মত কাজে লেগে যাব? অ্যাঁ? আর সত্যিকার মেয়ে মানুষ হয়ে তুমি এতবড় বিপদের মুখে ঠেলে দেবে আমাকে? একটুও লাগবে না

তোমার প্রাণে? তোমার কি পাখা…'

'প্লীজ। খামোকা বকিয়ো না তো। নামো। হঠাৎ ডাকাত-টাকাত…'

'ডাকাত? আমিও তো একজন ডাকাত। ভয়ঙ্কর ডাকাত।'

এর পরে কিল ছাড়া আর রাস্তা ছিল না। কিল তুলতেই তড়াক করে বেরিয়ে গেল রানা দরজা খুলে। আধ মিনিটের মধ্যেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল রানা। গাড়ির ভেতর বসে হাসছে অনীতা তাই দেখে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে মৃদুমৃদু।

দুই মিনিটেই চাকা বদলানো হয়ে গেল। নাটগুলো ভাল করে টাইট দিয়ে লিক হয়ে যাওয়া চাকা আর জ্যাকটা তুলে রাখল রানা বুটের ভিতর। হেড লাইটের কাছাকাছি এসেই হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল রানার দেহটা, যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল মুখ।

'কি হলো! রানা, কি হয়েছে!' শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অনীতা। ঝট্ করে দরজা খুলল সে গাড়ির।

'উহ্! ব্যথা!' আরও নুয়ে পড়ল রানা।

ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল অনীতা পাগলের মত। তুলে সোজা করবার চেষ্টা করছে সে রানাকে।

'কোথায়, কোথায় ব্যথা পেলে রানা?'

'মনে।'…অনীতার একটা হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরল রানা। 'জানো নীতা, বড় ব্যথা এখানটায়!'

রানার শয়তানি বুঝতে পেরে টেনে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল অনীতা হাতটা, কিন্তু পারল না। টানা হেঁচড়ায় আঁচল খসে পড়ল কাঁধ থেকে। টিপ্ করে আবার খুলে গেল আঁটা ব্লাউজের একটা বোতাম। ততক্ষণে ভিজে চুপসে গেছে সে-ও। উপায়ান্তর না দেখে মুখ লুকাল সে রানার বুকে।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে মনের সুখে ভিজল ওরা অনেকক্ষণ। হেড লাইট নিভিয়ে দিয়েছে আগেই। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। সাঁই সাঁই বইছে বাতাস। চারপাশে অজস্র ব্যাঙের কলতান। পৃথিবীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে যেন ওদের কাছে। বাহুবন্ধনে মানব-মানবী। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় দেখছে ওরা পরস্পরকে। একান্ত ভাবে।

ভিজে সেঁটে গেছে শাড়িটা গায়ের সঙ্গে। একগুচ্ছ ভেজা চুল লেপটে আছে গলায়। শীতে কাঁপছে অনীতা। থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠছে সে। জল ঝরছে সর্বাঙ্গ বেয়ে। রানার কানে কানে বলল, 'ভেতরে চলো।'

পিছনের দরজা খুলে উঠে এল ওরা গাড়ির ব্যাকসীটে।

'শীত করছে বড্ডো।'

জবাব দিল না রানা। গাড়ির ছাতে ড্রাম বাজাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সাঁই সাঁই করছে বাতাস। তাণ্ডব লীলায় মেতেছে আজ প্রকৃতি। তিন ইঞ্চি দূর থেকে বিদ্যুতের আলোয় অপরূপ লাগছে রানার কাছে অনীতার আপেল-রাঙা মুখ। আবেশে বুজে এসেছে দু'টি কাজল কালো হরিণ চোখ। নাকটা ফুলে উঠেছে একটু। নিঃশ্বাস বইছে কাঁপা কাঁপা। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে যেন

কে। অসহ্য আবেশে মাথাটা একপাশে কাৎ করে অস্ফুট স্বরে ডাকল অনীতা, 'রানা···া···া···'

আট

রাত সাড়ে দশটা। ঝড় কমেছে, কিন্তু বিরামহীন বৃষ্টি ঝরছে বাইরে।

বাড়ি ফিরে স্নান করে একসাথে ডিনার সেরে নিল ওরা। রানার পাশের ঘরে আগে থেকেই পরিপাটি করে বিছানা পেতে রেখেছিল মোখলেস অনীতার জন্যে। অনীতাকে বিশ্রাম করতে বলে নিজের ঘরে ঢুকল রানা।

বিছানায় বসে দ্রুত একবার পরীক্ষা করল সে তার প্রিয় অটোমেটিক পিস্তলটা। ইজেক্টার স্প্রিংটা পরীক্ষা করল স্লাইড টেনে টেনে। টপাটপ্ আটটা থ্রী-টু বুলেট পড়ল বিছানার উপর এলোমেলো হয়ে। প্রয়োজনের সময় ইজেক্টার স্প্রিংটা কাজ না করলেই সর্বনাশ, হাত দিয়ে বের করতে হবে গুলি চেম্বার থেকে; আর ততক্ষণ বসে বসে মাছি মারবে না প্রতিপক্ষ—তাই নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করে রানা ওয়ালথার পি. পি. কে.-র ইজেক্টার স্প্রিং। খালি পিস্তলটা ঝট্ করে তুলল কয়েকবার রানা বাল্বটাকে লক্ষ্য করে। এক ইঞ্চি উঁচুতে লক্ষ্যস্থির হচ্ছে বার বার। অর্থাৎ, লোডেড অবস্থায় ঠিক জায়গা মতই নিশানা হবে। গুলি ভরে নিয়ে আরও কয়েকবার ওটাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল রানা পিস্তল উঁচিয়ে, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে রেখে দিল ওটা শোলডার হোলস্টারে। কোটটা গায়ে চাপিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল—না, কোথাও উঁচু হয়ে নেই, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না পিস্তলের অস্তিত্ব।

হ্যাঁ। বাইরে যেতে হচ্ছে রানাকে আবার এই দুর্যোগের রাতে। টেলিফোন এসেছে।

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটা প্রাসাদোপম বাড়ির অতি পরিচিত গাড়ি বারান্দায় এসে থামল রানার ফোক্সওয়াগেন। রানাকে দেখে একগাল হাসল লিফ্‌ট ম্যান। সোজা সাততলায় উঠে এল লিফ্‌ট। লম্বা একটা করিডর ধরে এগিয়ে গেল রানা।

'আপনি মিস্টার মাসুদ রানা?' যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি। ঢলো ঢলো চেহারা। বয়স ছাব্বিশ। সুন্দরী।

চম্‌কে গিয়েছিল রানা। সামলে নিয়ে বলল, 'জ্বি। আর আপনি?'

রানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে দেখাল মেয়েটি। কোনরকম-প্রশ্রয়-পাবে-না কণ্ঠে বলল, 'সোজা ভিতরে চলে যান। অপেক্ষা করছেন উনি আপনার জন্যে।'

দ্বিরুক্তি না করে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর। ওপাশে দেয়ালের গায়ে একটা বন্ধ দরজা। আস্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। একবার

কেঁপে উঠল রানার বুকটা, তারপর এলাহি ভরসা বলে ঢুকে পড়ল সে। আগাগোড়া দামী কার্পেটে মোড়া ঘর, আগাগোড়া পুরু বেলজিয়াম গ্লাসে ঢাকা প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল—টেবিলের ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে ডান হাতে ধরা একটা কাগজের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। পড়ছেন বলে মনে হচ্ছে না, চেয়ে আছেন শুধু। বিষ মাখানো ছুরি মানুষ যে দৃষ্টিতে দেখে, কিংবা যক্ষা আক্রান্ত যুবক তার প্রথম রক্ত-ভেজা রুমালটার দিকে যে দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সেই দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ কাগজটার দিকে। রীডিং ল্যাম্পটা জ্বলছে অনর্থক। বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে থ্রী কাসলস সিগারেটটায় এক ইঞ্চি লম্বা ছাই জমে গেছে।

আস্তে করে দরজাটা বন্ধ হতেই ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন বৃদ্ধ।

'এসো।'

নড়াচড়ার ফলে সিগারেট থেকে ছাইটুকু খসে পড়ল টেবিলের ওপর। মাথাটা ডানদিকে ঝাঁকিয়ে আবছা ইঙ্গিতে বসতে বললেন তিনি রানাকে সামনের চেয়ারে। ফুঁ দিয়ে ছাইটুকু উড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর থেকে। হাতের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে একটা পেপার ওয়েট চাপিয়ে দিলেন তার ওপর। সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন আসমানের দিকে, তারপর সোজাসুজি চাইলেন রানার চোখের দিকে।

'অনেক দিন পর দেখা।'

'জ্বি, স্যার। ছয় মাস।'

'কেমন আছ?'

চমকে উঠল রানা ভিতর ভিতর বৃদ্ধের এই ব্যক্তিগত প্রশ্নে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান জিজ্ঞেস করছেন কেমন আছে রানা। নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর তুফান চলছে বৃদ্ধের মনের ভিতর।

'ভাল আছি, স্যার।' বলল রানা বিড় বিড় করে।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানলেন মেজর জেনারেল। তারপর বললেন, 'ইনাম গেছে, সাবেরও গেল। কতদূর কি করলে, রানা?'

প্রথম থেকে বলতে যাচ্ছিল রানা, অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ওকে বৃদ্ধ।

'এসব আমার জানা আছে। Q-4 ব্রাঞ্চের রিপোর্ট পেয়ে গেছি আমি সন্ধ্যার আগেই। শেখের ধারণা, ডক্টর শরীফ নিজেই এর সঙ্গে জড়িত ছিল। সোয়া ছয়টায় বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল রাত্রির অন্ধকারে কাউকে সাথে করে। শেষ মুহূর্তে সেই লোকটির বিশ্বাসঘাতকতায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে। এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয় কর্নেল শেখের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওর হয়তো জানা নেই যে ডক্টর শরীফই গোপনে ইনাম আহমেদের কাছে প্রথম রিপোর্ট করেন যে, পরিমাণে অতি সামান্য হলেও কিছু কিছু ভাইরাস চুরি হচ্ছে এক নম্বর ল্যাব থেকে মাঝে মাঝেই। ইনামের মৃত্যুর পর হঠাৎ পি. সি. আই. থেকে আমার চাকরি কেন গেল

সেটাও বোধহয় তার জানা নেই কারণ, আজ সকালে সে আমাকেই সন্দেহ করেছিল সাবেরের হত্যাকারী হিসেবে।' মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিলেন মেজর জেনারেল অ্যাশট্রের ভিতর। তার মানে এসব কথা জানি, কাজের কথায় এসো 'এবং এটাও তার জানা নেই যে আমারই অনুরোধে বের করে দিয়েছিলেন ডক্টর শরীফ আমাকে রিসার্চ সেন্টার থেকে, যাতে বাইরে থেকে চোখ রাখতে পারি আমি রিসার্চ সেন্টারের ওপর। কাজেই ভুল ধারণা করা কর্নেল শেখের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় এবার আমি সংক্ষেপে আমার রিপোর্টটা সেরে নিয়ে কাজের কথায় আসছি, স্যার।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মোটামুটি সব ঘটনা জানা হয়ে গেল মেজর জেনারেল রাহাত খানের। রানা জানে, এর একটি কথাও ভুলবেন না তিনি জীবনে।

'এবার তোমার ব্যাখ্যা দাও।' সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন মেজর জেনারেল

'আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে ডক্টর শরীফ গতকাল রিসার্চ সেন্টার ছেড়ে বাইরে বেরোননি। কাজেই রাতের অন্ধকারে ফিরে আসবার কথাই ওঠে না। একজন অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক আছে এসবের পিছনে, এবং রীতিমত দলবল নিয়ে কাজ করছে সে। দু'জন অপরিচিত লোক ঢুকেছিল কাল রিসার্চ সেন্টারে দিনের বেলা।'

'কি করে?'

'খাঁচার মধ্যে করে। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ছয়টা প্রকাণ্ড খাঁচা ভর্তি গিনিপিগ, খরগোশ, ইঁদুর আসে রিসার্চ সেন্টারে সাভারের একটা ফার্ম থেকে। এতই নিয়মিত আসে যে এখন আর ওগুলো চেক করা হয় না। গতকাল এসেছিল এরকম ছয়টা খাঁচা। C-ব্লকের সামনে নামিয়ে রাখা হয়েছে তিনটে : এর মধ্যে অনায়াসে দু'জন লোক লুকিয়ে আসতে পারে। এছাড়া গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে রিসার্চ সেন্টারে বাইরের লোক ঢুকবার আর কোন পথ আমার মাথায় আসে না।'

'কিছুদিন আগে এই কথাটা মাথায় এলে কাজ হত। যাক, বলে যাও।'

'এই দু'জনের একজন ডক্টর শরীফ সেজে এসেছিল, আরেকজন এসেছিল এক নম্বর ল্যাবের কোন একজন কর্মচারীর ছদ্মবেশে, মনে করা যাক তার নাম "ক" এদের কাজ হলো ঠিক সোয়া ছয়টার সময় গেটে সিকিউরিটি ট্যাগ দেখিয়ে, সই করে বেরিয়ে যাওয়া তারা তাই করেছে খাঁচা থেকে বেরিয়ে C-ব্লকের ভিতরেই কোন নির্দিষ্ট জায়গায় লুকিয়ে ছিল ওরা ঠিক ছ'টা বাজবার কয়েক মিনিট আগে বেরিয়ে যায় ডক্টর শরীফ ল্যাবরেটরি থেকে সবশেষে বেরোতে হয় তাঁকে, কারণ উনি একবার বাইরে থেকে দরজা লক করে দিলে আর কেউ খুলতে পারবে না সবাই চলে গেছে, ডক্টর শরীফও বেরোতে যাবেন, এমন সময় পিস্তল হাতে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছে "ক" সঙ্গে দুই সঙ্গী নিজের এবং ডক্টর শরীফের সিকিউরিটি ট্যাগ বের করে দিয়েছে "ক" সঙ্গীদের হাতে। বেরিয়ে গেছে ওরা সাধারণত ওই সময়টা গেটে ভিড় হয় একটু, প্রত্যেকের প্রতি আলাদা ভাবে মনোযোগ দেবার উপায় থাকে না, কাজেই কোন অসুবিধে হয়নি ওদের।

'এদিকে ডক্টর শরীফকে খুন করে তক্ষুণি বেরিয়ে যেতে পারে না "ক"।

খাতায় সই হয়ে গেছে এবার. গেটের সিকিউরিটি গার্ডেরা জানে. বেরিয়ে গেছে সে একই গেট দিয়ে দুইবার বেরোতে পারে না "ক" কাজেই অপেক্ষা করল সে। এগারোটার সময় শেষ সিকিউরিটি রাউন্ড দিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে সাবের খান কাজেই এগারোটা পাঁচে ভাইরাসগুলো বের করে নিল সে. তারপর কানের পাশে পিস্তলের বাঁট দিয়ে জোরে আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলল ডক্টর শরীফকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঘরের ভিতর একটা ভাইরাসের শিশি ফাটিয়ে দিয়ে গেল। ডক্টর শরীফকে খুন না করে উপায় ছিল না তার. কারণ অত্যন্ত পরিচিত লোক সে ডক্টর শরীফের। কিন্তু সে জানত না যে C-ব্লকের করিডরের ওপর প্রতি রাত্রে নজর রাখত সাবের বিনকিউলার হাতে। কিংবা হয়তো এই সংশয়ের কিছু আঁচ করেছিল "ক"। হয়তো এই সম্ভাবনার কথাও ভেবে রেখেছিল সে আগে থেকে। তাই তৈরি ছিল সায়ানাইড সিরিঞ্জ হাতে। নিশ্চয়ই সাবেরেরও পরিচিত লোক ছিল সে—নইলে হ্যান্ডশেক করতে যেত না কিছুতেই সাবের।'

হাতের চেটোয় গাল ঘষছিলেন মেজর জেনারেল। বললেন, 'হতে পারে। তোমার আন্দাজ হয়তো ঠিকই। কিন্তু সাবের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। অত রাতে C-ব্লকের করিডরে কাউকে দেখলে, সে যে-ই হোক না কেন, সন্দেহ জাগবেই তার মনে। ভাইরাস চুরির ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল তাকে। কাজেই হ্যান্ডশেক করাটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে আমার কাছে। তাছাড়া হ্যান্ডশেক করে মারবার কি দরকার ছিল, পিস্তল তো ছিলই, গুলি করল না কেন?'

রানা বলে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি কি করে জানব—আমি কি ছিলাম ওখানে? সামলে নিয়ে বলল, 'তা ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার।'

'আচ্ছা যাক, তোমার এই গল্পের পিছনে নিশ্চয়ই যুক্তিপূর্ণ কারণ আছে কোন?'

'আছে, স্যার। হাউন্ডটার গলায় তার কাঁটার দাগ পাওয়া গেছে। কাঁটা তারের গায়ে রক্ত লেগে থাকা স্বাভাবিক মনে করে খুঁজলাম অনেক। ভেতরের বেড়ায় পাওয়া গেল রক্ত। তার মানে রিসার্চ সেন্টারে কাল বাইরে থেকে ঢোকেনি কেউ, স্যার—কেউ একজন বেরিয়ে গেছে ভেতর থেকে বাইরে।'

কঠিন দৃষ্টিতে চাইলেন মেজর জেনারেল রানার মুখের দিকে। তারপর ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপে বললেন, 'দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দাও, সোহানা।'

নাম তাহলে সোহানা। নতুন রিক্রুট হয়েছে। বেশ। ভাল কথা। ঠিক আছে, আমার নামও মাসুদ রানা! আসছি আবার হেড অফিসে, দেখে নেব! রূপের গুমোর দেখাবার আর জায়গা পাওনি

'শেখের চোখে পড়ল না কেন কাঁটা তারের রক্ত?'

'আমি মুছে দিয়েছি রক্তটুকু।'

'কেন?'

'আমি চাই ভুলভাল ইনভেস্টিগেশন চালাক কর্নেল শেখ। এর ফলে সন্তুষ্ট থাকবে আমাদের শত্রুপক্ষ কিন্তু, স্যার, এভাবে ওকে ঠকাতে খুব খারাপ লাগছে আমার তাছাড়া মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও অত্যন্ত পছন্দ করে ও আমাকে ওর

ধারণা, আমি আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম বলে বের করে দেয়া হয়েছে আমাকে, তাই কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ওর সাথে কাজ করতে খুব অসুবিধে লাগে, স্যার।'

'ঠিক আছে, ওটা আমি ঠিক করে দেব। কিন্তু কাজ তোমাদের করতে হবে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে বলেই এ ব্যবস্থা করেছি আমি।' বোধহয় আগে থেকেই তৈরি ছিল, একটা ট্রের উপর কফির সরঞ্জাম আর দুটো উপুড় করা কাপ সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল সোহানা। 'আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অত্যন্ত ধূর্ত এবং নৃশংস আমাদের এবারকার প্রতিপক্ষ। কেবল তাই নয় অত্যন্ত দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ দুঃসাহসী লোক সে। এর বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে চাই এর মত ধূর্ত, নৃশংস আর বেপরোয়া মানুষ। আমাদের সার্ভিসের শ্রেষ্ঠ···মানে, ভাল একজন এজেন্ট হিসেবে তাই তোমার ওপর দেয়া হয়েছে সমস্ত দায়িত্ব। কর্নেল শেখ যোগ্য লোক কিন্তু তার যোগ্যতা অর্গানাইজেশনে। আমাদের দরকার একজিকিউশন! তাই যখনই প্রয়োজন হয় Q-4 ব্রাঞ্চকে কাজে লাগাবে, কিন্তু তোমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না!'

মাথা নিচু করে কফি তৈরি করছিল সোহানা, করতেই থাকল। রানার দিকে চাইল না একবারও। রানা ভাবল, বুড়ো যখন এর সামনে সব বলছে, তখন ওর বলাতেও কোন বাধা নেই।

'কিন্তু কর্নেল শেখ যখন জানতে পারবে যে তার কাছেও গোপন করা হয়েছে আমাকে পি. সি. আই. থেকে বের করে দেয়ার আসল উদ্দেশ্য, তখন অসন্তুষ্ট হবে খুব।'

'সেটা আমার মাথাব্যথা, রানা। তোমার নয়।' কঠোর কণ্ঠে বললেন মেজর জেনারেল। 'তোমার সন্দেহের আওতায় কে কে পড়ে?'

'ধরতে গেলে সবাই,' বলল রানা। 'ডক্টর হারুন আর ডক্টর সাদেকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না। ধারে ডুবে আছে ডক্টর হারুন. এবং টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করানো যায়। ডক্টর সাদেকের অনটন, মায়ের অসুখ, ইত্যাদি ব্যাপার আছে, হঠাৎ বেশকিছু টাকা জমা হয়েছে ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে···ভাল কথা, ডক্টর সাদেকের ব্যাপারে একটা খোঁজ নিতে হবে, স্যার কালকেই। ওর নামে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কিনা জানতে হবে। খুব আর্জেন্ট। ওদিকে আছেন ডক্টর হাসমত। রিসার্চ সেন্টারের ভিতরেই থাকেন উনি। ওঁর পক্ষে কৌশলে সিকিউরিটি সেটআপ জেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব নয়। আর আছে ডক্টর সুফিয়ান। এক নম্বর ল্যাবরেটরি কবর দেয়ার ব্যাপারে তার এত চাপাচাপি···'

'ভাল কথা, রানা।' হঠাৎ কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ। 'তোমাকে জানানো দরকার আজ দুপুরে এক নম্বর ল্যাবরেটরি খোলার ব্যাপারে তুমি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছ তাতে খুশি হয়েছি আমি। যাক, বলো। তারপর?'

দু'জনের সামনে দু'কাপ কফি রেখে চলে গেল মিস···নাকি মিসেস?··· সোহানা।

'ডক্টর সুফিয়ানের কথা বলছিলাম, স্যার। অতিরিক্ত চাপাচাপি তো আছেই,

ভাইরাসের আলমারির একমাত্র চাবি ছিল তারই কাছে। এই দুটো ব্যাপারই এমন খোলাখুলি ভাবে ওই ভদ্রলোকের ওপর সন্দেহ টেনে নিয়ে যায় যে এ ব্যাপারে ভালমত ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করছি। ডক্টর সুফিয়ান সম্পর্কে আমাদের রেকর্ড কি ডাবল চেক করা হয়েছে?'

'কোয়াড্রুপল চেক করা হয়েছে। ক্লিয়ার।'

'ওদিকে চারজন টেকনিশিয়ানের ব্যাপারে কর্নেল শেখ ভালমত চেক করে দেখেছে—নির্দোষ ওরা। কাজেই সবাই ক্লিয়ার, আবার কেউই সন্দেহাতীত নয়।'

'ডক্টর সাদেকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলল কেন আবার? জুপিটারের ছবিগুলো কি তাকে সন্দেহমুক্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়?'

'না, স্যার। যে লোক নিজের হাতে ক্যামেরা, রেডিও আর টি. ভি. সেট বানায়, নিজের হাতে রিফ্লেক্টার টেলিস্কোপ তৈরি করে—তার পক্ষে আপনা আপনি ফটো উঠবার কোন মেকানিজম ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। যখন ফটো তোলা হয়েছে তখন সে যে ওখানে ছিলই এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। পাশের ঘরের ইন্টারকম চ্যানেলটা কি খোলা আছে, স্যার?'

অবাক হয়ে চাইলেন মেজর জেনারেল রানার দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'না। সুইচটা অফ করা আছে। আমাদের কথা শোনা যাচ্ছে না পাশের ঘরে। কেন জিজ্ঞেস করলে এ কথা?'

'কৌতূহল, স্যার।'

'মেয়েটা বড় ভাল। খুবই বুদ্ধিমতী। মুখ থেকে পড়ার আগেই সব কথা বুঝে নেয়।'

কথাটায় হয়তো একটু স্নেহের সুর ছিল, হঠাৎ অযৌক্তিক ভাবে ভয়ানক ঈর্ষা বোধ করল রানা মেয়েটির প্রতি। রানার অনুপস্থিতির সুযোগে সে যে অন্যায় ভাবে বুড়োর মনে একটা স্নেহের আসন করে নিয়েছে, এটা মনে করে অকারণেই চটে গেল সে সোহানার ওপর।

চুপ করে রইলেন মেজর জেনারেল। সিগারেট ধরালেন একটা। ম্যাচের বাড়তি আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল একবার রানা কপালের ডান ধারে একটা শিরা টিপ টিপ্ করছে রাহাত খানের। কি ব্যাপার! এত উত্তেজিত কেন লোকটা ভিতর ভিতর? তবে কি যা সন্দেহ করেছিল তাই ঘটে গেছে। ভয়ঙ্কর কোন ব্যাপার না ঘটলে···

'এই সবকিছুর পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় তোমার, রানা?' ধীর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'ব্ল্যাকমেইল, স্যার। ব্ল্যাকমেইলের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এখন আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে আছে। খুব সম্ভব বিরাট একটা টাকার অঙ্কের স্বপ্ন দেখছে সে। আমরা যদি এই ভাইরাস ফেরত পেতে চাই তাহলে এত শো কোটি টাকা দিতে হবে, নইলে বাইরের কোন রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেবে সে এগুলো—এই ধরনেব কিছু হুমকি আশা করছি আমি আজ কালের মধ্যে। কিন্তু আসল ভয় যেটা, সেটা হচ্ছে এই লোকটা মানসিক বিকারগ্রস্ত কোন খেপা লোক হতে পারে। অত্যন্ত প্রতিভাবান

কোন উন্মাদ যদি করে থাকে কাজটা, তাহলে হয়তো 'মানুষকে রক্ষা করব আমি মানুষের হাত থেকে।' এই ধরনের চিঠি আসবে! কিংবা 'যুদ্ধকে নির্মূল করো, নইলে যুদ্ধ নির্মূল করবে তোমাদের।' কিংবা হয়তো লিখবে, 'রিসার্চ সেন্টারটা ধ্বংস করে দিতে হবে তোমাদের নইলে আমি ধ্বংস করে দেব তোমাদের।' হয়তো নিউজ এজেন্সী কিংবা পত্রিকাগুলোয় এতক্ষণে তার চিঠি পৌঁছে গেছে হয়তো সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে সে, ভাইরাসগুলো তার হাতের মুঠোয় রয়েছে, এবং তার কথামত কাজ না করলে শাস্তি দেবে সে।'

দপ্ দপ্ করে লাফাচ্ছে এখন শিরাটা। ঘাম দেখা দিয়েছে মেজর জেনারেলের কপালে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি রানার দিকে।

'চিঠি দেখেই এমন মনে করবার কারণ কি তোমার?'

'চিঠি দিক বা টেলিফোনে জানাক, খবরটা প্রচার করতেই হবে ওকে, স্যার কারণ হচ্ছে প্রেশার সৃষ্টি করা। উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে ব্ল্যাকমেইল করা যায় না। চাপ সৃষ্টি করতে হলে পাবলিসিটি চাই। ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করে তুলতে হবে সমগ্র দেশবাসীকে। এমনই প্রবল ভীতির সঞ্চার করতে হবে মানুষের মনে, যেন তাদের চাপে সরকার ব্ল্যাকমেলারের যে কোন দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।'

'আজ রাত সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কোথায় কি করছিলে তুমি, রানা?'

'সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা...' চমকে উঠল রানা। টঙ্গি আর কুর্মিটোলার মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় ছিল তখন সে আর অনীতা, গাড়ির ব্যাক সীটে। অন্তর্যামী নাকি লোকটা। নাকি কেউ রিপোর্ট করল? ওরা মনে করেছিল অন্ধকার এই দুর্যোগের রাতে কাক পক্ষীও টের পাচ্ছে না—তাহলে কি সব দেখে এসে রিপোর্ট করেছে কেউ বুড়োর কাছে? 'আমি...মানে আমরা...গাড়িতে ছিলাম, স্যার; ঢাকা ফেরার পথে...' থতমত খেয়ে গেল রানা।

'তোমাকে কোন রকম কিছু সন্দেহ করছি না আমি, রানা, আমি তোমাকে তোমার চেয়েও ভাল করে চিনি। কিছু মনে কোরো না, এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা। আমি জানি কোন অন্যায় বা খারাপ কাজ করা তোমার দ্বারা অসম্ভব।' পেপার ওয়েটটা সরিয়ে ভাঁজ করা কাগজটা ঠেলে দিলেন তিনি কিছুটা রানার দিকে। 'এটা পড়ে দেখো, রানা।'

সামনে ঝুঁকে কাগজটা তুলে নিল বিস্মিত রানা টেবিল থেকে। স্থানীয় একটি নিউজ এজেন্সীর ডিসপ্যাচ শীট। ইংরেজী ক্যাপিটাল লেটারে টাইপ করা আছে মেসেজটা।

'যুদ্ধকে নির্মূল করো, নইলে যুদ্ধ নির্মূল করবে তোমাদের। পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ—ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার ক্ষমতা এখন আমার হাতের মুঠোয়। আটটা বটুলিনাস টক্সিনের বোতল আছে আমার কাছে। টঙ্গির মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার থেকে সংগ্রহ করেছি আমি ওগুলো

চব্বিশ ঘণ্টা আগে সংগ্রহ করতে গিয়ে দু'জন লোককে হত্যা করতে হয়েছে আমাকে—সেজন্যে দুঃখিত। কিন্তু গোটা মানব জাতির অস্তিত্বই যখন বিপন্ন, তখন দু'জন লোকের প্রাণনাশ এমন কিছুই বড় ক্ষতি নয়।

'আটটা বোতলের যে-কোন একটার মধ্যে যে পরিমাণ ভাইরাস আছে, তা দিয়ে সমগ্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিতে পারি আমি। অন্যায় দিয়ে দমন করব আমি অন্যায়কে— কাঁটা দিয়ে তুলব কাঁটা।

'রিসার্চ সেন্টারের বিলুপ্তি চাই আমি। এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেয়া হোক ওখানকার সমস্ত রিসার্চ। পাপের বাসা ওটা। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হোক ওটাকে, বুল ডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হোক। একটা ইঁটও যেন অবশিষ্ট না থাকে। রিসার্চ সেন্টারটা ধ্বংস করে দিতে হবে তোমাদের, নইলে ধ্বংস করে দেব তোমাদের।

'কাল বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সকালের সংবাদে আমি আমার এই প্রস্তাবের সম্মতিসূচক উত্তর চাই।

'যদি আমার এই আদেশ উপেক্ষা করা হয়, এর বিরুদ্ধে আমি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সবকিছু ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হব আমি। এটা পরম করুণাময় আল্লাহ তালার ইচ্ছা—আমি তাঁর প্রেরিত পুরুষ।

'মানুষকে রক্ষা করব আমি মানুষের হাত থেকে।'

আগাগোড়া দুইবার পড়ল রানা মেসেজটা। ওই লোকেরই কাজ, সন্দেহ নেই তাতে। রিসার্চ সেন্টারের বাইরে আর কেউ জানে না যে আটটা ভাইরাসের বোতল চুরি গেছে।

'তোমার কি মনে হয়, রানা?'

'পাগল, স্যার। বদ্ধ পাগল। ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ...'

'ঠিক বলেছ। তোমার ভবিষ্যদ্বাণীও কেমন কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল দেখেছ?'

'জি, স্যার। মনে হচ্ছে আমারই লেখা। কখন এসেছে, স্যার মেসেজটা?'

'সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে।'

এতক্ষণে বুঝল রানা মেজর জেনারেলের আগের সেই প্রশ্নের তাৎপর্য। সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে রানা কোথায় কি করেছিল জিজ্ঞেস করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। কথাটা এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি, রানার ওপর ওঁর কোন রকম সন্দেহ নেই ইত্যাদি বলবারও কারণ বোঝা গেল এতক্ষণে।

'টেলিফোনে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ! ও. পি. পি-র অফিসে এসেছে এই মেসেজ। টেলিফোনে ডিকটেশন দিয়েছে লোকটা। ওরা এটাকে কোন গাঁজাখোরের খেয়াল মনে করে হেসে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল—কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে রিসার্চ সেন্টারে ফোন করে দেখা সাব্যস্ত করল। মুখে মুখে সারা টঙ্গিময় ছড়িয়ে গেছে খবর ইতিমধ্যে—কিন্তু রিসার্চ সেন্টার থেকে অস্বীকার করা হলো এ খবরের সত্যতা। কিন্তু ও. পি. পি-র ফোন পেয়ে ওদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই বুঝে ফেলল ওরা যে ভিতরে কোন ব্যাপার আছে। ()-I বাকে ফোন করেও সদুত্তর পাওয়া গেল না। খবরটা

রিলিজ করবে কি করবে না এই নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে যখন বাক-বিতণ্ডা হচ্ছে, এমন সময় আমাদের নির্দেশে উঁচু একটা মহল থেকে চেপে দিতে বলা হলো ওদের খবরটা কালকের কাগজে যাবে না ঠিকই, কিন্তু পরও পর্যন্ত এ খবর ঠেকানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না আমার।' একটু চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ তারপর বললেন, 'তোমার কি মনে হয় লোকটা সত্যিই পাগল?'

'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি, স্যার। চিঠি দেখলে যে-কোন লোক পাগলের প্রলাপ মনে করবে, কিন্তু ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে গেলে পাবলিসিটি দরকার। এবং ভীতিটা আতঙ্কে পরিণত হতে পারে তখনই, যখন মানুষ মনে করবে একটা পাগলের হাতে রয়েছে আটটা বোতল, সে জানেও না যে এগুলোর তিনটের মধ্যে আছে কালকূট—ভুল করে বটুলিনাস মনে করে কালকূটের একটা বোতল ভেঙে ফেলতে পারে সে যে-কোন মুহূর্তে। হৈ-চৈ পড়ে যাবে দুনিয়াময়। যা চায় তাই দিয়ে ভালয় ভালয় ওর কাছ থেকে ভাইরাসগুলো হাত করবার জন্যে প্রচণ্ড চাপ আসবে চারদিক থেকে। প্রতিটা চাল হিসেব-কিতেব করে চালা মনে হচ্ছে, স্যার আমার কাছে।'

'হয়তো সত্যিই জানে না সে যে কালকূটের বোতল আছে ওর কাছে?' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'জানে বলে ধরে নিচ্ছ কেন?'

'ধরে নিচ্ছি না, স্যার। আমি জানি। যে লোক এতসব খোঁজ খবর নিয়ে নিখুঁত ভাবে চুরি এবং খুন করে কৌশলে বেরিয়ে আসতে পারে রিসার্চ সেন্টার থেকে—সে না জেনে কোন কাজ করবে না। প্রতিটা কাজে যে লোক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, বোতলগুলোর ভিতর বটুলিনাস টক্সিন আছে এটা তার জানা আছে, কিন্তু কালকূটের কথা জানা নেই—এটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমার কাছে। যাক, ভাইরাস চুরির ব্যাপারটা না হয় পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না, কিন্তু রিসার্চ সেন্টারের ভিতর হত্যাকাণ্ডের খবরটা? ওটা কি ছাপা হচ্ছে, স্যার?'

'ওটা ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই। টঙ্গির সমস্ত লোক জানে খবরটা। নিজস্ব প্রতিনিধি মারফত খবর পৌঁছে গেছে সব পত্রিকা অফিসে। কাল প্রত্যেকটা পত্রিকাতেই ছাপা হবে এ খবর।'

'আমি এবার চলি, স্যার। টঙ্গি যেতে হবে আমাকে আজ রাতেই।'

'কি করতে চাও ওখানে গিয়ে?'

'আবার একবার দেখা করতে চাই আমি, স্যার এক নম্বর ল্যাবের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে। রিসার্চ সেন্টারে সকাল সাতটার আগে ঢোকা যাবে না। তাই ডক্টর হাসমতের সাথে টেলিফোনে কথা বলব। একটা কিছু ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর রি-অ্যাকশন দেখতে হবে। তারপর ভোর রাতের দিকে দেখা করব ডক্টর হারুন, ডক্টর সাদেক আর ডক্টর সুফিয়ানের সঙ্গে। তারপর ধরব একে একে প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ানকে। প্রত্যেকের কাছে এমন ভাব দেখাব যেন অনেক কিছুই জানি আমি। প্রতিপক্ষের লাইন অভ অ্যাকশন জানা হয়ে গেছে আমাদের। এবার তাকে একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে ফেলতে হবে। এখন আর সময় নষ্ট করা চলে না। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কালকূট ফিরিয়ে নিয়ে আসব আমি রিসার্চ সেন্টারে।'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ মেজর জেনারেল রানার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল দৃষ্টিটা। এক টুকরো হাসি ফুটল তাঁর উদ্বিগ্ন মুখে। 'আর কারও মুখে কথাটা শুনলে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু মাসুদ রানার কথায় বিশ্বাস করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রানা, সত্যিই পারবে তুমি?'

'পারব, স্যার।'

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ।

নয়

বৃষ্টি কমেছে, কিন্তু ছাড়েনি সম্পূর্ণ। আকাশের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আরও অনেক ব্যথা চাপা আছে তার বুকে—একটু সমবেদনা পেলেই ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলবে। ফিরে এল রানা গুলশানে। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে দরজা খুলে দিল অনীতা। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে মোখলেসের নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। রাত সোয়া একটা।

'গিলটি মিঞা আসেনি এখনও?' জিজ্ঞেস করল রানা ঘরে ঢুকেই।

'না। ক'টা বাজে এখন?' হাই তুলে তুড়ি দিল অনীতা।

'সোয়া একটা! কিন্তু এতক্ষণে তো এসে পড়া উচিত ছিল! কোন বিপদে পড়ল...'

'হয়তো ঝড়-বৃষ্টির রাতে কোন ট্রাক বা লরী পায়নি, রয়ে গেছে টঙ্গিতেই।' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'সবকিছুর মধ্যে বিপদের গন্ধ পাও শুধু তুমি রানা। গিলটি মিঞার ফিরে আসার সময় পার হয়ে যায়নি এখনও। এসো তো, সারাদিন সারারাত ছুটোছুটি করে নিজেকে অনর্থক হয়রান না করে একটু বিশ্রাম করে নাও।'

'ঠিক তিনটের সময় টঙ্গি যেতে হবে আমাকে, এখন বিশ্রাম করতে গেলে ঘুমিয়ে পড়ব। আর উঠতে পারব না সকাল দশটার আগে।'

'চলো তো তুমি বিছানায়, আগে শুনব আমি কি এমন দরকার রাত তিনটার সময় টঙ্গি যাবার। যদি জুতসই কৈফিয়ত দিতে পারো তাহলে নাহয় আমিই উঠিয়ে দেব ঘুম থেকে।'

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল অনীতা রানাকে নিজের ঘরে। বিছানার ধারে বসিয়ে খুলে দিল জুতো মোজা কোট টাই। দুই হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল রানা ওকে, বাধা দিল অনীতা।

'এখন ওসব না, লক্ষ্মী। বিশ্রাম দরকার তোমার। শুয়ে পড়ো চুপচাপ, আমি আসছি।'

বাথরুমে ঢুকল অনীতা। শুয়ে পড়ল রানা। বিছানায় শুয়ে একটা চাদর টেনে

নিল গায়ের ওপর চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে এল অনীতা। মাথার কাছে বসে ঠাণ্ডা হাতটা রাখল রানার কপালে

সংক্ষেপে বলল রানা খেপা লোকটার মেসেজের কথা! কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে অনীতা বলল, 'ঠিক আছে তিনটের সময় উঠিয়ে দেব। ঘুমোও তুমি। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলগিরি রাখো দেখি, নীতা। মাথার কাছে কেউ বসে থাকলে ঘুম হয় না আমার'

'আমি তাহলে চেয়ারে গিয়ে বসছি, তুমি…'

'ভাল চাও তো উঠে এসো, নীতা বিছানায়। পাশে শুয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে দেখবে তিন মিনিটে ঘুম এসে গেছে আমার।'

'পাশে শুলে আবার আমার গায়ে হাত বুলোতে চাইবে না তো?'

'বুলোই যদি খসে যাবে না তোমার গা-টা। শুয়ে পড়ো। বসে বসে পিঠ ব্যথা করতে হবে না। জীবনে আমার পাশে শোয়ার আর চান্স নাও পেতে পারো।'

'ছিঃ এসব অলক্ষুণে কথা বোলো না। তোমার কথা আবার ফলে যায় ঠিক। নাও চোখ বন্ধ করো।'

পাশে শুয়ে আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে দিল অনীতা রানার পিঠে। দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। গভীর শ্বাস প্রশ্বাস বইছে ঘুমন্ত রানার। আকাশ পাতাল ভাবছে অনীতা।

করাচীর বিচ লাগজারি হোটেলে দেখা, তারপর থেকে কি অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে সে রানার জীবনে। অনেক সাধনার পর এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে সে রানার। কিসের সন্ধানে এসেছিল সে করাচী থেকে ঢাকায়? কেন পাগলের মত খুঁজেছে সে এই লোকটাকে সারা দেশময়? কি আছে এর মধ্যে যার অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করবার শক্তি নেই তার? যাদু জানে নাকি লোকটা? নইলে সাধারণ একজন লোক…না, হঠাৎ বুঝতে পারল অনীতা। সাধারণ লোক নয় মাসুদ রানা। যে লোকের কাছে নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনের মূল্য অনেক বেশি, অন্যের জন্যে সত্যি সত্যিই যে লোক প্রাণ দিতে পারে, সে লোক কিছুতেই সাধারণ হতে পারে না আত্মপ্রেমের গণ্ডির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারা সাধারণ লোকের কাজ নয় নিরাসক্ত এক সন্ন্যাসী বাস করে রানার বুকের ভেতর। বন্ধনহীন সন্ন্যাসী রানার রহস্যটাই এখানে। সাধারণের ছদ্মবেশে লুকিয়ে রেখেছে সে একটা মহৎ প্রাণকে। কাছে এলেও ধাঁধা লাগে, বোঝা যায় না ঠিক! যে চিনে নেবে সে পাবে পরশমণি

হালকা চুম্বন করল অনীতা রানার কপালে। বুকের ভিতর পুরে রাখতে ইচ্ছে করে ওর রানাকে। চোখের মণির মধ্যে পুরে চোখ বন্ধ করে রাখতে ইচ্ছে করে। ভয় হয়, নইলে হারিয়ে যাবে। হঠাৎ হারিয়ে যাবে, আর পাওয়া যাবে না খুঁজে। তখন আর বেঁচে থাকবার কোন অর্থ থাকবে না অনীতার জীবনে। মরুভূমি হয়ে যাবে সে নিজেকে নিঃস্ব করে সঁপে দিয়েছে অনীতা রানার হাতে প্রেমে পড়েছে অনীতা প্রেমে পড়েছে। অনেক কাঁটার পথ পার হয়ে, অনেক খুঁজে পেয়েছে সে

তার মনের মানুষ।

খট্ খট্ খট্

দরজা খুলল হাসিনা। নিচু গলায় বলল, 'ওহ্, আপনি। হঠাৎ এই ভোর রাতে...'

'ডক্টর সাদেক আছেন? অত্যন্ত দরকার পড়েছে তাই আসতে হলো। এই অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'ভেতরে আসুন।' বিরস কণ্ঠে বলল হাসিনা। রানাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে চলে গেল সে বাড়ির ভিতর। খানিক বাদেই উষ্কখুষ্ক অবস্থায় ড্রইংরুমে এসে ঢুকল ডক্টর সাদেক। সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে, চোখের কোণে ময়লা।

কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ ডক্টর সাদেকের দিকে। তারপর বলল, 'আমার আরও কিছু প্রশ্ন আছে, ডক্টর সাদেক। আশাকরি সোজাসুজি উত্তর দেবেন। আজ রাতে কিছু সাংঘাতিক তথ্য হাতে এসেছে আমাদের। সেজন্যে আবার আসতে হলো আমাকে।' হাসিনার দিকে চাইল রানা। 'আপনাকে আতঙ্কিত করে তুলতে চাই না আমি। আপনার বোধহয় এখানে উপস্থিত না থাকাই ভাল। যা বলার আপনার ভাইকেই বলতে চাই আমি, একা।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল হাসিনা রানার দিকে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, কথা সরছে না মুখে। ঢোক গিলে চলে যাচ্ছিল সে মাথা নেড়ে, বাধা দিল ডক্টর সাদেক

'তুই থাক, হাসিনা। কোন গোপন কথা থাকতে পারে না আমার আপনার সঙ্গে, মিস্টার রানা। গোপন করবার কিছুই নেই আমার। আমার বোনের সামনেই বলুন আপনি কি বলবেন।'

'থাকতে চান, থাকুন।' পৈশাচিক হাসি হাসল রানা। 'তবে পরে পস্তাতে পারবেন না।' ভাইবোন দু'জনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে ওরা অশুভ কিছু শুনতে হবে মনে করে। 'কাল রাত ন'টা সাড়ে ন'টার দিকে কোথায় কি করছিলেন আপনি, ডক্টর সাদেক?'

'কাল রাতে?' চোখ মিটমিট করল ডক্টর সাদেক। 'কাল রাতে আবার কি হলো?'

'উত্তর চাই আমি। প্রশ্ন নয়।'

'কাল রাত ন'টা? আপনারা গেলেন আটটার দিকে। তারপর থেকে বাসায়ই ছিলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে অবজারভেটরীতে গিয়ে বসেছিলাম, খানিক বাদেই ঝড়বৃষ্টি এসে পড়ায় নিচে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'বাইরের কেউ আসেনি কাল, যে আপনার এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে?'

'না।'

'অর্থাৎ, কোন সাক্ষী নেই।' ভিলেনের চাপা হাসি হাসল রানা। 'কাল আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন? গাড়ি চালাতে জানেন না আপনি?' আন্দাজে

ঢিল ছুঁড়ল রানা।

'জানি না।'

'সকাল সাতটার মধ্যে যদি চারজন সাক্ষী এনে হাজির করতে পারি তাহলে স্বীকার করবেন?'

ঘাবড়ে গেল ডক্টর সাদেক। 'একটু আধটু হয়তো চেষ্টা করেছি কখনও বন্ধু-বান্ধবের গাড়িতে কিন্তু···সত্যিই বলছি গাড়ি নেই আমার, চালাতেও জানি না।'

'বিরক্ত করে তুলছেন আপনি আমাকে। বুদ্ধিমান লোক হয়ে বোকার মত ব্যবহার করেছেন আপনি, ডক্টর। আপনার বাবার গাড়ি ছিল, আপনি চালাতে জানেন; এটা অস্বীকার করছেন কেন? মিস হাসিনা, আপনি বলুন, আপনার ভাই গাড়ি চালাতে জানেন না?'

'হাসিনাকে এর মধ্যে আর জড়াবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা। স্বীকার করছি, চালাতে জানি আমি গাড়ি। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'হয়। প্রমাণ করবার ভার যাদের ওপর তারা এ থেকেই অনেক কিছু প্রমাণ করে দেবে। যাক, পরশু রাতে মরিস মাইনর গাড়িটা নিজের বাড়ির সামনে ফেলে রেখেছিলেন কেন? ভেবেছিলেন, এর ফলে পুলিস আপনাকে সন্দেহমুক্ত বলে মনে করবে?'

'একটা কথা আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, মিস্টার রানা—ওই গাড়ি চালানো তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত দেখিনি আমি ওটা। কাল রাতে আপনার মুখেই প্রথম শুনেছিলাম আমি ওটার কথা। আপনার ভাবসাব দেখে ভয় পেয়ে মিছে কথা বলেছিলাম। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্যে।'

'নির্দোষ!' মুচকে হাসল রানা। 'জুপিটারের ছবিগুলো কি আপনি তুলেছিলেন, না আর কেউ? নাকি কোন যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, যাতে আপনি রিসার্চ সেন্টারে ব্যস্ত, তখন আপনাআপনি উঠে যায় ছবি?'

'যন্ত্র!' অবাক হলো ডক্টর সাদেক। 'কি আবোলতাবোল বকছেন আপনি? সারা বাড়ি সার্চ করে দেখুন না কোন যন্ত্র পাওয়া যায় কিনা।'

'বাড়ির বাইরে পাচার করে দিলে আর বাড়িতে পাওয়া যাবে কি করে? হয়তো কোথাও···'

'মিস্টার, মাসুদ রানা।' রানার সামনে এসে দাঁড়াল হাসিনা। উত্তেজনায় দুই হাত থরথর করে কাঁপছে, জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ। 'ভয়ানক কোন ভুল করছেন আপনি। ওই খুন-খারাবির সঙ্গে ভাইয়ার কোন সম্পর্ক নেই। আমি হলপ করে বলতে পারি কোন দোষ নেই ভাইয়ার।'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে না, মিস হাসিনা। আপনি আপনার ভাই সম্পর্কে সবই যদি জানেন, তাহলে বলুন গত তিন মাসের মধ্যে আপনার ভাইয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দশ হাজার টাকা জমল কি করে? পাঁচ হাজার জমা হয়েছে ১৩ মে, বাকি পাঁচ হাজার ১ আগস্ট কোথা থেকে এল এই টাকা?'

ভ্রাতা-ভগ্নি পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওদের দু'জনের

চেহারা। স্পষ্ট ভীতি প্রকাশ পেল ওদের চোখে। দু'বার তিনবার চেষ্টার পর যখন ডক্টর সাদেকের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল তখন স্বরটা ভাঙা ভাঙা, কাঁপছে।

'নিশ্চয়ই··· নিশ্চয়ই কেউ আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে···'

'বাজে কথা বলবেন না।' ধমকে উঠল রানা 'কোথা থেকে এল টাকাগুলো?'

একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিল ডক্টর সাদেক, তারপর মিন মিন করে বলল, 'গহর মামা। গহর মামা দিয়েছে '

'দিয়েছে তো খুব ভাল কাজ করেছে। কে সে?'

'মা'র আপন ছোটভাই।' মৃদু কণ্ঠে বলল ডক্টর সাদেক। 'খুব সম্ভব কুসংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উনি কসম খেয়ে বলেন, যে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ওঁকে, আসলে উনি সে অপরাধ করেননি। কিন্তু সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ ওঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল বলে না পালিয়ে উপায় ছিল না আর।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ দুই ভাইবোনের মুখের দিকে। তারপর বলল, 'এ দেখছি আরেক গপ্পো ফেঁদে বসলেন। কি বলছেন আপনি, কিসের অপরাধ?'

'তা জানি না।' মরিয়া হয়ে বলল ডক্টর সাদেক। 'আমরা জীবনে কখনও দেখিনি তাঁকে। দু'বার শুধু ফোন করেছিলেন উনি রিসার্চ সেন্টারে। মা কোন দিন ওঁর কথা বলেননি আমাদের। এই ক'দিন আগে পর্যন্ত আমরা জানতামই না যে আমাদের আপন মামা আছেন একজন।'

'আপনিও এ ব্যাপারটা জানেন নিশ্চয়ই।'

'জানি।' জবাব দিল হাসিনা।

'আপনাদের মা?'

'মা জানেন না।' জবাব দিল ডক্টর সাদেক। 'বললাম না, মা কোনদিন ওঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি আমাদের সামনে। আমরা এতদিন জানতাম মা আমাদের নানা-নানীর একমাত্র সন্তান। বোধহয় অত্যন্ত নিচু কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন গহর মামা। উনি সাবধান করে দিয়েছিলেন আগেই, টাকাটা কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে জানলে কিছুতেই গ্রহণ করবেন না মা—মা'র সামনে ওঁর নামও যেন উচ্চারণ করা না হয়। এই টাকায় মাকে আমরা মারী পাঠাচ্ছি।'

হাসল রানা ওর রক্ত হিম করা হাসি। 'আর আমি পাঠাচ্ছি আপনাদের হাজতে। কারণ, যে গল্প তৈরি করেছেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি সকাল আটটার মধ্যে কয়েক জায়গায় টেলিফোন করে প্রমাণ করে দিতে পারি যে আপনার মা সত্যি সত্যিই তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। গহর মামার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বারোটা বেজে যাবে আপনাদের। কাজেই নতুন কোন গল্প উদ্ভাবনের চেষ্টা করুন। ততক্ষণে আপনার মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলব আমি।'

'খবরদার। মাকে টানাটানি করবেন না এর মধ্যে।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ডক্টর সাদেক 'মা অত্যন্ত অসুস্থ। ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না আপনার।'

এসব কথায় কান না দিয়ে হাসিনাকে বলল রানা, 'যান, আপনার মাকে বলুন, আমি দেখা করব একটু।'

ঘুসি পাকিয়ে এগোতে যাচ্ছিল ডক্টর সাদেক, বাধা দিল হাসিনা। 'থাক, ভাইয়া।' রানার আপাদমস্তক দেখল একবার সে বিষ দৃষ্টিতে। 'এর সঙ্গে মারামারি করে লাভ নেই। যা চায় তা করে ছাড়বে।'

দুই মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে ডেকে পাঠালেন রানাকে ডক্টর সাদেকের মা। একা গেল রানা ওঁর ঘরে, দুই ভাইবোনকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বলে। দশ মিনিট পর ফিরে এল সে বৈঠকখানায়।

করুণ মিনতি ভরা চোখ নিয়ে চাইল হাসিনা রানার দিকে। 'আপনি কোথাও মস্ত ভুল করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আমার ভাইকে আমি ভালমত চিনি। আপনি বিশ্বাস করুন, ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'সেটা প্রমাণ করবা সুযোগ পাবেন উনি কোর্টে! ডক্টর সাদেক, আমার মনে হয় কয়েক দিনের আন্দাজ কিছু জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে তৈরি হয়ে থাকাই আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'তার মানে অ্যারেস্ট করছেন আমাকে?' কেঁপে গেল ডক্টর সাদেকের গলা।

'না। আমার কাছে ওয়ারেন্ট নেই। কিন্তু চিন্তা করবেন না, লোক এসে যাবে। আর, দয়া করে আপনার গহর মামার মত পালাবার চেষ্টা করবেন না। এ বাড়িটা চারপাশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।'

'কি··· কি বললেন। বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিস?' বিস্ফারিত হয়ে গেল ডক্টর সাদেকের চোখ। বেরিয়ে গেল রানা ঠোঁট বাঁকানো হাসি হেসে।

বৃষ্টিটা চেপে এসেছে আবার।

থানা থেকে দুই তিন জায়গায় টেলিফোন করল রানা। প্রত্যেকেই বিরক্ত হলো ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ায়, কিন্তু নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু ঘটেছে মনে করে চেপে গেল বিরক্তি। বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না টেলিফোন করে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বলল রানা তদন্ত এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেচে যে সন্ধ্যার আগেই সমাধান হয়ে যাবে কেস। প্রত্যেকেই প্রশ্ন করল, কতদূর এগিয়েছে রানা, কোন পথে এগোচ্ছে; কিন্তু কৌশলে এড়িয়ে গেল রানা এসব প্রশ্নের উত্তর। কারণটা সহজ, উত্তর দেয়ার মত কোন তথ্য জানা নেই রানার; ওদের কাছে ভাব দেখাল—যে চেপে যাচ্ছে সে।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় ডক্টর আবু সুফিয়ানের বাড়িতে কলিং বেলের বোতাম টিপল রানা। পুবের আকাশটায় একটু ফর্সা ফর্সা ভাব, কিন্তু অন্ধকার দূর হয়নি এখনও বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ডক্টর সুফিয়ানের। হাসিমুখে দরজা খুলে দিল।

'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। ভেতরে আসুন খুব কাহিল দেখাচ্ছে

আপনাকে।'

চমৎকার সাজানো গোছানো একটা ড্রইংরুম। রানা বসল একটা সোফায়। মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল ডক্টর সুফিয়ান। সোজাসুজি চাইল সে রানার দিকে।

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'সাত সকালে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু...'

'অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন হওয়ায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই তো?' রানার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল ডক্টর সুফিয়ান। 'কিছু প্রশ্ন আছে আপনার, জিজ্ঞেস করুন।'

'কাল রাত সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কোথায় ছিলেন আপনি?'

'কেন, আমি তো বলেছি কর্নেল শেখের সেই ইন্সপেক্টরকে! আমি ছিলাম...'

'আপনি পরশু রাতের কথা ভাবছেন। আমি গতকাল রাতের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'ওহ্ হো। সরি।' হঠাৎ উদ্বিগ্ন মুখে চাইল ডক্টর সুফিয়ান রানার চোখের দিকে। 'কেন? কিছু ঘটেছে? আবার খুন হয়েছে নাকি কেউ কাল রাতে?'

'না, খুন হয়নি। কোথায় ছিলেন? বাসায়?'

'না। কাল রাত সাড়ে দশটায় বাসায় ফিরেছি আমি।' চিন্তিত মুখে বলল, 'সোয়া নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা...ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। টঙ্গি ক্লাবে গল্প করছিলাম কর্নেল শেখের সঙ্গে।'

'কর্নেল শেখের সঙ্গে?' অবাক হলো রানা।

'হ্যাঁ। এখন ভাবছি, ভাগ্যিস কর্নেল শেখের সঙ্গেই গল্প করছিলাম! নইলে না জানি কোন্ ব্যাপারে সন্দেহভাজনদের একজন হয়ে যেতাম। আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে, মিস্টার রানা?'

'সন্দেহ থাকলে তো দূর হবে। আসলে আমাদের কাজে এলিমিনেশন অভ ডাউট একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আপনার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না আমার। রুটিন চেক করতেই হয়, তাই আসা।'

'শুনে সুখী হলাম। সকাল তো হয়ে গেছে, চা-টা দিতে বলি?'

'না, অনেক ধন্যবাদ।' উঠে পড়ল রানা। 'এখন যেতে হবে আরও কয়েক জায়গায়। চলি!'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ডক্টর সুফিয়ান রানাকে। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার জিজ্ঞেস করা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু কৌতূহল চাপতে পারছি না—আচ্ছা ওই পিশাচটাকে ধরবার কোন সম্ভাবনা আছে? মানে, আপনাদের কাজে কিছু অগ্রগতি হলো?'

'হয়েছে। অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছি আমরা। এবং খুব সম্ভব ঠিক পথেই চলেছি। আমার বিশ্বাস আজ সন্ধ্যার আগেই চুকে যাবে সবকিছু।'

'আজ সন্ধ্যার আগেই? তাহলে তো সত্যিই অনেকদূর এগিয়েছেন বলে মনে

হচ্ছে!'

'কথাটা আপনাকে বলা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছি না। আশাকরি দয়া করে গোপন রাখবেন ব্যাপারটা।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

এবার ডক্টর হারুন। ওখানকার কাজ সেরে, আবার কয়েকটা ফোন, তারপর কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকে নাস্তা, এবং সবশেষে কর্নেল শেখ। ব্যস, বেলা বারোটা পর্যন্ত ছুটি। গিলটি মিঞাকে খুঁজে বের করতেই হবে এই অবসর সময়টুকুর মধ্যে।

সামনে একটা ছোট্ট পাকা ঘর। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের সাব-স্টেশন। হেড-লাইটের আলোয় ছোট্ট একটা মুখ দেখতে পেল রানা। পাকা ঘরটার ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে গাড়িটার দিকে চেয়েছিল, চট্ করে আড়ালে সরে গেল কাছাকাছি এসে পড়তেই।

গিলটি মিঞা।

গাড়ি থামাল রানা। কিন্তু গিলটি মিঞাকে দেখতে পাওয়া গেল না। বোধহয় চিনতে পারেনি রানার গাড়ি, ঘরটার পিছনে লুকিয়েছে। দু'বার ডাকল রানা। কোন সাড়াশব্দ নেই। হয়তো গাড়িটা থামাতে দেখে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে, এ তল্লাটেই নেই।

ঝট্ করে নামল রানা গাড়ি থেকে। কয়েকটা তথ্য জানা দরকার—গিলটি মিঞাকে এখন যদি পেয়েও হারায় তাহলে অসুবিধা হবে। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল রানা। ঘরটার শেষ মাথায় পৌঁছে পিছনে যাবার জন্যে মোড় ঘুরতেই দড়াম করে প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল ওর নাকের ওপর। টলে উঠল রানা। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না সে আর চোখে। দেয়ালটা ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করল। তলপেট বরাবর লাথি এসে লাগল একটা। ককিয়ে উঠে বাঁকা হয়ে গেল রানা সামনের দিকে। এবার প্রচণ্ড বেগে নেমে এল একটা পিস্তলের বাঁট রানার মাথা লক্ষ্য করে। দপ্ করে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

জ্ঞান হারাল রানা।

নীল আতঙ্ক-২

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৬৯

এক

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। প্রথমে মনে হলো হৈ হৈ করে কথা বলছে অনেক লোক, তারপর হঠাৎ থেমে গেল সব। চারদিক নিস্তব্ধ। দূর থেকে বৃষ্টির শব্দ আসছে ভেসে। সারা শরীর এমন ব্যথা করছে কেন? মাথায়, ঘাড়ে, ডানদিকের বুকের পাঁজরে তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা। কি হয়েছে? ট্রাকের নিচে পড়েছিল না কি সে? না, সেই ছোট্ট পাকা ঘরটার পিছনে আক্রমণ করেছিল কেউ ওকে আচমকা। গিলটি মিঞাকে খুঁজতে গিয়েছিল সে ওখানে।

চোখ খুলল রানা। ঝাপসা মত দেখা যাচ্ছে সব। পানি জমে আছে চোখের কোণে। মাথাটা কাত করে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রানা চোখের পানি। খচ্ করে আলপিন ফুটাল যেন কেউ ওর ঘাড়ে। এমন ভয়ঙ্কর ভাবে কে মারল ওকে? ওর জ্ঞানহীন দেহটার ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছে কে যেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই পানিতে ভরে গেছে চোখ।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল রানার চোখের দৃষ্টি। আবছা অন্ধকার একটা ঘর—ছাতের কাছে দুটো ভেন্টিলেটার দিয়ে আলো আসছে সামান্য। এখন দিন। মেঝেটা ঠাণ্ডা আর শক্ত। পাকা বাড়ি। চিত হয়ে পড়ে আছে সে মেঝে। হাত দুটো শরীরের নিচে চাপা পড়ে আছে বেকায়দা মত। ডান হাতটা প্রথমে বের করবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না।

'বাঁদা আচে, স্যার।'

মাথার কাছ থেকে ভেসে এল গিলটি মিঞার গলার স্বর। চমকে উঠল রানা। মাথাটা ঘুরাবার চেষ্টা করল সে। একঝাঁক বিষ মাখানো তীর এসে বিঁধল যেন ওর সারা শরীরে। ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা। চোখ বুজে সহ্য করে নিল রানা ব্যথাটা। পা দুটো টেনে দেখল, ওগুলোও বাঁধা।

'কোথায় তুমি, গিলটি মিঞা?'—জিজ্ঞেস করল রানা কোলা ব্যাঙের মত কর্কশ শব্দ বেরোল গলা দিয়ে

'আপনার মাতার কাচেই চেয়ারে বসে আচি, স্যার

বহুকষ্টে ধীরে ধীরে পিছন ফিরল রানা ঠিকই। মাথার কাছে একটা চেয়ারে দিব্যি আরামে হেলান দিয়ে বসে আছে গিলটি মিঞা পায়ের ওপর পা তুলে মাঝে মাঝে দোলাচ্ছে পা দুটো। মাথাটা ঘুরছে রানার, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে রেখে আবার চাইল সে এবার বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে গিলটি মিঞা চেয়ারটার সঙ্গে। পা দুটো মাটি স্পর্শ করছে না, ঝুলে আছে শূন্যে।

অর্থাৎ, কয়েক ঘণ্টা এভাবে থাকলেই পা দুটো অকেজো হয়ে যাবে চিরকালের মত। ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না।

'ব্যস্ত হবেন না, স্যার। আমি ঠিকই আচি। শুদু পা-টা একটু ঝিঁজি ধরে গেচে, নইলে দিব্যি আরামেই আচি, স্যার। আমাকে অত মারে নিকো। হাজার হোক অনেক দিনের চেনা লোক। কিন্তু মেরেচে, স্যার আপনাকে। উফ্…'

'কোথায় আছি আমরা এখন, গিলটি মিঞা?'

'তা জানি না, স্যার। চোখ বেঁদে নিয়েছিল। তবে আধঘণ্টা পোনে-একঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এখানে পৌঁছেচে শালারা। উফ্, এই ঘরের মদ্যে আপনাকে আঁছড়ে ফেলে যা মার মারল না! উফ্! আমাকে শুদু কটা থাবড়া দিতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে দিলুম। তাই দেকে আর মারতে নিষেদ করল চৌদরি সায়েব। বলল…'

'চৌধুরী সাহেব!'—অবাক হলো রানা। 'চৌধুরী সাহেবটা আবার কে?'

'কেন? আমাদের চৌদরী সাহেব। চিটাগাং-এর কবীর চৌদরী। চৌদরী জুয়েলারের মালিক ছিল—হঠাৎ কি ব্যাপারে ফেঁসে গিয়ে ভেগেছিল ওকান থেকে। এক্কেবারে চম্পট। এ্যাদ্দিন পর দেকা মিলল…'

'কোথায়!'—সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেছে রানার। একি সম্ভব! রাঙামাটি পাহাড়ের সেই পাগল বৈজ্ঞানিক কবীর চৌধুরী, যাকে তলিয়ে যেতে দেখেছিল সে দাক্ষিণাত্যের কোলায়ের লেকে ওঙ্কার দ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে,—সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এখন এখানে? এসব কি তারই কারসাজি? 'কোথায় দেখা পেলে ওর, গিলটি মিঞা?'

রানার এই হঠাৎ উত্তেজনায় অবাক হয়ে চাইল গিলটি মিঞা ওর মুখের দিকে। তারপর বলল, 'কেন স্যার, চৌদরী সায়েবের বাড়িতেই তো কাল কুত্তাগুলো তেড়ে নিয়ে গাচে তুলেছিল আমাকে। আপনি আর অনীতা বৌদি…'

'ডক্টর আবু সুফিয়ান? ডক্টর আবু সুফিয়ানের বাড়িতে…'

'ও-ই তো কবীর চৌদরী। নাম ভাঁড়িয়ে আচে এখানে। কাল বললুম না…'

'তুমি কি করে জানলে ডক্টর সুফিয়ানই কবীর চৌধুরী?'—আবছা ভাবে মনে পড়ল রানার কাল সারাদিনে অন্তত দু'বার ডক্টর সুফিয়ানের প্রসঙ্গে 'চৌদরী' কথাটা ব্যবহার করেছে গিলটি মিঞা। ইশ্‌শ্…খেয়াল করেনি সে, ভেবেছিল ওর নামের পিছনে ভুল করে একটা চৌধুরী টাইটেল লাগিয়ে নিয়েছিল গিলটি মিঞা।

'বাঁ হাতের নীল আংটীটা দেকে। আর সেই সিগরেট কেসটা পকেট থেকে বের করল ওমনি পষ্ট বুজে নিলুম। ওটা তো আমিই বিক্কিরী করেছিলুম ওর কাচে। এক বিলেতী সায়েবের কোটের পকেট থেকে সরিয়েছিলুম ওটা। একশো টাকা চেয়েছিলুম—শালা খুশি হয়ে দিয়ে দিলে পাঁশ্‌শো টাকা। ওর ভেতর বন্দুক আচে তো একটা। বোতাম টিপলেই ভিড়িম। হাতটা খোলা থাকলে দেকাতুম, পকেটেই আচে আমার, আপনাকে দেব বলে নিয়েচি। কাল রাত্তিরে ওটা পকেটে ফেলে যেই পড়ার ঘরে ঢুকেচি, ওমনি ক্যাঁক করে ঘাড় ধরে…'

'ভুল হয়নি তো তোমার, গিলটি মিঞা? এই লোকটাই কবীর চৌধুরী?'—বিশ্বাস করতে পারছে না রানা।

'মানুষ চিনতে ভুল আমার হয় না, স্যার। তবে ঠিকই বলেচেন, চেনা যায় না

শালার চেহারা দেকে। ভোল একেবারে পাল্টে ফেলেচে। কিন্তু বাবা, কাঠের পা লুকোবে কোতায়? আমার নাম গিলটি মিঞা। বত্রিশ বচোর ধরে থ্রী সেবেনটি নাইন লিয়েই আচি। আমার চোক...'

'সকাল বেলা ওই পাকা ঘরটার ওপাশে কি করছিলে তুমি?'

'আমি করছিলাম না, স্যার, ওরা করাচ্ছিল। আমাকে কোলে লিয়ে ডেঁড়িয়ে ছিল একজন। হাত বেঁদে লিয়েছিল আগেই। এত চোক টিপলাম, তা, স্যার আপনার চোকেই পড়ল না। আপনার গাড়ি কাচে আসতেই আমাকে লিয়ে লুকিয়ে পড়ল শালারা ঘরটার পিচনে। তকনই বুজেছিলুম কপালে খারাবি আচে আপনার। মুকে হাত চাপা, কিচু বলতেও পারছি না, ওদিকে মড়মড় করে চলে আসচেন আপনি...পায়ে বড় যন্তোনা হচ্ছে, স্যার।'—বার কয়েক পা দোলাল গিলটি মিঞা।

সবটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। কোলায়ের লেকে মরেনি কবীর চৌধুরী। আবার রঙ্গমঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছে সে নতুন খেলা দেখাতে। এবার ভয়ঙ্করতম খেলায় মেতেছে সে। খেপা লোকের ভান করে ব্ল্যাকমেইল করবার চেষ্টা করছে আসলে কবীর চৌধুরী। পৃথিবীর ধূর্ততম, নিষ্ঠুরতম, ভয়ঙ্করতম ক্রিমিনাল কবীর চৌধুরী। নিশ্চয়ই খুন করেছিল সে সত্যিকার আবু সুফিয়ানকে। এতদিন ধরে ডক্টর আবু সুফিয়ানের ছদ্মবেশে রয়েছে সে রিসার্চ সেন্টারে, প্ল্যান তৈরি করেছে রয়ে সয়ে, অথচ কেউ টের পায়নি—রানাও না। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার। কিন্তু সে উপায়ও নেই, হাত বাঁধা।

কিন্তু এখান থেকে বেরোবার উপায় কি? চারদিকে একবার চোখ বুলাল রানা। রানার মনের ভাব বুঝতে পেরে হাসল একটু গিলটি মিঞা।

'উপায় নেই, স্যার। আমি অনেক চিন্তে করে দেকেচি। খামোকা মাতাটাকে যন্তোনা দেওয়া। একান থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই। বড় শক্ত হাতে বেঁদেচে শালা দৈত্যটা। পেল্লকাণ্ড দৈত্য, স্যার, ওই চৌদরী সায়েবের চ্যালা। একটিবার দেকলেই বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। উফ্, কি মারটাই মারলে আপনাকে...'

এসব কথা রানার কানে ঢুকছে না আর। যে করে হোক বেরোতে হবে এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

পা দুটো বাঁধা। কেবল বাঁধা নয়, রশির একপ্রান্ত একটা জানালার সবচেয়ে উঁচু শিকের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পা দুটোকে। উঠে দাঁড়াবার কোন উপায় নেই। যতটা সম্ভব দেয়ালের কাছে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা। একসাথে আপত্তি করে উঠল রানার সর্বাঙ্গ। ঘরটা দুলে উঠল চোখের সামনে। হাজার কয়েক হলুদ নীল, বেগুনি তারা ভেসে বেড়াল ওর মাথার মধ্যে। দাঁতে দাঁত চেপে আরও একটু সরে গেল রানা পাঁজরে এত ব্যথা কেন? ভেঙে গেছে নাকি এক আধটা?

ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সব। গিলটি মিঞার মুখটা দেখা যাচ্ছে এখন। দেয়ালে হেলান দিয়ে উঠে বসল রানা। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গিলটি মিঞার দিকে। চিন্তা করবার চেষ্টা করছে রানা। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে,

নইলে কোনদিন আর বের হতে পারবে না ওরা এই ঘর থেকে। যতদূর সম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করছে গিলটি মিঞাও, কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা কাঁপছে ওর ঠোঁট, গালের একপাশে থির থির করে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। উত্তরোত্তর বাড়ছে ব্যথা, চেপে আছে সে কোনমতে। আর বড়জোর আধঘন্টা, তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

হঠাৎ দেখতে পেল রানা ছুরিটা। বার কয়েক চোখ মিটমিট করল সে। আছে, এখনও আছে। ডান পায়ের পা'জামা খানিকটা উঠে আছে গিলটি মিঞার, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছুরির বাঁটটা। সেই থ্রোয়িং নাইফ, গতরাতে যেটা রানা দিয়েছিল গিলটি মিঞাকে। বাঁধা আছে ওটা ওর পায়ে। ভাল মত ঠাহর করে দেখল রানা, তবু অদৃশ্য হয়ে গেল না ওটা। নাহ্, ঠিক, চোখের ভুল নয়, যথাস্থানেই আছে ওটা, ছুরিই।

'চেয়ারটা উল্টে ফেলো, গিলটি মিঞা।'

'কেন, স্যার?'—একটু অবাক হলো গিলটি মিঞা।

'বাম দিকে উল্টে পড়ো চেয়ার সহ।'

'আপনার গায়ে পড়ব তো তাহালে, স্যার।'

'যা বলছি তাই করো। এখন সময় নষ্ট...'

দড়াম করে রানার গায়ে পড়ল গিলটি মিঞা চেয়ার সমেত। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। কাঁধের ওপর পড়েছে চেয়ারের একটা কোণা। একটু দূরে পড়ল চেয়ারটা কাত হয়ে।

'ও কি করচেন, স্যার!'—রানাকে ওর পায়ে হাত দিতে দেখে পা-টা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল গিলটি মিঞা। কিন্তু ধরে ফেলেছে রানা। আস্তে আস্তে টেনে কাছে নিয়ে আসছে সেটা। এগিয়ে আসছে চেয়ারটা এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে গিলটি মিঞা সমেত। ছুরির বাঁটে রানার হাত পড়তেই খেয়াল হলো গিলটি মিঞার। 'ভুলেই গিয়েচিলুম, স্যার ওটার কতা। কিন্তু, স্যার...'—যে কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সেটার উত্তর জিজ্ঞেস করবার আগেই পেয়ে গেল সে। ঝট্ করে চাইল সে একবার রানার মুখের দিকে। চেয়ারটা সোজাসুজি উল্টালে রানার পক্ষে ছুরিটা হাতের কাছে পাওয়া অনেক সহজ হত, কিন্তু মাথায় আর হাতে ভয়ানক ব্যথা পেত গিলটি মিঞা। আমি একটা সাদারণ চোর, আমার কষ্ট হবে তাই নিজের গায়ে এতবড় ব্যথাটা নিল মানুষটা! অতছ বুজতেই দিতে চাইল না কেন বাম দিকে উল্টে পড়তে বলচে! এতবড় কলজে না হলে কি আমার মত পাজি লোক এর কেনা গোলাম হয়ে যায়!

ইলাস্টোপ্লাস্ট দিয়ে আটকানো ছিল ছুরিটা। উঠে এল চড়চড় করে। হাত দুটো পিছনে বাঁধা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাওয়া যাচ্ছে না—আড়ষ্ট হয়ে গেছে ঘাড়টা প্রচণ্ড কোন আঘাত খেয়ে; তাই এক মিনিটের কাজ করতে পুরো পাঁচ মিনিট সময় লাগল রানার। বাম হাতটা বন্ধনমুক্ত হলো গিলটি মিঞার।

'ব্যস, ব্যস, ব্যস, ব্যস। আর লাগবে না, স্যার। হয়েচে। দিন এবার ছুরিটা আমার হাতে।'

এক মিনিটের মধ্যে হাত-পায়ের বাঁধন কেটে সাফ করে দিল গিলটি মিঞা। বার কয়েক হাত-পা ঝাড়া দিয়ে বৈঠক দিল, তারপর শুয়ে পড়ল মেঝের উপর কান চিমটে ধরে।

মৃদু হাসল রানা। ঝিঝি ধরে গেছে ওর হাতেও। চিন চিন করে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে আবার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল বন্ধ জানালার একটা শিক। অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছে শরীরটা, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে, শরীরটাকে খাড়া করে রাখতে পারছে না।

কটা বাজে বোঝার উপায় নেই। রিস্টওয়াচটা ভাঙা, ঘন্টার কাঁটা খসে গেছে।

জানালাটা খুলল রানা। অন্ধকার একটা ঘর ওপাশে। শিকগুলো প্রায় এক ইঞ্চি মোটা, ভাঙবার উপায় নেই। কোন পোড়ো বাড়িতে এনে আটকে রেখেছে নাকি ওদের? দেয়াল ধরে ধরে দরজার দিকে এগোল রানা। বাইরে থেকে শিকল তুলে দেওয়া হয়েছে দরজায়। তালাও হয়তো মারা হয়েছে, কিন্তু বুঝবার কোন উপায় নেই।

'বাইরে থেকে কি তালা মারা?'—জিজ্ঞেস করল রানা গিলটি মিঞাকে।

'মনে হয় না, স্যার। ছিকল তোলার শব্দ পেইচি, কিন্তু তালা মারার শব্দ তো শুনিনি।'—উঠে বসল সে।

'সিগারেট কেসটা দাও দেখি?'

পাজামার ভেতরের একটা গোপন পকেট থেকে ডক্টর আবু সুফিয়ানের সোনালী সিগারেট কেসটা বের করে দিল গিলটি মিঞা। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করেই বুঝতে পারল রানা ফরটি ফাইভ ক্যালিবারের একটা বুলেট পোরা আছে কেসের মধ্যে। ট্রিগারটা ভিতরে। সিগারেট বের করবার ছলে যে কোনও লোককে সাবাড় করে দেয়া যায় এ জিনিস দিয়ে।

'ওরা কি চলে গেছে, না আছে?'—জিজ্ঞেস করল রানা আবার।

'তা ঠিক বলতে পারব না, স্যার। জুতোর শব্দ চলে গেল ডানদিকে, কিন্তু গাড়ি ইস্টার্টের শব্দ শুনতে পাইনি।'

দরজায় হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল রানা। ঝুঁকি আছে ঠিকই, কিন্তু এ ঝুঁকি না নিয়ে কোনও উপায় নেই। দরজাটা ঠেলা দিয়ে ধরে শিকল আন্দাজ করে ট্রিগার টিপল সে। বন্ধ ঘরে বিস্ফোরণের শব্দটা প্রচণ্ড শোনাল। ঝনাৎ করে খুলে গেল শিকল। টান দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

বেশ বড়সড় একটা হলঘর। কান পাতল রানা। কোন পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ যদি আসে, নিঃশব্দ পায়ে আসছে সে। ছুরিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। টলতে টলতে এগোল সে ডানদিকে। পিছনে গিলটি মিঞা। শিকলটা তুলে দিয়েছে আবার সে ঘরের।

জনশূন্য বাড়িটা। বেশ বড়সড়। পুরানো কালের জমিদার বাড়ির মত। কিন্তু একটি জনমানবের চিহ্নও নেই। হলঘর পেরিয়েই একটা সিঁড়ি ঘর। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ি ঘরের পর একটা গোল ধরনের ঘর। প্রত্যেকটা ঘরের দরজা ভেজানো—ঘরগুলো খালি, এক আধটা ধুলো পড়া চেয়ার বা টেবিল ছাড়া। গোল

ঘরটার পরেই একটা বারান্দা, বারান্দা পেরোলেই খোয়া বিছানো রাস্তা—মিশেছে গিয়ে বড় রাস্তায়।

ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। বেরিয়ে এল ওরা দরজাটা যেমন ছিল তেমনি ভিড়িয়ে রেখে। নেমে পড়ল রাস্তায়। কিছুদূর গিয়েই থামল রানা।

'দেখে এসো তো, গিলটি মিঞা এই বাড়ির পিছন দিকটায় আমার গাড়িটা আছে কিনা?'

চলে গেল গিলটি মিঞা। রাস্তার ওপরই বসে পড়ল রানা। দুর্বল শরীরে বৃষ্টিতে চুপচুপে হয়ে ভিজে গিয়ে কাঁপছে সে থর থর করে। গাড়ির শব্দ যখন শুনতে পায়নি গিলটি মিঞা, তখন গাড়িটা এখানে থাকার সম্ভাবনা আছে। তাহলে দ্রুত ফিরতে পারবে ওরা। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে প্রথমেই, তারপর···তারপর···

বমি করল রানা রাস্তার ধারে। ভয়ঙ্কর ভাবে মেরেছে ওরা ওকে।

দূর থেকে হাত তুলে ডাকছিল গিলটি মিঞা রানাকে, রানার অবস্থা দেখে ছুটে চলে এল কাছে। মাঠের মধ্যে খানিকটা জমা পানিতে মুখ ধুয়ে নিল রানা, হাঁটতে সাহায্য করল গিলটি মিঞা রানার কোমর জড়িয়ে ধরে।

'গাড়িটা আচে, স্যার ডেঁড়িয়ে। বাড়িটার পিচনেই।'—রানাকে বড় রাস্তার দিকে রওনা হতে দেখে বলল সে।

'থাকুক। আমরা বড় রাস্তা থেকে অন্য কিছুর সাহায্যে ফিরব।'

ভেবে নিয়েছে রানা বর্তমান অবস্থাটা। রানাকে যে বন্দী করা হয়েছে একথা চেপে রাখতে চেয়েছে কবীর চৌধুরী। সেইজন্যেই একজন রানার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে, অপর আরেকজন এসেছে অন্য গাড়িতে। কেবল রানারা নয়, গাড়িটাকেও লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই নির্জন জায়গায় এনে। কেউ জানে না রানা বন্দী হয়েছে। এর ফলে কবীর চৌধুরী যদি মনে করে থাকে কাজে তার সুবিধা হবে, তাহলে তাকে তাই মনে করতে দেয়াই উচিত এখন। এই গাড়িতে টঙ্গি ফিরলেই সতর্ক হয়ে সরে পড়বে কবীর চৌধুরী। হয়তো এতক্ষণে সরে পড়েছে সে, কিন্তু তবু ওকে জানতে দেয়া চলবে না যে বন্দী দশা থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা এবং গিলটি মিঞা। কাজেই গাড়িটা থাকুক যেখানে আছে সেখানেই। কিন্তু···হাঁটতে পারবে তো সে? পৌঁছতে পারবে তো বড় রাস্তা পর্যন্ত?

'আমি ধরচি, স্যার।'—বলল গিলটি মিঞা। 'জোর বেশি নেই, স্যার। তবু একটু সুবিদে হবে।'

পুরো এক মাইল হাঁটার পর বড় রাস্তায় উঠে এল ওরা। আর হাঁটতে পারছে না রানা। পাপেট পুতুলের মত বেয়াড়া রকমের নড়ছে ওর হাত পা, নিজের কন্ট্রোলে থাকতে চাইছে না। কাদা মাটির ওপরই বসে পড়ল রানা একটা গাছে হেলান দিয়ে। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে সর্বশরীর, পাঁজরের ব্যথাটাও আর অনুভব করতে পারছে না সে। ঠাণ্ডায় জমে গেছে সর্বাঙ্গ।

দুটো বাস চলে গেল। ওগুলো থামাতে নিষেধ করল রানা গিলটি মিঞাকে। প্রাইভেট গাড়ি কিংবা ট্রাক দরকার। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে থামবে কি কেউ? এদিকে গোপনীয়তা দরকার।

কয়েকটা প্রাইভেট কার এবং জীপ চলে গেল নাকের ডগা দিয়ে ফগ্ লাইট জ্বেলে। হাত তুলল গিলটি মিঞা, কিন্তু থামল না ওরা। হয়তো মনে করল গ্রাম্য লোক, ভুল করে বাস মনে করে হাত তুলে থামতে বলছে।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা। আর পারা যাচ্ছে না। চোখ খুলে রাখতে পারছে না রানা আর। মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে সামনের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা। চোখ ধাঁধানো আলো। কথা বলছে কারা যেন।

কালো একটা গাড়ি এসে থেমেছে। নিজের নামটা শুনতে পেল রানা কারও মুখে। ধরাধরি করে তুলে নিচ্ছে কারা যেন ওর দেহটা গাড়ির পিছনের সীটে। ছেড়ে দিল গাড়িটা। গিলটি মিঞার কোলে রানার মাথা।

দুই

ক্লিক করে একটা শব্দ কানে আসতেই পূর্ণ সচেতন হয়ে চোখ মেলল রানা। ড্রাইভারের পাশে বসা খাকী ইউনিফর্ম পরা লোকটার হাতে মাইক্রোফোন। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে, বাধা দিল রানা।

'ওটা ব্যবহার করবেন না, সার্জেন্ট একটু দাঁড়ান।'

পাশ ফিরে রানার দিকে চাইল সার্জেন্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে।

'আপনার খবরটাই দিচ্ছিলাম, স্যার হেড অফিসে। দুই ঘণ্টা ধরে গরুখোঁজা করা হচ্ছে আপনাকে। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন।'

'আরও কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকলে খুব কষ্ট হবে না ওদের। চেপে রাখতে চাই আমি আমার উপস্থিতি। কোন মহলেই জানানো চলবে না যে ফিরে এসেছি আমি—ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। গোপন কোন একটা জায়গায় নিয়ে চলুন আমাকে, যেখানে কেউ চিনতে পারবে না। তারপর যে কয়টা নামের লিস্ট দেব সেই ক'টা লোককে নিয়ে আসতে হবে সেখানে। বুঝতে পেরেছেন? এরকম কোন গোপন জায়গা জানা আছে আপনার?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার ব্যাপারটা···ওদিকে সবাই হন্যে হয়ে খুঁজছে আপনাকে, অথচ আপনি বলছেন···'

'সব কথা বোঝাবার সময় নেই এখন, সার্জেন্ট। আমাকে বন্দী করা হয়েছিল, অনেক কষ্টে ছুটে পালিয়ে এসেছি। এখন সেই লোককে ধরতে হলে গোপনীয়তার দরকার—নইলে হুঁশিয়ার হয়ে সরে পড়বে সে। মস্ত বড় কালপ্রিট একজন।'—কোটটা সরাল রানা একটু বোতাম খুলে। সাদা শার্টটা লাল হয়ে গেছে রক্ত আর পানিতে ভিজে। নিশ্চয়ই বেশ কয়েকটা জায়গা কেটে গেছে শরীরের। 'যদি কোন গোপন জায়গা না থাকে···'

'আছে, স্যার। আমার নিজের কোয়ার্টারটাই এখন খালি। ওয়াইফ গেছেন

বাপের বাড়ি ছেলেপুলে নিয়ে। কিন্তু আপনি তো ভয়ানক অসুস্থ মনে হচ্ছে, ডাক্তার ডাকতে হবে?'

'যদি কোন বিশ্বস্ত ডাক্তার জানা থাকে, যার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, তাহলে ডাকতে পারেন। নইলে দরকার নেই।'

'হেড অফিসে কন্ট্যাক্ট করে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিতে বলি আমার কোয়ার্টারে?'

'তা বলতে পারেন। সেই সাথে বলে দেবেন ()-4 ব্রাঞ্চের চীফ কর্নেল শেখও যেন চলে আসেন আপনার কোয়ার্টারে।'

'ফুলস্পীড লাগাও, কিসমত, জলদি।'—ড্রাইভারের উদ্দেশে কথাটা বলেই মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ল সার্জেন্ট।

'হাসপাতাল? খেপেছেন নাকি, ডাক্তার? অসম্ভব। এই অবস্থাতেই কাজ করতে হবে আমাকে।'—চারটে ডিম ভাজা দিয়ে গোটা দুই পরোটা আর সেই সঙ্গে পোয়ার্টেক ব্র্যান্ডি পেটে পড়তেই অনেকটা তাজা বোধ করছে রানা। বলল, 'হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এখন অসম্ভব।'

প্রবীণ ডাক্তার টাক চুলকালেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'আজ হোক কাল হোক, ভর্তি আপনাকে হতেই হবে। আজ হলেই ভাল। আপনি অত্যন্ত অসুস্থ। কতখানি অসুস্থ তা আমি নিজেও জানি না। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রেডিয়োলজিকাল একজামিনেশন করানো দরকার আপনার এক্ষুণি। ডানদিকের দুটো রিব খুব সম্ভব ক্র্যাক করেছে আপনার—আর একটা যে ফ্র্যাকচার হয়েছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এক্স-রে ছাড়া বোঝা যাচ্ছে না আর কি ক্ষতি হয়েছে।'

'কোনও ভাবনা নেই, ডাক্তার।'—সান্ত্বনা দিল রানা ডাক্তারকে। 'যা কষে বেঁধেছেন ওতেই সেরে যাবে। আর ওপরের জখমগুলোয় তো মনের সুখে ছ্যাঁকা পোড়া দিয়েছেন। কাজেই ভয়টা কিসের? কোন রকম ইনফেকশন ঘেঁষতে পারবে না কাছে।'

হাসলেন প্রবীণ ডাক্তার। 'বিশ্রাম নিলে অবশ্য আজকে মারা যাবেন না আপনি, কিন্তু এই অবস্থায় যদি চলাফেরা বা লাফ ঝাঁপ করেন তাহলে কি হয় বলা মুশকিল। হয়তো ভাঙা রিব দিয়ে নিজেই নিজেকে স্ট্যাব করে ফেলতে পারেন সেক্ষেত্রে। কিন্তু আসল ভয় যেটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া। ভাঙা পাঁজর, তার ওপর অপরিসীম ক্লান্তি আর বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগা—এ হচ্ছে নিউমোনিয়ার পক্ষে চমৎকার পরিবেশ। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, মিস্টার মাসুদ রানা, এই অবস্থায় যদি নিউমোনিয়া বাধান তাহলে আর হাসপাতালে গিয়েও কিছু লাভ হবে না।'

'আপনার কথায় বড় আশ্বস্ত বোধ করছি, ডাক্তার সাহেব। ধন্যবাদ। আর কোথাও ব্যথা-ট্যথা দেবেন, না কাজ শেষ হয়েছে আপনার?'

'আর একটা ইঞ্জেকশন দিয়েই আপাতত ছেড়ে দেব আপনাকে। কিন্তু...'—বিছানার একপাশে বসা অনীতার দিকে ফিরলেন ডাক্তার। 'মিসেস

মাসুদ, ইনি যখন কোন কথা শুনবেন না, তখন আপনাকেই বলে যাচ্ছি। শ্বাসপ্রশ্বাস, পালস আর টেম্পারেচার চেক করতে হবে এঁর প্রতি এক ঘণ্টা পর পর। অবস্থার যে কোন রকম পরিবর্তন দেখলেই ফোন করবেন আমাকে তৎক্ষণাৎ, আমার নাম্বার দিয়ে যাচ্ছি। আর আমি সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, আপনারাও শুনে রাখুন,'—চেয়ারে বসা কর্নেল শেখ, ইন্সপেক্টর রায়হান আর দারোগা ইয়াকুব আলীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার, 'যদি এই রুগী আগামী বাহাত্তুর ঘণ্টার মধ্যে বিছানা ছেড়ে ওঠে, তাহলে এর ভাল মন্দের ব্যাপারে কোন রকম দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব না।'

ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। দরজাটা বন্ধ হতেই তড়াক করে উঠে বসল রানা। বিছানা থেকে নেমে পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে চড়াল। ব্যথা আছে, কিন্তু যতটা লাগবে মনে করেছিল, ততটা ব্যথা লাগল না। হতবাক হয়ে রানার কাণ্ড দেখছিল ঘরের সবাই, কেউ কিছু বলছে না দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল দারোগা ইয়াকুব আলী।

'কী পাগলামি করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? ডাক্তার কি বলে গেল শুনলেন না? আত্মহত্যা করতে চান? আপনারা কেউ ওঁকে বাধা দিচ্ছেন না কেন, স্যার?'

'ওকে বাধা দিয়ে লাভ নেই।'—বলল কর্নেল শেখ। 'দুনিয়ায় কিছু লোক থাকে এরকম। কারও কথা শোনে না। নিজে যা ভাল বোঝে তাই করে। তা এখন কোনটা ভাল বুঝছ, রানা? কি করতে চাও? একা একা কাজ করতে গিয়ে দেখলে তো কি অবস্থা হলো? দুরমুজ করে ভেঙে চুরে হাড়মাংস এক করে দিল শত্রুপক্ষ। এর চাইতে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রুটিন আর সিসটেম মত কাজে নামলেই কি ভাল হত না? কি লাভ হলো এই মারধর খেয়ে? জানতে পারা গেল কে সেই হত্যাকারী?'

এ কথার কোন সরাসরি উত্তর দিল না রানা। শুধু বলল, 'ধৈর্যের সঙ্গে রুটিন আর সিসটেম মেনে কাজ করবার সময় পার হয়ে গিয়েছে, কর্নেল শেখ। এখন ধৈর্য ধরবার সময় নেই, দরকার তড়িৎগতি। যাক, সেই বাড়িটার ওপর দূর থেকে নজর রাখবার জন্যে সশস্ত্র গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে? গিলটি মিঞা কোথায়?'

'বাড়িটা চিনিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে গেছে ওদের। দশজন গার্ড দিয়ে বাড়িটাকে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে চারপাশ থেকে। তোমার কথা মত এখনও পুরোদমে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে তোমাকে। তোমার রিপোর্টের জন্যে বসে আছি আমি। এবার বলো কোন হদিশ পেলে কিছুর?'

'তার আগে বলো এদিকের কি খবর। অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন তোমার চোখ মুখ? দুঃসংবাদ আছে কিছু?'

'আছে। খবর বেরিয়ে গেছে খবরের কাগজে। রিসার্চ সেন্টারে প্রবেশ, খুন এবং ভাইরাস চুরির খবর দিয়ে হেড লাইন হয়েছে প্রত্যেকটি পত্রিকার। সকালে উঠেই চমকে উঠেছে সবাই কালকূট চুরির খবর পড়ে। এই খবর যে কি করে লিক-আউট হলো বোঝা যাচ্ছে না। প্যানিক সৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই মানুষের মধ্যে।'—টেবিলের ওপর ছড়ানো একরাশ কাগজের দিকে চাইল কর্নেল শেখ

একবার। 'খবর পড়লে তুমিও আঁতকে উঠবে। দেখবে?'

'না। আর কি খবর?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান তোমার খোঁজ করছিলেন ঘণ্টা খানেক আগে। আরেকটা হুমকি এসে পৌঁছেচে সবগুলো পত্রিকা অফিসে ঠিক সকাল সোয়া নয়টার সময়। এবার আর টেলিফোন নয়, টাইপ করা চিঠি পৌঁছে দেয়া হয়েছে মেসেঞ্জার মারফত। তাতে লেখা হয়েছে, তার আদেশ অমান্য করা হয়েছে—সকালের রেডিয়ো নিউজে তার প্রথম চিঠির সম্মতিসূচক উত্তর দেয়া হয়নি। রিসার্চ সেন্টারের দেয়াল যেমন ছিল তেমনি খাড়া আছে এখনও। কাজেই আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা ডেমোনস্ট্রেশনের মাধ্যমে দুটো জিনিস প্রমাণ করে দেবে সে: এক. ওর কাছে ভাইরাস আছে, দুই. ভাইরাস ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই ওর।'

'খবরের কাগজে ছাপা হবে এ খবর?'

'হবে। আজ সমস্ত সান্ধ্য পত্রিকায় তো ছাপা হবেই, সব পেপারই জরুরী বার্তা বের করছে এই খবর ছাপার জন্যে।'

'ঠেকাবার রাস্তা নেই?'

'না। সবগুলো পত্রিকার সম্পাদক আজ সকালে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হয়ে কয়েকটা জরুরী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে: যেহেতু জনসাধারণের উপকারের জন্যেই সরকার, সরকারের উপকারের জন্যে জনসাধারণ নয়, সেইহেতু জাতির এই চরম সঙ্কটের সঠিক খবর জানবার অধিকার আছে জনসাধারণের। দেশ যখন ধ্বংসের মুখে পতিত হতে চলেছে তখন ঢাকঢাক গুড়গুড় করে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। তারা আরও বলেছে, পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার যদি কোন রকম গড়িমসি কিংবা ভুল-ভ্রান্তি করে সে খবরটাও জানানো হবে জনসাধারণকে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে পত্রিকার এই-ই দায়িত্ব। দুপুর বারোটা নাগাদ এক্সট্রা স্পেশাল ইস্যু বের করা হচ্ছে দুটো বাংলা এবং একটা ইংরেজি দৈনিকের।'

'বন্ধ করা যায় না?'

'যায়। কিন্তু বন্ধ করতে চান না মেজর জেনারেল। খবর যা বেরিয়ে গেছে তারপর এখন এ ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ হলে জনসাধারণের ভীতিটাকেই আরও উস্কে দেয়া হবে। প্রতিপক্ষের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নেই। আমরা প্রতিপক্ষকে আটকাতে চাই—খবরকে নয়।'

'আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি এরকম তেলেসমাত্ অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলল লোকটা! খুন, চুরি, মামলা-মোকদ্দমা, খেলাধুলা আর ভিয়েৎনাম নিয়ে বেশ ছিল—হঠাৎ খেপে উঠল কেন পত্রিকা-ওয়ালারা? একেবারে ইমার্জেন্সী…'

'খেপত না। আজগুবি ব্যাপার আর সত্যের মধ্যেকার তফাৎ ওদের ভাল করেই জানা আছে। সাপকে ওরা সাপ বলেই চেনে, দড়ি বলে ভুল করে না। কালকূটের বোতল ভাঙলে পরে কি অবস্থা হবে জেনেছে ওরা, কালকূট চুরি গেছে একথাও জেনেছে, তার ওপর জেনেছে বদ্ধ পাগলের হুমকির বিষয়বস্তু। কাজেই

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে ওরা ঠিকই। ভুল হয়নি।'

'সেরেছে এবার। সারা দুনিয়া থেকে চাপ আসবে এবার আমাদের ওপর। যাক, ডক্টর সাদেককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?'

'হয়েছে। কিন্তু তুমি ভোর রাতে উঠে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কি তথ্য আবিষ্কার করলে?'

'কিচ্ছু না।'

'তাহলে শুধু শুধুই দৌড়াদৌড়ি করেছ?'

'হ্যাঁ। আমি চেষ্টা করছিলাম ঘুম থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কারও কাছ থেকে কোন বেফাঁস কথা বের করা যায় কি না। তারপর কি হয়েছিল তা বলেছি তোমাকে।'

'এটা কার কাজ বলে সন্দেহ হয় তোমার?'

'কিছুই বলা যাচ্ছে না এখনও, শেখ। তবে আমরা যে কয়জনকে সন্দেহের আওতায় রেখেছি, তাদেরই একজন কাজটা করেছে। এতে প্রমাণ হয়, ঠিক পথেই এগোচ্ছিলাম আমি, আমাকে ঠেকানো একান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল ওদের।'

'যাক এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য কি?'

'প্রথম কর্তব্য ছিল ডক্টর সাদেককে বন্দী করা। সেটা হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় কর্তব্যটা চিন্তা করে বের করতে হবে।'—একটু চিন্তা করে বলল, 'ডক্টর হাশমতকেও গ্রেপ্তার করতে পারো ইচ্ছে করলে। সে-ই একমাত্র লোক যে রিসার্চ সেন্টারের মধ্যেই কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে নিয়েছে, এবং সিকিউরিটি সেট-আপ সম্পর্কে জেনে নেয়া যার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তাছাড়া ডক্টর হারুনের ফাইল ঘেঁটে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা জেনে নেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হয়তো সে-ই ডক্টর হারুনকে ব্ল্যাক-মেইল করে সাহায্য করতে বাধ্য...'

'তুমি না বলেছিলে ডক্টর হারুন নির্দোষ?'

'তা বোধহয় বলিনি। বলেছিলাম খুন এবং ভাইরাস চুরি তার কাজ নয়।'

'তার মানে তুমি ডক্টর হাশমতকেও সন্দেহ করছ?'

'শুধু তাকে কেন, তোমাকেও সন্দেহ করছি। সবাইকে সন্দেহ করছি।'

'ঠাট্টা রাখো, রানা...'

'ঠাট্টা নয়, সত্যিই যে কাকে সন্দেহ-মুক্ত রাখব বুঝতে পারছি না আমি। যাক, কদ্দূর কি করলে তুমি? তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা কিছু তথ্য দিতে পারল?'

'উহুঁ। সাভারের সেই ফার্মেও লোক গিয়েছিল আমাদের। সেখান থেকেও কিছু জানা যায়নি। প্রত্যেকটা সন্দেহজনক লোকেরই জবানবন্দী নেয়া হয়েছে, গোপনে তাদের বাড়ি খানাতল্লাশী করা হয়েছে—কোন ফল হয়নি। টঙ্গির সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-গর্ত তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কোথাও কিছু নেই। হাতুড়ি আর প্লায়ার্সের ব্যাপারে নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ওগুলোই ব্যবহার করা হয়েছিল সেদিন। অবশ্য এটা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। মরিস মাইনর গাড়িটার কোথাও একটা হাতের ছাপও পাওয়া যায়নি, ভালমত মুছে দিয়ে গেছিল ব্যাটারা যাবার আগে রহমত কন্ট্রাক্টরের খাতাপত্র দেখা হয়েছে—ডক্টর হারুন ছাড়া রিসার্চ

সেন্টারের আর কারও নাম নেই তার খাতায়। সেদিন রাতে সে টেলিফোন করেনি ডক্টর হারুনকে, তার দুদিন আগে থেকেই সে টঙ্গিতে ছিল না, ব্যবসার কাজে গিয়েছিল চিটাগাং, গতকাল ফিরেছে। ঢাকায় Q-4 ব্রাঞ্চ এবং আই. বি. ডিপার্টমেন্ট প্রাণপণে চেষ্টা করছে পত্রিকা অফিসগুলোয় চিঠি পৌঁছে দিয়েছে যারা তাদের খুঁজে বের করবার জন্যে। আজ সকাল থেকে ইন্সপেক্টর রায়হান দুজন সহকারী নিয়ে ল্যাবরেটরির প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং তাদের মধ্যে কার সঙ্গে কি রকম মাখামাখি, ইত্যাদি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে প্রত্যেককে আলাদা ভাবে ডেকে নিয়ে—কিন্তু ফল বিশেষ হয়নি। ওদিকে একদল টঙ্গির আশে পাশে তিন মাইলের মধ্যে প্রত্যেকটা বাড়িতে টুঁ মেরে প্রত্যেকটা লোকের সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে লেগে গেছে; কেউ কোন রকম অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। সবদিকে লোক লাগিয়ে দিয়েছি, কাজ চলছে পুরোদমে, কিছু না কিছু বেরিয়ে পড়বেই।'

'তা ঠিক।'—মনে মনে হাসল রানা। এ ব্যাপারে কর্নেল শেখের মত যোগ্য লোক মেলা ভার, কোথাও ফাঁক রাখবার মানুষ সে নয়। এবং এ-ই চেয়েছিল রানা। কিন্তু এখন একটু একটু করে কর্নেল শেখের বোধোদয়ের প্রয়োজন আছে, নইলে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। বলল, 'মাস দুয়েকের মধ্যে কিছু না কিছু বেরিয়ে পড়বেই, তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেরামতী দেখাবে বলে ঘোষণা করেছে ভাইরাস চোর, তার কি হবে? কাজেই বেরোতে হচ্ছে আমাকে। তুমিও যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

'কিন্তু, রানা, কি করতে হবে আমাকে বললে আমিই তো ব্যবস্থা করতে পারি!'—বলল কর্নেল শেখ। 'শরীরের ওপর এরকম অত্যাচার করলে ঠিক মারা পড়বে তুমি।'

'যে লোকটা বটুলিনাস আর কালকূট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সামান্য কিছু ভুল হয়ে গেলেও মারা পড়ব আমি। তোমরাও মারা পড়বে। কাজেই মারা পড়বার কথা এখন চিন্তা না করাই ভাল।'

দারোগা ইয়াকুব আলী চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল, 'অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, আর সত্যিই যদি লোকটা ডেমোনস্ট্রেশন দেখায়, তাহলে কি যে হবে ভাবছি। হয়তো রিসার্চ সেন্টার বন্ধই করে দিতে হবে।'

'বন্ধ? কেবল বন্ধ করলে তো চলবে না। লোকটা চায় ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হোক পুরো রিসার্চ সেন্টার, বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হোক ওটাকে তারপর মাটির সঙ্গে। প্রেসিডেন্ট এখন ঢাকায়, সমস্ত ডিসিশন উনিই নেবেন। কি হয় বলা যায় না, তবে আমার মনে হয় না এক উন্মাদের হুমকির কাছে আত্মসমর্পণ করবেন উনি। অবশ্য সবটা নির্ভর করছে এখন ঘটনার গতি প্রকৃতির ওপর। এখনও আতঙ্কের পর্যায়ে পৌঁছোয়নি মানুষের অবস্থা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়, স্যার,'—বলল ইয়াকুব আলী। 'এক নম্বর ল্যাবের সব কয়জনকে গ্রেপ্তার করে ফেললে হয়তো ঠেকানো যায় উন্মাদটাকে। আসল লোকটাও ধরা পড়ে যায় নকলদের সঙ্গে সঙ্গে।'

'লাভ নেই কোন, দারোগা সাহেব।'—জবাব দিল রানা। 'লোকটা পাগল হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিভাবান পাগল। এ সম্ভাবনার কথা সে নিশ্চয়ই চিন্তা করে রেখেছে কয়েক মাস আগেই। দলবল আছে লোকটার, প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মেসেঞ্জার দিয়ে পত্রিকা অফিসে চিঠি পৌঁছানো থেকেই। ভাইরাস চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে পাচার করে দিয়েছে সে ওগুলো অন্য লোকের কাছে। ওকে ধরলে বিপদ আরও বাড়বে। ওকে ধরার চাইতে ভাইরাসগুলো উদ্ধার করাই এখন আসলে বেশি দরকার।'

'কি করতে চাও এখন?'—জিজ্ঞেস করল কর্নেল অসহিষ্ণু কণ্ঠে।

'আপাতত ছদ্মবেশ ধারণ করতে চাই। এক জোড়া গোঁপ, একটা চশমা আর গালের ওপর কয়েকটা তুলির প্রলেপ পড়লেই আমি হয়ে যাব ইন্সপেক্টর বাহাদুর আলী। খাকী একটা কোর্তা গায়ে দিলে কারও সাধ্য নেই আমাকে মাসুদ রানা বলে চেনে। বাথরূম থেকে আসছি আমি এখুনি। তুমি ততক্ষণে ডক্টর আবু সুফিয়ানকে টেলিফোন করে বাসায় থাকতে বলো। বলবে, আগামী তিন মিনিটের মধ্যে তুমি দেখা করতে যাচ্ছ ওর বাসায়।'

'তিন মিনিট? পনেরো মিনিটের আগে তো পৌঁছানোই যাবে না...'

'যা বলছি তাই করো। পরে এক্সপ্লেন করব।'

তিন মিনিট পর বাথরূমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রানা। খাকী পোশাক, কোমরে ঝুলছে রিভলভার—সম্পূর্ণ অন্য লোক। রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল। রানার আপাদমস্তক একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল সে।

'কি হলো?'—জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরছে না কেউ।'—বলল কর্নেল শেখ। 'রিং হচ্ছে কিন্তু ধরছে না।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। 'গাড়ি আছে না?'

'তৈরি আছে।'—জবাব দিল ইন্সপেক্টর রায়হান।

'ঠিক আছে, ফোন রেখে দাও। এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাদের।'

'আঙুলগুলো ব্যান্ডেজ করে নিলে ভাল হত না?'—ফোন নামিয়ে রেখে রানার হাতের আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে বলল কর্নেল শেখ। 'রক্ত পড়ছে এখনও। ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে।'

'ব্যান্ডেজ থাকলে রিভলভারের ট্রিগার গার্ডের মধ্যে দিয়ে আঙুল ঢোকানো যায় না।'

'গ্লাভস পরে নাও নাহয়। রাবার বা প্লাস্টিক গ্লাভস?'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, থমকে দাঁড়াল চৌকাঠের ওপর। 'ঠিক বলেছ।'—কর্নেল শেখের দিকে চাইল সে। আপন মনেই বলে চলল, 'ঠিক বলেছ। গ্লাভস পরলে হাতের কাটা দাগ দেখা যায় না। আর পায়ের কাটা দাগ ঢাকতে হলে দরকার মোজা।'—বিছানায় বসে পড়ল রানা। 'মাথায় গোবর আছে আমার!'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সবাই রানার দিকে। কেউ কোন কথা বলল না। রানার এইসব কথা অর্থহীন ওদের কাছে—বিকারগ্রস্ত রুগীর প্রলাপ। শুধু কাছে এগিয়ে এল অনীতা। বুঝতে পেরেছে সে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সে রানার

মুখের দিকে।

'উলু খাগড়া।'—ফিসফিস করে বলল অনীতা। 'রিসার্চ সেন্টারের চারপাশের উলু খাগড়া। আমিও বুঝতে পারিনি আগে। কিন্তু অবাক হয়েছিলাম সেদিন ভদ্রমহিলাকে মোজা পরতে দেখে। এখন বুঝতে পারছি...'

'কি ব্যাপার, রানা?'—জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। 'কিসের মোজা?'

সরাসরি দারোগা ইয়াকুব আলীর দিকে চাইল রানা। 'আমাদের সঙ্গে আপনার যাওয়ার কোন দরকার নেই, দারোগা সাহেব। আপনি জলদি একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যোগাড় করুন গিয়ে।'

'কিসের পরোয়ানা, স্যার? খুনের চার্জ?'

'না, খুনীকে সাহায্য করবার দায়ে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

'কাকে?'—অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। 'কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে?'

'ডক্টর মোহাম্মদ হারুনকে।'

তিন

দারোগার জীপ ডক্টর হারুনের বাড়ির সামনে থামতে না থামতেই পৌছে গেল সেখানে রানা, কর্নেল শেখ আর ইন্সপেক্টর রায়হান মাইক্রোবাসে চড়ে। ডক্টর আবু সুফিয়ানের বাড়ির দরজায় তালা। তালা না ভেঙে দূর থেকে বাড়িটা গার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করেই চলে এসেছে ওরা সোজা ডক্টর হারুনের বাসায়।

নক করতেই দরজা খুলে দিল ডক্টর হারুন, পিছনে তার স্ত্রী। খাকী কোর্তার সমারোহ দেখেই পিলে চমকে গেল ডক্টর হারুনের, কিন্তু যথাসম্ভব মুখের চেহারা ঠিক রেখে জিজ্ঞেস করল সে, 'কি ব্যাপার, আসুন।'

ঘটা করে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পড়ে শোনাল ইয়াকুব আলী। চুনের মত সাদা হয়ে গেল মিস্টার অ্যান্ড মিসেসের মুখ।

'কি বলছেন আপনি!'—ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল ডক্টর হারুন। 'অ্যাকসেসরি আফটার মার্ডার! এসব আপনি কি বলছেন?'

'আমাদের বিশ্বাস, আমরা কি বলছি তা আপনি ভাল করেই জানেন।'—ধীর স্থির কণ্ঠে বলল দারোগা সাহেব। 'যাই হোক, আপনাকে সাবধান করে দেয়া দরকার যে এখন আপনি কোন কথা বললে সেটা বিচারের সময় আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। এক্ষুণি আপনার জবানবন্দী পেলে অবশ্য আমাদের অনেক সুবিধা হবে, কিন্তু যাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার কয়েকটা অধিকার মানে—যাকে বলে রাইট আছে। কোন কথা বলার আগে উকিলের পরামর্শ নেবার অধিকার আছে আপনার।'—ভয়ঙ্কর এক পুলিসী হাসি হাসল ইয়াকুব আলী। হার্টফেলের কাছাকাছি অবস্থায় পৌছে গেল ডক্টর হারুন সেই এক হাসিতেই।

জবান বন্ধ হয়ে গেল তার।

এক পা এগিয়ে এল মিসেস হারুন। 'দয়া করে একটু পরিষ্কার বুঝিয়ে বলবেন? এসব…এসবের কি মানে?'—লক্ষ করল রানা মানেটা মিসেস হারুনের কাছেও বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট নয়। এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছে সে অপর হাত, তবু থামাতে পারছে না কাঁপুনি। পায়ে মোজা পরা আছে এখনও।

'নিশ্চয়ই।'—জবাব দিল ইয়াকুব আলী। 'গত রাতে আপনার স্বামী মিস্টার মাসুদ রানার কাছে,'—মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল দারোগা, 'যে স্টেটমেন্ট…'

'মাসুদ রানা!'—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রানার মুখের দিকে। 'এই লোকটা তো মাসুদ রানা নয়।'

'আমার আগের চেহারাটা পছন্দ হচ্ছিল না বলে একটু বদলে নিয়েছি। আসলে আমি মাসুদ রানাই।'—বলল রানা। 'দারোগা সাহেবের বক্তব্য শেষ হয়নি। শুনুন।'

'যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন,'—অসম্পূর্ণ কথার খেই ধরল ইয়াকুব আলী, 'সেটা ডাঁহা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত পরশু রহমত কন্ট্রাক্টর টেলিফোনে ডাকেনি আপনাকে, সে ছিল তখন চিটাগাং। দ্বিতীয়ত, আপনার ভেসপা স্কুটারের মাডগার্ডে একরকম লাল মাটি পাওয়া গেছে, যেটা রিসার্চ সেন্টারের চারপাশে ছাড়া এই অঞ্চলের আর কোথাও নেই। আমরা সন্দেহ করছি, এই স্কুটারে করে সেদিন রাতে রিসার্চ সেন্টারে গিয়েছিলেন আপনি। তৃতীয়ত…'

'আমার স্কুটার!'—হাতীর পুল ভেঙে পড়েছে যেন ডক্টর হারুনের মাথার ওপর। 'রিসার্চ সেন্টারে? আমি কসম খেয়ে…'

'তৃতীয়ত, পরশু রাতে আপনি আপনার স্ত্রীকে পিছনে বসিয়ে স্কুটারে করে গিয়েছিলেন রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে নারী ধর্ষণের অভিনয় করে আপনি দৌড়ে গিয়ে ওঠেন মরিস মাইনর গাড়িতে, আপনার স্ত্রী স্কুটার চালিয়ে ফিরে আসেন। ডক্টর সাদেকের বাসার কাছে যেখানটায় মরিস মাইনর গাড়িটা ফেলে রাখা হয়েছিল সেখানকার মাটিতে আপনাদের স্কুটারের চাকার দাগ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ স্বামীকে নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সহধর্মিণী স্কুটার চালিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর সাদেকের বাড়ির সামনের সেই আমবাগানটায়। আরও একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল আপনাদের ডক্টর হারুন, তাহলে এত সহজে ধরা পড়তেন না।'

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ডক্টর হারুন, সব রক্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে তার মুখ থেকে। একটি কথাও অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে তার। কথা বলেই চলল ইয়াকুব আলী।

'অস্বীকার করবার উপায় রাখিনি আমরা, তাই না? যাক চতুর্থ এবং পঞ্চমত, হাতুড়ি এবং প্লায়ার্স—কুকুরটাকে ঘায়েল করবার জন্যে হাতুড়ি আর রিসার্চ সেন্টারের বেড়া কাটার জন্যে প্লায়ার্স, দুটোই কাল রাতে আবিষ্কার করেছেন মিস্টার মাসুদ রানা আপনার গ্যারেজের মধ্যে।'

'আচ্ছা, তাহলে এই হারামজাদাই…'—চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল ডক্টর

হারুনের। ঘুসি পাকিয়ে ঝাঁপ দিল সে রানার দিকে। 'শালা, শুয়োরের বাচ্চা, চোর...'—দশ ইঞ্চি দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে গেল কর্নেল শেখ রানা এবং ডক্টর হারুনের মাঝখানে, দুদিক থেকে দুই হাত চেপে ধরল ইন্সপেক্টর রায়হান আর দারোগা ইয়াকুব আলী। পাগলের মত টেনে হিঁচড়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল ডক্টর হারুন। প্রচণ্ড ক্রোধে অন্ধ দিশেহারা হয়ে গেছে যেন সে। 'এই জন্যেই কাল ওর বউকে রেখে বাইরে গিয়েছিল হারামীটা। এই জন্যেই...'—গলার স্বরটা দুর্বল হয়ে মিলিয়ে গেল। তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার যখন কথা বলল তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ কথা বলছে যেন। 'হাতুড়ি...প্লায়ার্স...এখানে কেন? আমার বাসায় ওগুলো পাওয়া যায় কি করে?'—অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। 'আমার গ্যারেজে হাতুড়ি, প্লায়ার্স এল কি করে? কি বলছে এরা, রুবি?'—মরিয়া দৃষ্টিতে চাইল সে তার স্ত্রীর দিকে।

'আমরা বলছি খুনের কথা।'—সোজা সাপ্টা উত্তর দিল ইয়াকুব আলী। 'সহজে স্বীকার করবেন, এটা আমরা আশা করিনি। দয়া করে চলুন আমাদের সঙ্গে থানায়। দু'জনই।'

'কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে আপনাদের, দারোগা সাহেব। বুঝতে পারছি না আমি। কিন্তু ভুল করছেন আপনারা।'—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ডক্টর হারুন কিছুক্ষণ ইয়াকুব আলীর মুখের দিকে। 'আমি...আমি প্রমাণ করে দেব যে আমি নির্দোষ। ঠিক প্রমাণ করে দেব। আর যদি সঙ্গে নিতে হয় আমাকে নিন, দয়া করে আমার স্ত্রীকে টানবেন না এর মধ্যে। প্লীজ!'

'কেন টানবে না?'—এবার কথা বলল রানা। 'পরশু রাতে আপনি নিজে আপনার স্ত্রীকে এ ব্যাপারের মধ্যে টানতে তো কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি?'

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না আমি।'—বলল ডক্টর হারুন ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

'মিসেস হারুনও কি বুঝতে পারছেন না? আপনি নিশ্চয়ই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন? কারণ রিসার্চ সেন্টারের বাইরে উলু খাগড়া আর কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পা কেটেছিল আপনারই—তাই প্রয়োজন পড়েছে ওই মোজার। আরও ভেঙে চুরে বলতে হবে?'

'দিস ইজ রিডিকুলাস!'—অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠল মিসেস রুবি হারুন। 'আমাকে এভাবে অপমান করবার কি অর্থ, মিস্টার...'

'বেহুদা সময় নষ্ট করছেন আপনি আমাদের, মিসেস হারুন।'—বাধা দিয়ে কথা বলে উঠল কর্নেল শেখ। কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের ভঙ্গি। 'মহিলা-পুলিস আছে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে। ডাকব তাকে?'—নীরবতা। 'বেশ, বোঝা গেল, মোজা খুলে পরীক্ষা করা হলে সে পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন না আপনি। আর সময় নষ্ট না করে রওনা হওয়া যাক এখন থানার উদ্দেশে।'

'তার আগে আমি কি দু'চারটে কথা বলতে পারি ডক্টর হারুনের সাথে?'—জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলো, নিষেধ করছে না কেউ।'—বলল কর্নেল শেখ।

'একটু গোপনে বলতে চাই আমি কথাগুলো। একা।'

ইয়াকুব আলী এবং কর্নেল শেখ মুখ চাওয়া চাওয়ি করল পরস্পরের। যেন অবাক হয়েছে রানার এই প্রস্তাবে। আসলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল ওদের—কিন্তু আইন মাফিক হওয়া দরকার বলে সবার সামনে অনুমতি চাওয়া হচ্ছে।

'কেন?'—ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ।

'ডক্টর হারুনের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় আছে আমার। বন্ধুত্বই আছে এক রকম বলতে পারো। আমাদের হাতে সময় কম। হয়তো আমার কাছে উনি স্বীকার করবেন কয়েকটা কথা।'

'তোমার কাছে স্বীকার করব?'—ঘৃণায় বিকৃত করে ফেলল ডক্টর হারুন চোখ মুখ। 'অসম্ভব। কক্ষনো না।'

'সময় সত্যিই কম।'—যেন এসব কথা শুনতেই পায়নি, এমন ভাবে বলল কর্নেল শেখ। 'ঠিক আছে, রানা। দশ মিনিট।'—মাথা নেড়ে ইশারা করল সে মিসেস হারুনকে। একটু ইতস্তত করল মিসেস হারুন, স্বামীর দিকে চাইল একবার, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পিছন পিছন গেল কর্নেল শেখ, ইন্সপেক্টর রায়হান আর ইয়াকুব আলী। ডক্টর হারুনও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার জন্যে নড়ে উঠেছিল, কিন্তু পথ রোধ করল রানা।

'যেতে দাও আমাকে।'—চাপা আক্রোশ ডক্টর হারুনের কণ্ঠে। 'তোমার মত ইতরের সঙ্গে কোন কথা নেই আমার। তোমার মত···'

রানার তিন-পুরুষ উদ্ধার করে দিল ডক্টর হারুন। তবু রানার মধ্যে সরে দাঁড়াবার কোন লক্ষণ না দেখে ঘুসি তুলল সে আনাড়ীর মত। রিভলভার বের করল রানা। সাপ দেখার মত চমকে উঠল রিসার্চ কেমিস্ট রিভলভার দেখে।

'ওই পাশের ঘরে চলুন।'

'কেন? ওই ঘরে কেন যাব? অ্যারেস্ট করতে এসেছ থানায় নিয়ে যাও। ওই ঘরে যাব না আমি কিছুতেই। তুই মনে করেছিস···উহ, বাবাগো!'

বাম হাতে ঘুসি মারবার ভান করেছিল রানা, ডান হাত তুলেছিল ডক্টর হারুন ঘুসি ঠেকাবার জন্যে—পাঁজরের ওপর জোর এক গুঁতো চালিয়ে দিয়েছে রানা রিভলভার দিয়ে। হাতটা নিচু করতেই মাঝারি গোছের একটা চাপড় লাগাল সে ডক্টর হারুনের গর্দানে। যুদ্ধং দেহী ভাবটা ধুলোয় মিশে গেল ভদ্রলোকের। এবার ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে ঠেলে নিয়ে গেল রানা ওকে পাশের ঘরে। ডাইনিং রুম। এক ধাক্কা দিয়ে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে বসে রইল সে, তারপর চাইল রানার দিকে।

'আগে থেকেই প্ল্যান করা আছে তোমাদের। ওরা জানে যে তুমি এভাবে কথা আদায় করবার চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে।'

'জানে। ওদের পক্ষে দোষী সন্দেহ করে কারও ওপর অত্যাচার করা সম্ভব নয়। ওদের চাকরি আছে, পেনশনের চিন্তা আছে। আমার ওসব বালাই নেই। আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কাজেই এই কাজের ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে

দেয়া হয়েছে।'

'তুমি মনে করেছ আমার ওপর নির্যাতন করে পার পেয়ে যাবে তুমি?'—বলল ডক্টর হারুন চিবিয়ে চিবিয়ে। 'ভেবেছ এই কথা প্রকাশ করব না আমি কোর্টে?'

'আমার কাজ যখন শেষ হবে, তখন কোন কিছু প্রকাশ করবার ক্ষমতা আপনার থাকবে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'—নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'খুব সম্ভব চ্যাং দোলা করে বের করতে হবে আপনাকে এখান থেকে—পা বেরোবে আগে, মাথাটা যাবে পিছন পিছন। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে সত্যি কথাটা বের করে নেব আমি, কিন্তু শরীরের কোথাও কোন দাগ পাওয়া যাবে না। আর্ট অফ টরচারে আমার ডিপ্লোমা আছে। বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছি আমি নির্যাতনের দয়া করে একটা কথা বিশ্বাস করবার চেষ্টা করুন, আপনি ব্যথা পেলে কিছুই এসে যাবে না আমার।'

প্রাণপণে রানার কথায় অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করল ডক্টর হারুন, কিন্তু পারল না। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা প্রয়োজন হলে যা খুশি তাই করতে পারে। যদি প্রয়োজন পড়ে, নিষ্ঠুরতম আঘাত হানবে এই লোক।

'প্রথমে সহজ ভাবেই চেষ্টা করা যাক।'—শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। যেন গল্প গুজব করছে। 'বর্তমান পরিস্থিতিটা আগে বুঝিয়ে দিই আপনাকে। খেপা এক লোক কালকূট আর বটুলিনাস টক্সিন চুরি করে এখন ভয় দেখাচ্ছে তার উদ্ভট কয়েকটা আদেশ অমান্য করা হলে ফাটিয়ে দেবে সে একটা বোতল। আজই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রথম ডেমোনস্ট্রেশন দেখাবে সে।'

'কি বলছেন আপনি!'—আঁতকে উঠল ডক্টর হারুন। 'কি ফাটাবে? বটুলিনাস, না কালকূট?'

'ঠিক নেই। এ দুটোর মধ্যেকার পার্থক্য খেপা লোকটার নাও জানা থাকতে পারে। ধরে নেয়া যাক কপালগুণে বটুলিনাসই ফাটাল সে প্রথম। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দেশের একটা অংশ। কি রকমের পাবলিক প্রেশার সৃষ্টি হবে আশাকরি বুঝবার ক্ষমতা আপনার আছে। এবং এটুকুও নিশ্চয়ই বুঝবার ক্ষমতা আছে যে এর ফলে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হবে আপনাকে সস্ত্রীক। কল্পনা করুন আপনার স্ত্রীর গলায় পরানো হচ্ছে ফাঁসীর দড়ি, ট্র্যাপডোর খুলে দিল জল্লাদ, ঝুলে পড়ল দেহটা, ঝাঁকি খেল, মট্ করে ভেঙে গেল ভারটিব্রা, একটা পা লাফিয়ে উঠল নিজের অজান্তে—স্থির হয়ে গেল দেহটা। মৃত। কল্পনা করতে পারেন? ফাঁসীর মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর মৃত্যু—এবং খুনীর সাহায্যকারীর ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট হচ্ছে ফাঁসী। ফাঁসী হবে আপনাদের।'

ভীতি ফুটে উঠল ডক্টর হারুনের চোখে। যেন বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছে সে মানস চোখে। চিকন ঘাম দেখা দিল তার কপালে। ডাইনিং টেবিলটা আঁকড়ে ধরেছে সে একহাতে।

'আপনি জানেন, এখানে আমার কাছে কোন কথা স্বীকার করে ইচ্ছে করলেই পরে সেটা অস্বীকার করতে পারেন আপনি।'—বলেই চলল রানা, 'সাক্ষী ছাড়া কোন মন্তব্য বা স্বীকৃতির কোন দাম নেই। কাজেই ভয়ও নেই আপনার।'—হঠাৎ

গলার স্বর নিচু করে ফেলল রানা। 'গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছেন এর মধ্যে, তাই না?'

মাথা নাড়ল ডক্টর হারুন। মেঝের দিকে চেয়ে রয়েছে সে এখন।

'হত্যাকারীটা কে?'

'আমি জানি না। সত্যি বলছি, জানি না আমি। একজন লোক টেলিফোনে কন্ট্যাক্ট করেছিল আমাকে। বলেছিল যদি ওর কথা মত পেট্রল জীপের গার্ডদের বোকা বানাতে রাজি হই তাহলে টাকা দেবে। ব্যাপারটা একটু ঘোরাল বুঝতে পেরে আমি সোজা নাকচ করে দিয়েছিলাম পরদিন সকালে একটা মোটা খাম পেলাম। দু'হাজার টাকা আর একটা চিঠি ছিল তার মধ্যে। চিঠিতে লেখা ছিল, যদি তার কথা মত কাজ করি তাহলে আরও তিনহাজার টাকা দেবে। দিন পনেরো পর আবার টেলিফোন করল সেই লোকটা।'

'গলার স্বর চিনতে পেরেছিলেন?'

'না। মাউথ পিসের ওপর রুমাল দিয়ে নিয়েছিল বোধহয়। গম্ভীর আর আবছা শোনাচ্ছিল স্বরটা।'

'কি বলল সে টেলিফোনে?'

'চিঠির কথাগুলোই বলল আবার। লোভ দেখাল আরও তিন হাজার টাকার।'

'তারপর?'

'বললাম, রাজি আছি।'—মাথা নিচু করে বলল ডক্টর হারুন। 'আমি...আমি আগের টাকাগুলো থেকে বেশ কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম। তাই...'

'পরের তিন হাজার টাকা পেয়েছেন এখনও?'

'না।'

'দু'হাজারের মধ্যে থেকে কত খরচ করে ফেলেছিলেন?'

'পাঁচশো মত।'

'বাকি টাকাগুলো দেখান আমাকে

'এখানে নেই। মানে এই বাড়িতে নেই। গতকাল আপনি চলে যাওয়ার পর ওগুলো পুঁতে রেখে এসেছি আমি ওই ওদিকের একটা মাঠের মধ্যে ঝোপের ধারে।'

'কত টাকার নোট ছিল ওগুলো?'

'পঞ্চাশ টাকার নোট।'

'বুঝলাম।'—মৃদু হাসল রানা। 'রিসার্চ ছেড়ে দিয়ে গল্পের বই লিখলে বেশ উন্নতি করতে পারতেন আপনি, ডক্টর।'—এগিয়ে গেল রানা দুই পা। চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে চেয়ার থেকে তুলে ফেলল ওকে আধহাত সেই সঙ্গে সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল রিভলভারের নল দিয়ে। ব্যথায় হাঁ হয়ে গেল ডক্টর হারুনের মুখ, সেই মুখের মধ্যে ভরে দিল রানা রিভলভারের নলটা। দশ সেকেন্ড চেয়ে রইল সে ওর আতঙ্কিত চোখের দিকে বাঘের দৃষ্টিতে।

'বেশি সুযোগ দেয়ার মত সময় আমার হাতে নেই, ডক্টর। একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, আপনি হারিয়েছেন সেটা এবার শুরু করছি আমি আমার কেরামতি। মিথ্যুক পাজী কোথাকার! একটার পর একটা মিছে কথা বলেই চলেছে! আপনি কি

করে ভাবতে পারলেন আপনার এইসব গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করব আমি? যে ইবলিসের চ্যালা এসব কিছুর পিছনে আছে সে টেলিফোনে আপনাকে ওই রকম প্রস্তাব দেবে, এ কথা বিশ্বাস করতে বলেন আপনি মানুষকে? আপনার মত গর্দভ সে নয়। আপনাকে ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব দিলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দেবেন না, এ নিশ্চয়তা সে পেল কোত্থেকে? তার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যেতে পারত আপনি বেঁকে বসলে, বলতে চান এতবড় ঝুঁকি নেবার মত আহাম্মক সে? টঙ্গিতে অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ নেই, কৌতূহলবশে যে কোন টেলিফোন অপারেটার তার প্রত্যেকটি কথা শুনতে পারে, একথা ভেবে দেখেনি সে? এতবড় একজন ক্রিমিনাল কেবল আপনার মত একটা ছুঁচোর লোভের ওপর নির্ভর করে এতবড় একটা কাজে হাত দেবে?'—রিভলভারের নলটা বের করে নিল রানা ওর মুখের মধ্যে থেকে। 'প্রস্তুত হন, ডক্টর। এক্ষুণি এমন একটা অভিজ্ঞতা হবে আপনার যা জীবনে কখনও হয়নি, আর হবেও না।'

হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল ডক্টর হারুন দুই হাতে মুখ ঢেকে। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ওর সমস্ত গর্ব আর আত্মাভিমান। 'মরে গেছি আমি! খোদা! শেষ হয়ে গেছি! ধারে ডুবে আছি আমি, মিস্টার রানা। বিশ হাজার টাকা আমার দেনা।'—ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সে।

'কান্নাকাটি বন্ধ করুন।'—কর্কশ কণ্ঠে বলল রানা। 'এখন কান্নাকাটি করে লাভ নেই কিছু।'

'রহমত কন্ট্রাক্টর চাপ দিচ্ছিল ভয়ঙ্কর রকমের। রিসার্চ সেন্টারের অফিসার্স্ মেসের সেক্রেটারি আমি। ছয় হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছি আমি ওখান থেকে।'—অনেকটা আপন মনে বলে চলল ডক্টর হারুন। 'কেউ একজন বুঝে ফেলেছিল সেটা। রিসার্চ সেন্টারেরই কেউ। কে সে, আর কেমন করেই বা সব ব্যাপার জানতে পারল জানি না। চিঠি এল একটা—সহযোগিতা না করলে পুলিসে ধরিয়ে দেবে। তাই···তাই ওই কাজটা করতে হয়েছে আমাকে।'

এতক্ষণে সত্যের গন্ধ পেয়ে রিভলভারটা হোলস্টারে পুরল রানা। বলল, 'কে সেই লোক, আঁচও করতে পারেননি আপনি?'

'না। বিশ্বাস করুন। আর ওই হাতুড়ি আর প্লায়ার্সের ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানি না আমি। টাকার লোভে পড়ে আজ আমার এই অবস্থা। নইলে ভদ্র বংশের···'

'ডক্টর সুফিয়ান কি সেই লোক?'

'হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে অতবড় একজন মাইক্রোবায়ো···'

'কবে শেষ দেখা হয়েছে আপনাদের?'

'গতকাল। বিকেল সাড়ে তিনটায় বাড়ি চলে আসি আমি রিসার্চ সেন্টার থেকে। তখনই শেষ দেখা।'

'এর মধ্যে আর দেখা হয়নি? আজ?'

'না। ওঁর সঙ্গে এমনিতেও আমার ঘনিষ্ঠতা একটু কম।'

'কোথায় এখন ডক্টর সুফিয়ান? জানেন?'

'আজ রিসার্চ সেন্টার বন্ধ, কাজেই বাসাতেই আছেন নিশ্চয়ই। কিংবা...'
'কিংবা কি?'
'কিংবা হয়তো রহমত কন্ট্রাক্টরের গোপন জুয়ার আড্ডায় আছেন।'
'জুয়া খেলে ডক্টর সুফিয়ান? আপনি জানলেন কি করে?'
মেঝের দিকে চেয়ে জবাব দিল ডক্টর হারুন, 'আমিও যাই ওখানে।'
'চলুন। আজও যেতে হবে একবার।'

চার

পাওয়া গেল না সেখানে কবীর চৌধুরীকে। টঙ্গি এলাকাতেই কোথাও আত্মগোপন করেছে সে। সন্ধ্যার পর ছাড়া রাস্তায় বেরোবে না। কিন্তু টের পেয়ে গেল নাকি লোকটা যে পালিয়ে এসেছে রানা বন্দী-দশা থেকে এবং এখন টঙ্গিময় খোঁজা হচ্ছে ডক্টর আবু সুফিয়ানকে? নাকি আগে থেকেই হিসেব করা আছে চাল, ঠিক সময় মত সরে পড়েছে সে?

সার্জেন্টের কোয়ার্টারে ফিরে এল রানা। ফিরেই টেলিফোন পেল মেজর জেনারেল রাহাত খানের।

'রানা?'

'জ্বি, স্যার।'

'কেমন বোধ করছ এখন? শুনলাম মারাত্মক জখম হয়েছ তুমি?'

'তেমন কিছু না, স্যার। কাজে অসুবিধে হচ্ছে না।'

'আজ রাত একটার সময় তোমার চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। কদ্দূর কি করলে?'

'টেলিফোনে বলা যাবে না, স্যার। আমি আসছি অফিসে।'

'আমি বাসা থেকে বলছি। বাসায় চলে এসো। অল্পক্ষণ আগেই একটা ফোন পেলাম অফিসে। নাম বলল না, শুধু বলল, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে যদি ভাইরাস সংক্রান্ত সমস্ত ইনভেস্টিগেশন বন্ধ না করা হয় তাহলে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার মধ্যে পতিত হবে মাসুদ রানা। একটু খোঁজ নিয়ে দেখলেই জানতে পারব যে নিখোঁজ হয়েছে মাসুদ রানা। তাকে যদি জীবিত দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে ঠিক সন্ধে ছয়টার সময় আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে আমাদের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করতে হবে; নইলে মাসুদ রানার ধড় থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে সেটা পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হবে কাল বেলা বারোটার মধ্যে। অফিস থেকে বাসায় চলে এসেছি আমি সঙ্গে সঙ্গে। তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী আলাপ করতে চাই এ ব্যাপারে।'

'আসছি, স্যার এক্ষুণি।'

'ছদ্মবেশে এসো। মাসুদ রানা ওই লোকটার হাতে বন্দী হয়ে আছে, থাক।'

'ইন্সপেক্টর বাহাদুর আলী হয়ে আছি আমি আপাতত। এই অবস্থায় দেখা করা যাবে তো, স্যার?'

'চলে এসো। ও, ভাল কথা, ডক্টর সাদেকের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে বা ছিল কিনা জানতে চেয়েছিলে। ছিল। বছর তিনেক ধরে আর রিনিউ করেনি...'

'গ্রেপ্তার হয়ে গেছে, স্যার ডক্টর সাদেক। আর ড্রাইভিং-এর খবরটা আমি ওর কাছ থেকেই বের করে নিয়েছি। ওর ব্যাপারে আপাতত আর কোন ইন্টারেস্ট নেই, স্যার আমার। আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি।'

'এসো।'

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চারদিকে পাগলের মত খোঁজা হচ্ছে এখনও রানাকে। কবীর চৌধুরী এখনও জানে না যে পালিয়েছে রানা এবং গিলটি মিঞা। কিন্তু সত্যিই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কি? এটাও আবার নতুন কোন চাল না তো? যাই হোক, সাবধান থাকতে হবে রানাকে।

মেজর জেনারেল রাহাত খানের বাসা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা আধঘণ্টা পরই। অফিসে ফিরে গেলেন বৃদ্ধ যেমন এসেছিলেন তেমনি গোপনে। গিলটি মিঞা আর রানা চলে গেল পরিচিত কয়েকজন কুখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা করতে পুরানো শহরের ঘিঞ্জি এলাকায়। সারা দুপুর ঘুরল ওরা এখান থেকে ওখানে। ওদেরই একজনের বাড়িতে খেয়ে নিল দুপুরের খাওয়াটা। সার্জেন্টের কোয়ার্টারে যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বিকেলের দিকে কমেছিল বৃষ্টি, সন্ধে লাগতে না লাগতেই চেপে এসেছে আবার।

মেজর জেনারেল রাহাত খান এবং কর্নেল শেখ বসে আছে রানার ঘরে পাংশু মুখে।

'কোন খবর জানতে পারলে, রানা?'

'অনেক খবরই জানা গেছে, স্যার। কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে মিল করতে পারছি না একটার সঙ্গে আরেকটা।'—দুটো বেঞ্জেড্রিন ট্যাবলেট গিলে ফেলল রানা আধ গ্লাস ব্র্যান্ডি দিয়ে। বলল, 'ট্যাবলেটে কাজ হবে না। আবার একটা ইঞ্জেকশন নিতে পারলে রাত বারোটা পর্যন্ত চাঙ্গা থাকা যেত।'

গম্ভীর মুখে টেলিফোনে খবর দিল কর্নেল শেখ ডাক্তারকে চলে আসবার জন্যে। সারা কোয়ার্টারে এক চক্কর দিয়ে এসে প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা, 'কই, অনীতা বৌদিকে তো দেকচি না, স্যার?'

একটু অবাক হলো কর্নেল শেখ, কিন্তু জবাব দিল এ প্রশ্নের।

'ডক্টর সাদেকের বাড়ি গেছে তার মা বোনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। অ্যাংলো হলে কি হবে, মায়া দরদ আছে মেয়েটার। আমি নিষেধ করেছিলাম। বড় ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে গেলে কোন কথা দিয়েই মায়ের মনকে সান্ত্বনা দেয়া যায় না। তবু গেল, বলল, অসুস্থ মানুষ...'

'খামোকা সময় নষ্ট করতে গেছে সে ওখানে। ডক্টর সাদেক নির্দোষ। একথা আজ ভোরে তার মাকে ভালমত বুঝিয়ে বলে এসেছি আমি। অসুস্থ মানুষ, তাই

বলতে হয়েছে, নইলে হয়তো শক পেয়ে মারাও যেতে পারতেন। ডক্টর সাদেককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর নিশ্চয়ই উনি আমার কথাগুলো মেয়েদের বলেছেন। কাজেই সমবেদনা বা সান্ত্বনার কোন প্রয়োজনই নেই আর ওঁদের।'

'মিছেমিছি তুমি ওদের বলতে গেলে কেন যে ডক্টর সাদেক নির্দোষ?'—বলল কর্নেল শেখ।

'মিছেমিছি বলিনি। ডক্টর সাদেক সত্যিই নির্দোষ।'

'নির্দোষ! কি বলছ তুমি, রানা? তুমিই না প্রমাণ পত্র তুলে দিলে আমার হাতে, গ্রেপ্তার করতে বললে...'

'ডক্টর সাদেকের দোষ হয়েছিল শুধু একটা ব্যাপারে: মিছেকথা বলেছিল আমার কাছে যে গাড়ি ড্রাইভ করতে জানে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ভয় পেয়ে মিছেকথা বলেছিল। আর ব্যাঙ্কের টাকার রহস্যও এমন কিছু রহস্য নয়। আসল খুনী ছদ্মনামে টাকাগুলো জমা দিয়েছিল ব্যাঙ্কে ডক্টর সাদেকের নামে। যাতে ওর ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে সবার। এসমস্ত ব্যাপারই কয়েক মাস আগে থেকে প্ল্যান করা আছে তার। এর-ওর ওপর আমাদের সন্দেহ ফেলবার জন্যে বেশ কয়েকটা কৌশল করে রেখেছিল সে আগে থেকেই। যাতে আমরা ওদের পিছনে সময় নষ্ট করি—ফলে বেশ কিছুটা সময় হাতে পায় সে। সময়ের তার খুব দরকার। আমাকে বন্দী করেও সময় হাতে পেতে চেয়েছিল সে। মাঝখান থেকে ওর প্ল্যান গোলমাল করে দিয়েছে গিলটি মিঞা। নইলে এখন পর্যন্ত ডক্টর সাদেক আর ডক্টর হারুনের পিছনেই সময় নষ্ট করতে থাকতাম আমরা। হঠাৎ গিলটি মিঞা তার আসল পরিচয় চিনে ফেলায় সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে ওর।'

'চিনে ফেলেছে!'—আকাশ থেকে পড়ল কর্নেল শেখ। 'কি বলছ, রানা? চিনে ফেলেছে গিলটি মিঞা ওকে? কে সে?'

'কবীর চৌধুরী।'

'কবীর চৌধুরী! কবীর চৌধুরী আবার কে?'

রানা পরিচয় দিল কবীর চৌধুরীর। হাঁ হয়ে গেল কর্নেল শেখের মুখ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে ডক্টর হারুনও নির্দোষ?'

'হাতুড়ি আর প্লায়ার্সের ব্যাপারে নির্দোষ। কিন্তু গার্ডদের মনোযোগ অন্যত্র আকর্ষণের জন্যে তাকে এবং তার স্ত্রীকে ব্যবহার করেছিল কবীর চৌধুরী। স্রেফ ব্ল্যাকমেইল। অন্য যে কাউকে দিয়ে করাতে পারত সে কাজটা, কিন্তু সে চেয়েছিল হারুন দম্পতির ওপর সন্দেহ ফেলতে। তাহলে সময় পাওয়া যাবে হাতে।'

'এসব কথা আপনি জানেন, স্যার?'—রাহাত খানের দিকে ফিরল কর্নেল শেখ।

'জানি।'

'তাহলে আমাকে জানানো হয়নি কেন, স্যার?'

'রানা চেয়েছিল তুমি যেন ভুলভাল ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে আসল খুনীকে নিশ্চিন্ত রাখো।'

'রানা চেয়েছিল? রানা চাইবার কে? তাহলে কি...'

'ঠিকই ধরেছ, শেখ। পি. সি. আই. থেকে রানাকে বের করে দেয়া হয়েছিল কর্নেল শেখের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং হাতাহাতি করবার অপরাধে।'

'কিন্তু কই, আমার সঙ্গে তো কোনদিন রানা…ওহ্, বুঝতে পারলাম।'

'এবং রানার অনুরোধেই রিসার্চ সেন্টার থেকে বরখাস্ত করেছিলেন ওকে ডক্টর শরীফ। যাতে করে বাইরে থেকে লক্ষ্য রাখতে পারে রানা। উনি সন্দেহ করেছিলেন যে কিছু কিছু ভাইরাস চুরি যাচ্ছে এক নম্বর ল্যাব থেকে।'

'বুঝলাম।'—দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কর্নেল শেখ। 'আমাদের রানা আমাদেরই আছে। ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে আমার কাছেও প্রকাশ করা হয়নি। ঠিক আছে, মেনে নিলাম। এখন আমাদের কি কর্তব্য, রানা? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে…'

'আমাদের এখন করবার আর কিছু-ই নেই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ছাড়া। আমাদের হাত গুটিযে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে, তার মানে পুলিসী তৎপরতায় তার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। কাজেই এটাই আরও বাড়িয়ে দিতে হবে আমাদের। আমার যতদূর বিশ্বাস, টঙ্গিতেই কোথাও লুকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী। এখান থেকে সরে যাবার চেষ্টা করবে সে আজ ছ'টার পর।'

'তার কাজে কেউ কোন বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না।'—বললেন মেজর জেনারেল। পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করলেন তিনি। 'তার কাজ সে করেই চলেছে। বাইরে অয়্যারলেস ফিট করা ভ্যানটা দেখেছ না? অফিসের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ওটার মারফত। আজ দুপুরে তোমাকে বিদায় দিয়ে অফিসে ফিরেই পেয়েছি ও. পি. পি-র এই ডিসপ্যাচ শীট। আর মিনিট দশেক আগে এসেছে এই মেসেজ। পড়ে দেখো।'

এতক্ষণ রাহাত খানের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ করেনি রানা। এবার একবার চেয়েই জিভ শুকিয়ে এল ওর এরকম চেহারা আগে কখনও দেখেনি সে এই তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধের। শক্তিশালী একজন মানুষ হঠাৎ যখন অনুভব করে আর পারছে না সে, কাঁধের বোঝা আর টানতে পারছে না, নিঃশেষ হয়ে গেছে সে—তার চেহারাটা ঠিক যেমন দেখায়, তেমনি ক্লান্ত, করুণ, অবসন্ন, পরাজিত মনে হচ্ছে আজ এই মহাপরাক্রমশালী বৃদ্ধকে।

প্রথম কাগজটায় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা। ভাষাতেও সেই পাগলামি ছাপ স্পষ্ট। লেখা আছে: 'এখনও দাঁড়িয়ে আছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের দেয়াল। আমার আদেশ উপেক্ষা করা হয়েছে। এবার তার ফল ভোগ করবে তোমরা। একটা ভাইরাসের বোতল ছোট্ট একখানা টাইম বম্বের সাথে বেঁধে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় রেখে দিয়েছি আমি। ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটার সময় ফাটবে সেটা। উত্তর থেকে দক্ষিণে বইছে বাতাস। জনসাধারণ—সাবধান! আজ রাত বারোটা পর্যন্ত দেখব আমি। যদি তার পরেও পাপের বাসা ওই রিসার্চ সেন্টারটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া না হয়, তাহলে আগামী কাল আরেকটা বোতল ফাটাতে বাধ্য হব আমি। এবার ফাটাব ঢাকা নগরীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায়। এমন শিক্ষা দেব আমি তোমাদের যা গোটা মানব জাতি চিরকাল স্মরণ

করবে ভীতির সঙ্গে। তোমাদের সুযোগ দিয়েছি আমি—সে সুযোগ গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছে।'

কাগজটা ভাঁজ করে ফেরত দিল রানা দ্বিতীয় কাগজটার ভাঁজ খুলবার আগেই মুখ খুললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

'প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস পতেঙ্গা এলাকায়। বাতাসের কথা উল্লেখ করেছে এজন্যে যে মাত্র মাইল চারেক স্থলভূমির পরেই বাতাসে ভেসে খোলা সমুদ্রে চলে যাবে ভাইরাস। অবশ্য যদি বাতাসের গতি না বদলায়। খবরটা আমাদের হাতে পৌঁছেচে সোয়া দুটোর সময়। প্রায় সাথে সাথেই রেসকিউ পার্টি রওনা করে দেয়া হয়েছে চিটাগাং থেকে পতেঙ্গার উদ্দেশে. অয়্যারলেসে খবর চলে গেছে পতেঙ্গা এয়ারপোর্টে, পুলিস মিলিটারি আর ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি পৌঁছে গেছে ওখানে, মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে যে যে-ভাবে পারে যেন সবাই সরে যায় উত্তরে যতদূর সম্ভব। কয়েকশো মানুষকে সরিয়ে আনা হয়েছে বাস, ট্রাক আর জীপে করে।'—থামলেন বৃদ্ধ। মেঝের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। 'কিন্তু সব লোককে সরানো সম্ভব হয়নি। আকাশের অবস্থা খারাপ না, ঝড় তুফানের কোন সম্ভাবনাই নেই, তবু এ রকম লোক সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অনেকে অনর্থক হয়রানি মনে করে ডাকাডাকিতে কান দেয়নি। যারা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল মাছ ধরতে, তাদের কাছে খবর পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থাই করা যায়নি। সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে দ্রুত একবার খোঁজা হয়েছে, পাওয়া যায়নি বোমাটা। ঠিক সাড়ে তিনটার সময় একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। একটা খড়ের গাদার কাছে আগুন আর ধোঁয়া দেখা যায়। কাল বিলম্ব না করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে রেসকিউ পার্টি ঘটনাস্থল থেকে।'—একটা সিগারেট ধরালেন বৃদ্ধ। রানা বিছানার ধারে বসেছিল, শরীরটা হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল বোধ করায় শুয়ে পড়ল। চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টেনে কথার খেই ধরলেন রাহাত খান আবার।

'ঠিক সাড়ে চারটার দিকে পি. এ. এফ-এর একটা প্লেন পাঠানো হয়েছিল এখান থেকে। দশ হাজার ফুট উপর থেকে পুরো পতেঙ্গা এলাকাটা বার কয়েক চক্কর দিয়ে ফটো তুলে নিয়ে ফিরে এসেছে সেটা ঢাকায়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দু'মাইল উপর থেকে ছবি তোলা এমন কিছুই নয়। কয়েক বর্গ মাইল এলাকার ছবি তুলে এনেছে প্লেনটা অনায়াসে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেভেলপ করা হয়েছে ছবিগুলো। ওগুলো পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেছে তা লেখা আছে এই দ্বিতীয় কাগজটায়।'

ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজ। বাংলা করলে দাঁড়ায়: 'সমুদ্রের তীর থেকে উত্তরে তিন মাইল পর্যন্ত পতেঙ্গা এলাকায় কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কয়েকশো গরু ছাগল পড়ে আছে এখানে সেখানে—মৃত। মাঠে ময়দানে খেতে খামারে অন্তত দেড়শো মানুষের লাশ দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকের পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় তীব্র যন্ত্রণাময় মৃত্যু ঘটেছে এদের। বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করা হচ্ছে।'

'সরকারী ভাবে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এখন, স্যার?'—জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলা যাচ্ছে না। বিশেষ পরামর্শ সভা ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট আজ সন্ধ্যার পর। উনি নিজে টেক-আপ করেছেন ব্যাপারটা। আজ রাত দশটা নাগাদ একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে আশা করা যাচ্ছে।'

'আপনি থাকছেন সেই মীটিং-এ?'

'থাকছি।'

'আপনার কি মত, স্যার? কি করা উচিত এখন আমাদের?'

'আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করে রুখে দাঁড়ানো দরকার। একজন ক্রিমিনালের হুমকিতে দমে যাব আমরা এমন হতেই পারে না। পাকিস্তান দুর্বল কোন দেশ নয়। আমাদের প্রেসিডেন্টও কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন বলে আমি মনে করি না।'

ডাক্তার এসে ঢুকলেন ঘরে। রানাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে খুশি হলেন যার-পর-নাই। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই উঠে বসল রানা। তৈরি হয়ে নিল বাইরে বেরোবার জন্যে।

'কোথায় যেতে চাও এখন?'—জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল।

'ডক্টর সুফিয়ানের বাড়িটা সার্চ করতে হবে, স্যার। এখন আর রাখা ঢাকার কিছুই নেই। হাতে সময় নেই আমাদের।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি সাথে।'

'আমিও।'—বলল কর্নেল শেখ।

পাঁচ

তালা ভেঙে দরজাটা খুলতেই প্রচণ্ড গর্জন করে তেড়ে এল দুটো ব্লাড হাউন্ড। একসঙ্গে গুলি করল রানা এবং কর্নেল শেখ। দুটোই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আধ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা বাকি দুটো কুকুরের জন্যে। কিন্তু আর কোন কুকুর এল না। এই দুটোকেই বাড়ির ভিতর ছেড়ে দিয়ে তালা লাগিয়ে চলে গেছে কবীর চৌধুরী। কিংবা ভিতরে লুকিয়ে আছে কোথাও।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো সারাটা বাড়ি। বাকি দুটো কুকুরের লাশ পাওয়া গেল। গলায় ফাঁস পরিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওদের। কালো নাইলনের কর্ড দেখেই বুঝতে পারল রানা, এটা গিলটি মিঞার কাজ। পি. সি. আই. থেকে সাপ্লাই করা হয়েছিল এই কর্ড রানাকে, প্রয়োজনে পড়তে পারে মনে করে সঙ্গে এনেছিল গিলটি মিঞা। কোন কৌশলে কুকুর দুটোকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুকুরের লাশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না পুরো বাড়িটায়। জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিল তেমনি আছে। তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়বার কোন চিহ্নই নেই কোথাও। মনে হচ্ছে গৃহস্বামী বাইরে গেছে কোথাও, যে কোন মুহূর্তে এসে উপস্থিত হতে পারে।

ড্রইংরুমে টেলিফোনের সামনে একটা সোফায় বসে পড়লেন রাহাত খান। জরুরী টেলিফোন সারতে হবে কয়েকটা। রানা আর কর্নেল শেখ সারা বাড়িময় দেয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছে কোন গোপন কুঠুরি আছে কিনা। খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করে সত্যিকার অবস্থাটা জেনে নিচ্ছিল রানার কাছ থেকে কর্নেল শেখ।

'তুমি তাহলে এই কেস নিয়েই কাজ করছিলে, রানা?'

'হ্যাঁ। প্রায় ছ'মাস আগেই তখনকার সিকিউরিটি চীফ ইনাম আহমেদ কিছু একটা ব্যাপারে সন্দেহ করেছিল। এমনি সময় ডক্টর শরীফ ওকে জানালেন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, ভাইরাস চুরি যাচ্ছে এক নম্বর ল্যাব থেকে। বাইরে থেকে সবাই জানে অ্যানথ্র্যাক্স, পোলিও, এশিয়ান ফ্লু ইত্যাদি রোগের ওষুধ তৈরি করবার জন্যে রিসার্চ চলছে, কিন্তু আসলে প্লেগ, টাইফাস, স্মল পক্স, ইত্যাদির জীবাণুকে কয়েক লক্ষগুণ শক্তিশালী করে যুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। কেবল মানুষের জন্যেই নয়, জন্তু জানোয়ারের জন্যে হগ কলেরা, নিউকাসল ডিজিজ, ফাউল পেস্ট, রিন্ডার পেস্ট, গ্ল্যান্ডারস এবং অ্যানথ্র্যাক্স—আর উদ্ভিদের জন্যে জাপানিজ বিটল, ইউরোপিয়ান কর্ন বোরার, মেডিটারেনিয়ান ফ্রুট ফ্লাই, বল-উইভিল, সিট্রাস ক্যান্সার, হুইট রাস্ট ইত্যাদি রোগের জীবাণু কালচার করা হয় এখানে। কোন দেশকে প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবার জন্যে এই ত্রিমুখী আক্রমণ চালাবার ক্ষমতা অর্জন করেছে পাকিস্তান। কাজেই ভাইরাস চুরি যাওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আরও সতর্ক হয়ে গেল ইনাম। কিন্তু বেচারা ভুল করেছিল। একাই সবকিছু করতে গিয়েছিল সে, এমন কি কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটাও জানায়নি আমাদের; ফলে নিজে হয়ে পড়েছিল ইনসিকিওরড। সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক ভাইরাস চোরের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইনাম, তাই আকস্মিক মৃত্যু ঘটল তার। আমাকে নামানো হলো ময়দানে।'

'কবীর চৌধুরী অল্প অল্প করে ভাইরাস চুরি করছিল কেন, আর হঠাৎ খেপে গিয়ে সবগুলো ভাইরাসই বা চুরি করে বসল কেন?'

'প্রথমটার কারণ এখন বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় কেন-র সঠিক উত্তর দেবার সময় আসেনি এখনও। প্রথমত আমাদের সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছে। আমরা ভেবেছি বিদেশী কোন রাষ্ট্র চুরি করাচ্ছে এই ভাইরাস। ফলে আমাদের সমস্ত মনোযোগ চলে গেছে অন্যদিকে, নিশ্চিন্তে নিজের কাজ গুছিয়েছে সে। সবটা ব্যাপার অনেক আগে থেকেই পরিষ্কার ভেবে রেখেছিল কবীর চৌধুরী, তাই নানান রকম কৌশলে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হয়েছে ওর পক্ষে। যাক, তারপর কি হলো বলছি। যেই মুহূর্তে ইনামের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল—ওমনি বরখাস্ত করে দেয়া হলো আমাকে ব্যাক ডেট দিয়ে। কায়দা করে ঢুকিয়ে দেয়া হলো রিসার্চ সেন্টারে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি চীফ হিসেবে। এটাও ব্যাক ডেটে। ভাবটা দেখানো হলো, যেন আমাকে ইনামের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল আগেই, ছুটিতে ছিলাম, এখন ইনামের অবর্তমানে তার কাজের ভারটা আমার ওপরেই পড়েছে। কিছুদিন কাজ করার পরই আমার কাজে

সন্তুষ্ট হয়ে আমাকেই সিকিউরিটি চীফ হিসেবে স্থায়ী করে দিলেন ডক্টর শরীফ। এখন বুঝতে পারছি ওসব কৌশলের কোনও দরকারই ছিল না আসলে—আমাদের প্রতিটা কার্যকলাপ লক্ষ করেছে কবীর চৌধুরী, আর মুচকি হেসেছে।

'রিসার্চ সেন্টারে ঢুকে কিছুদিনের মধ্যেই একটা ফাঁদ পাতলাম আমি। একটা স্টীলের টিউবে বটুলিনাস টক্সিনের লেবেল লাগিয়ে রেখে দেয়া হলো এক নম্বর ল্যাবের একটা কালচার ট্যাঙ্কের কাছে—যেন ভুলে রয়ে গেছে ওটা ওখানে, তুলে রাখতে মনে নেই ডক্টর শরীফের। সেইদিনই চুরি গেল সেটা। মেইন গেটে আমরা একটা রিসিভারের ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কারণ টিউবটার ভিতর বটুলিনাসের বদলে একখানা ব্যাটারি পাওয়ারড মাইক্রো-ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার ছিল। স্টীল টিউবটা নিয়ে কেউ গেটের একশো গজের মধ্যে এলেই ধরা পড়ে যাবে নির্ঘাত।' —একটু কাষ্ঠ হাসি হাসল রানা। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম, চোর যে-ই হোক না কেন, স্টীল টিউবটার মধ্যে সত্যি সত্যিই বটুলিনাস টক্সিন আছে কি নেই তা খুলে পরীক্ষা করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। কর্নেল শেখ প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

'কেউ ধরা পড়ল না। বোঝা গেল কেউ একজন সন্ধ্যার পর বেড়াগুলোর কাছাকাছি গিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে ওটা বাইরের মাঠে। পরে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে এক সময়। আমরা আগে থেকেই জানতাম, মাঝে মাঝেই সার্চ করা হয় গেটে যে কোন লোককে—এরজন্যে কারণ ব্যাখ্যা করবার দরকার পড়ে না—সেজন্যে গেট দিয়ে জিনিসটা পার করার ঝুঁকি নেবে না লোকটা, অন্য কোন উপায়ে পার করবে। তাই নারায়ণগঞ্জ থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত সমস্ত রেল স্টেশন, স্টীমার এবং লঞ্চ ঘাট, তেজগাঁ এয়ারপোর্ট—সব জায়গায় রিসিভার ফিট করে অপেক্ষা করছিল আমাদের লোক পরদিন...'

'ঝাঁকিতে নষ্ট হয়ে যাবে না ট্র্যান্সমিটারটা?'

'না। এগুলো এসব কাজের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি। প্রয়োজন হলে এক ধরনের এয়ার পিস্তলের মধ্যে পুরে ফায়ার করলে পঞ্চাশ গজ দূরেও ফেলা যায় এগুলোকে। যাই হোক, পরদিন ঢাকা রেল স্টেশনে ধরা পড়ল লোকটা।'

'ধরা পড়ে গেল?'

'হ্যাঁ। পাগল একজন। ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বদ্ধ পাগল। বহু চেষ্টা করে জানা গেল একজন লোক দিয়েছে ওকে ওই ঘোড়ার ডিমটা। মাঝে মাঝেই অনেক জিনিস দেয় ওকে, পয়সাও দেয়। সীতাকুণ্ডের ঝর্ণার পানিতে স্নান করে তিনবার ওই ঘোড়ার ডিমটা মাথায় ছোঁয়ালে নাকি একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া বেরিয়ে আসবে ওর মধ্যে থেকে। যে মাথায় ছোঁয়ায় সে নাকি রাজা হয়। ও চলেছিল রাজা হবার জন্যে। হেমায়েতপুর মেন্টাল হসপিটাল থেকে স্পেশালিস্ট আনা হলো। অনেক রকম চেষ্টা চরিত্র করা হলো, কিন্তু কিছুই বের করা গেল না ব্যাটার কাছ থেকে কয়েকটা অসংলগ্ন কথা ছাড়া। ছেড়ে দিয়ে ওর পিছনে লোক লাগিয়ে দিয়ে দেখা গেল ধানমণ্ডী এলাকাতেই ঘোরাফেরা করে সে বেশি। লেকের ধারে একটা গাছের নিচে শুয়ে থাকে সে রাতে, দিনের বেলা একটা বিশেষ

এলাকায় পাগলামি-ছাগলামি করে বেড়ায়। এদিকে কিন্তু ভাইরাস চুরি বন্ধ হয়ে গেছে। পিছু ছাড়লাম না আমরা ওর। রিসার্চ সেন্টারের প্রত্যেকটা লোককে চিনি আমি। কাজেই সপ্তাহ তিনেক আগে ডক্টর শরীফের সঙ্গে নকল ঝগড়া করে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম আমি। আসলে এই তিন সপ্তাহ ধানমণ্ডীর একটা চারতলা বাড়ির ছাত থেকে বিনকিউলারের সাহায্যে নজর রাখছিলাম আমি পাগলটা এবং আশেপাশের সমস্ত বাড়ির লোকজনের ওপর। আর এদিকে রিসার্চ সেন্টার থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল কবীর চৌধুরী। বুঝিনি তখন।'

ফাঁকা আওয়াজ পাওয়া গেল ডাইনিং রুমের একটা দেয়ালে। পিলটি মিঞা আর ইয়াকুব আলী এসে পড়েছে। Q-4 ব্রাঞ্চের আট দশজন এক্সপার্টও পৌঁছে গেছে। দু'জন ইন্সপেক্টরও আছে সাথে। একজন স্যাল্যুট মেরে বলল ড্রইংরুমে ডাকছেন মেজর জেনারেল ওদের।

'পাওয়া গেল কিছু?'—জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ। কাঁচা পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তাঁর।

'দেয়াল ভাঙা হচ্ছে এখন। একটা ফাঁপা জায়গা বেরিয়েছে।'—বলল কর্নেল শেখ। কিন্তু কোন উৎসাহ লক্ষ করা গেল না বৃদ্ধের হাবভাবে।

'আরেকটা মেসেজ এসেছে ওই লোকটার কাছ থেকে।'—বললেন মেজর জেনারেল গম্ভীর কণ্ঠে। 'সেই একই কথা—এখনও দাঁড়িয়ে আছে রিসার্চ সেন্টারের দেয়াল, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে সময়-সূচি পরিবর্তন করতে হচ্ছে। যদি আজ রাত ন'টার মধ্যে ভাঙার কাজ শুরু না করা হয় তাহলে কাল ভোর চারটের সময় মতিঝিল এবং জিন্না এভিনিউ এলাকায় বটুলিনাস টক্সিনের একটা বোতল ফাটানো হবে।'

একটা থ্রিকাসল্‌স্‌ সিগারেট ধরালেন মেজর জেনারেল। খবরটা শুনে চুপ করে গেছে কর্নেল শেখ। মনে মনে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এর ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে। বিড় বিড় করে, যেন অনেকটা আপন মনে কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ। 'প্রত্যেকটা পত্রিকা টেলিগ্রাম বের করেছে। এছাড়া সান্ধ্য পত্রিকা তো আছেই। সব খবর বেরিয়েছে পত্রিকায়। সবারই এক কথা, এই উন্মাদকে আরও খেপিয়ে না তুলে এ যা চায় তাই করা দরকার। আজ সাড়ে তিনটের সময় পতেঙ্গায় একটা বোতল ফাটানোর খবরও বেরিয়েছে কয়েকটা কাগজে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে সম্পাদকরা নিজেরাই—ফলে যে খবর প্রচারিত হচ্ছে তাতে দেশবাসীকে আতঙ্কিত করে তোলা ছাড়া আর কোন লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না আমার। আতঙ্ক জিনিসটা আশ্চর্য গতিতে ছড়ায়। কবীর চৌধুরী লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান হতে পারে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, প্রতিভাবান শয়তান সে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবার যোগাড় করেছে লোকটা। যা হুমকি দিচ্ছে সেইমত কাজও করে দেখাচ্ছে সে। তাছাড়া সময় দিচ্ছে না—চিন্তা ভাবনার সময় নেই, যা বলছে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। এরই জন্যে ভীতিটা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এত অল্প সময়ে। সবাই ভাবছে, এই

উন্মাদ হয়তো কালকূট আর বটুলিনাস টক্সিনের পার্থক্য জানে না. আগামী বার ভুল করে কালকূট ফাটাবে কিনা কে জানে? কেবল আমাদের দেশেই নয়, খবর ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র থেকে মুহুর্মুহু মেসেজ আসছে। সবারই এক অনুরোধ, পাগলকে ঠাণ্ডা করো, যা চায় তাই করো—নইলে অস্তিত্বই লোপ পাবে পৃথিবীর। সমস্ত পৃথিবী এখন কাঁপছে আতঙ্কে। কি প্রচণ্ড চাপ আসছে পাকিস্তানের ওপর তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'যারা এতদিন চিৎকার করেছে নিউক্লিয়ার হলোকাস্টের ভয়ে ঘুম আসে না রাতে, নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া শান্তি আসবে না কিছুতেই, তাঁরা বোধহয় এখন দিনেও ঘুমাতে পারছে না, স্যার। যাক, আমার মনে হয় না কোন রকম চাপ দিয়ে আমাদের প্রেসিডেন্টকে নোয়ানো যাবে।'

'ঠিকই বলেছ। আমি কন্ট্যাক্ট করেছিলাম একটু আগে। কুছ পরোয়া না করে কাজ চালিয়ে যেতে বললেন আমাকে। উনি বললেন, দরকার হলে আমরা সমস্ত মানুষ সরিয়ে ফেলব ঢাকা থেকে, তবু মাথা নিচু করব না একটা ক্রিমিনালের হুমকির কাছে। মীটিং বসে গেছে, যেতে হবে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ঢাকা থেকে সবাইকে সরিয়ে ফেলা তো মুখের কথা নয়, স্যার।'—বলল কর্নেল শেখ। 'চাট্টিখানি কথা নাকি? ছয় লক্ষ…'

'অত ভয়ঙ্কর কোন ব্যাপারও নয়। গতকালকের মত বাতাস নেই আজ, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে মুষল ধারে। আবহাওয়া অফিস বলছে আরও দু'দিন চলবে এরকম। আর ডক্টর হাশমত বলছেন এরকম বৃষ্টির দিনে দুই তিনশো গজের বেশি ছড়াতে পারবে না বটুলিনাস টক্সিন। বৃষ্টির সাথে সাথে নেমে আসবে ভাইরাস নিচে। বাতাসের চাইতে পানির প্রতিই এর আকর্ষণ বেশি। আর পানির সঙ্গে মিশে গেলে ছড়াতে পারছে না বেশি, ক্ষতিও হচ্ছে তুলনামূলক ভাবে কম। যদি দরকার হয় তাহলে মতিঝিল আর জিন্না এভিনিউ থেকে লোক সরিয়ে নেয়া খুব একটা মুশকিলের কাজ হবে না।'

'তা ঠিক, স্যার।'—স্বীকার করল কর্নেল শেখ। 'ওসব জায়গা রাতের বেলা এমনিতেই খালি থাকে। বেশির ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের অফিস আর দোকান পাট। লোকজন সরানো খুব মুশকিল হবে না। কিন্তু পানি? বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গিয়ে পড়বে নদী নালায়—নদীর পানি ব্যারোফটার জন্যে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হবে সবাইকে?'

'খুব সম্ভব তাই করা হবে। কী আশ্চর্য অবস্থার মধ্যে পড়া গেছে! রানা, কি করা যায় এখন?'

রানার কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু উত্তর দেয়ার আগেই ডাক পড়ল বাড়ির ভিতর থেকে। দেয়াল ভেঙে একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে লাশ পাওয়া গেছে মানুষের। দ্রুতপায়ে এগোল সবাই ডাইনিং রুমের দিকে।

'ডক্টর আবু সুফিয়ানের লাশ।'—বলল রানা মৃদু কণ্ঠে।

'কি করে বুঝলে?'—প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ। 'হাড় ক'খানা পড়ে আছে কেবল। এ থেকে মানুষ চেনা যায় নাকি?'

'যায়। ওই দেখো কন্ট্যাক্ট লেন্স।'—বললেন রাহাত খান।

মাটিতে পড়ে আছে একটা লেন্স, আরেকটা রয়েছে শূন্য চোখের কোটরে।

'একটা চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল ডক্টর সুফিয়ানের। আর খেয়াল করেছ, পাঁজরের চারটে হাড় ভাঙা।'—কথাটা বলেই হাতুড়িটার ওপর চোখ পড়ল বৃদ্ধের। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি মড়ার খুলিটা। 'হাতুড়ির আঘাতে মাথার পিছনে ফেটে গেছে খুলিটা!'

'পিশাচ!'—দাঁতে দাঁত চেপে বলল কর্নেল শেখ।

এই পিশাচই আজ নির্যাতন করেছিল ওকে, একথা ভেবে শিউরে উঠল রানা নিজের অজান্তেই।

টেলিফোন বেজে উঠল ড্রইংরুমে। একজন ইন্সপেক্টর ছুটল ওদিকে। আধ মিনিট পর ফিরে এসে বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানার ফোন। নাম বলছে না কিছুতেই, যা বলার আপনার কাছেই বলবে।'

রওনা হলো রানা। ইন্সপেক্টরের দিকে অনর্থক একবার কটমট করে চেয়ে রানার পিছু পিছু এগোলেন মেজর জেনারেল।

'রানা বলছি।'—রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল রানা।

অপর দিক থেকে ভেসে এল কবীর চৌধুরীর ভারী কণ্ঠস্বর। 'বন্ধ করো, রানা। অনীতাকে যদি জীবিত দেখতে চাও, তাহলে এই মুহূর্তে তোমাদের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করো।'

গরম শিক দিয়ে যেন কেউ ছ্যাঁকা দিয়েছে রানার মনে। সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল রানা। প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরেছে সে রিসিভারটা নিজের অজান্তেই। গলার স্বরটা বহু কষ্টে শান্ত রাখল সে। বলল, 'কি বলছেন আপনি, বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে তুমি ঠিকই পারছ, মাসুদ রানা। আমি তোমার প্রিয়তমা অনীতা গিলবার্টের কথা বলছি। আমার হাতে বন্দী সে এখন। বিশ্বাস না হয়, আলাপ করে দেখতে পারো।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপরই স্পষ্ট ভেসে এল অনীতার কণ্ঠস্বর। 'রানা! ভুল হয়ে গেছে আমার, রানা মাফ করে দাও। আমার জন্যে ভেবো না, যা হয় হোক···'—কণ্ঠস্বরটা থেমে গেল হঠাৎ। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ শোনা গেল। নীরবতা। আবার ভেসে এল কবীর চৌধুরীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'কাজেই আমার পিছু ছাড়ো, রানা বন্ধ করো তোমাদের সমস্ত তৎপরতা। এই মুহূর্ত থেকে।'

ক্লিক করে কেটে গেল কানেকশন। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা নিষ্প্রাণ রিসিভারটার দিকে। ভয়ঙ্কর কঠোর হয়ে উঠল ওর মুখটা ধীরে ধীরে।

ছয়

Q-4 ব্যাঞ্চের ভ্যানটা ডক্টর সাদেকের বাড়ির সামনে থেমে দাঁড়াবার আগেই লাফিয়ে নামল রানা রাস্তার ওপর বৃষ্টির মধ্যেই। পিছনের সীটে বসে আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান ঋজু ভঙ্গিতে, পাশে বাঁকা হয়ে বসে আছে কর্নেল শেখ। ড্রাইভারের পাশে বসেছে মাইক্রোফোন হাতে একজন অয়্যারলেস অপারেটার। চারদিকে খবর পাঠানো হচ্ছে ডক্টর সুফিয়ান এবং তার ফিয়াট ইলেভেন হানড্রেড গাড়িটার ওপর নজর রাখবার জন্যে। যদি কারও নজরে পড়ে তাহলে অনুসরণ করবে, সংবাদ দেবে তৎক্ষণাৎ, কিন্তু বাধা যেন না দেয়া হয়। ভ্যানের পিছু পিছু জীপে করে আসছে দারোগা, ইন্সপেক্টর রায়হান, আর গিলটি মিঞা।

কড়া নাড়বার আগেই দরজা খুলে দিল ডক্টর সাদেকের ছোট বোন হাসিনা হাসি মুখে।

'আসুন। একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি। আজ সকালে কি বিচ্ছিরি ব্যবহার করেছি আমরা আপনার সঙ্গে। ছিঃ, লজ্জাই করছে এখন আমার। মাকে আপনি যে সব কথা বলে গেছেন, সেগুলো কি সত্যি? ভাইয়াকে নিয়ে যাওয়ার পর বলেছেন মা আমাদের...'

'সত্যি।'—মৃদু হাসবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হাসি হলো না, মুখ বিকৃত হলো মাত্র। নকল গোঁফ জোড়া তাড়াহুড়োতে টেনে খোলায় জ্বলছে এখনও ঠোঁট। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্বমূর্তি ধারণ করেছে রানা কবীর চৌধুরীর টেলিফোনের পর পরই। 'আপনার মা যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। ডক্টর সাদেকের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আমি দুঃখিত। আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে ওটা দরকার হয়ে পড়েছিল। আজ রাতেই ছেড়ে দেয়া হবে ওঁকে। অনীতা এসেছিল?'

'হ্যাঁ। এই তো কিছুক্ষণ আগে গেলেন। আসুন না ভিতরে, মার সঙ্গে দেখা...'

'ঠিক কয়টার সময় গেছে অনীতা?'—মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই পৌনে ছ'টার দিকে। অন্ধকার হয়ে আসছিল...কেন?'—হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল হাসিনার চোখ। 'কিছু ঘটেছে নাকি? কি ব্যাপার!'

'খুনীর হাতে ধরা পড়েছে সে। ওকে জবরদস্তি ধরে রেখে ভয় দেখাচ্ছে, আমরা ওর পিছু না ছাড়লে খুন করবে

'হায় হায়! এখন...এখন উপায়?'

'কিসে করে গেল ও এখান থেকে?'

'খুনীর হাতে ধরা পড়েছে! মাগো! কি বলছেন আপনি...'

'আমার কথার জবাব দিন। জলদি। কিসে করে গেছে? রিকশা? বাস? কিসে?'

'গাড়ি, গাড়ি করে।'—আবছা কণ্ঠে বলল হাসিনা। 'লোকটা বলল, আপনি

গাড়ি পাঠিয়েছেন—খুব জরুরী দরকার…'

'কি গাড়ি ছিল সেটা? লোকটা দেখতে কেমন?'

'লম্বা লোকটা। সাদা একটা গাড়ি। ব্যাকসীটে আরেকজন লোক বসে ছিল, নীতা ভাবীকে এগোতে দেখে সামনে গিয়ে বসল। লোকটার পিঠে কুঁজ আছে, শরীরের উপর দিকটা সামনে বাঁকানো। গাড়িটা খুব সম্ভব ফিয়াট গাড়ি।'

'কোন্ দিকে গেছে?'

'ঢাকার দিকে।'

আর একটি কথাও না বলে, কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই ছুটল রানা ভ্যানের দিকে। ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, 'সোজা চালাও ঢাকার দিকে।'

'সোজা ময়মনসিংহ।'—বলল কর্নেল শেখ রানা উঠে বসতেই। রানার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলল, 'এইমাত্র খবর পাওয়া গেল জয়দেবপুরের একটা পেট্রল পাম্পের কাছাকাছি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সাদা একখানা ফিয়াট ইলেভেন হান্ড্রেড। চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে সাজানো ব্যাপার হতে পারে, যাতে নিরাপদে ঢাকা পৌঁছতে পারে কবীর চৌধুরী—তবু দেখতে হবে আমাদের, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে ড্রাইভার। রানা বলল, 'তার মানে ওখান থেকে অন্য কোন গাড়ি যোগাড় করে নিয়েছে সে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কমাবার জন্যে? সম্ভব। দেখা যাক, দেরি হলে বড় জোর বিশ মিনিট দেরি হবে।'

সোজা এসে জয়দেবপুর পেট্রল পাম্পে থামল ভ্যান। পিছু পিছু জীপটাও। দেখা গেল ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার ওপর উদ্বাহু নৃত্য করছে পাতলুন পরা এক পাতলা ছিপছিপে জেন্টলম্যান। রাগে লাল হয়ে গেছে তার মুখ। জানা গেল ময়মনসিংহ থেকে আসছিল সে, ট্যাঙ্কে পেট্রল কম থাকায় পেট্রল পাম্পে তেল ভরবার নির্দেশ দিয়ে ওপাশের বাথরুমে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে গাড়ি নেই। বোঝা গেল, সঙ্গীটাকে নামিয়ে দিয়ে কোয়ার্টার মাইল এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিল কবীর চৌধুরী, চুরি করা গাড়িটা নিয়ে আসতেই গাড়ি বদল করে রওনা হয়ে গেছে।

'কি ব্যাপার?'—জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ।

'দিন দুপুরে ডাকাতি! ব্যাপার আবার কি? নতুন গাড়িটা আমার…আশ্চর্য! নিয়ে চলে গেল…'

'কি গাড়ি?'

'কন্‌সাল্। এখানকার না—ফরেন অ্যাসেম্বল্ড্। নিউ ইয়র্ক থেকে কিনেছিলাম, সাতদিনও বয়স হয়নি। আশ্চর্য! দিন দুপুরে…'

'কতক্ষণ আগে?'

'কি কতক্ষণ আগে? সর্বনাশ হয়ে গেল আমার আর আপনি বলছেন…'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। ঠিক কখন চুরি গেছে?'—গর্জে উঠল কর্নেল।

'কখন আবার? এই তো দশ-পনেরো মিনিটও হয়নি। পায়খানা করতে মানুষের কতক্ষণ লাগে? নেহায়েত পেটটা খারাপ ছিল বলেই না…'

'কি রঙ ছিল গাড়ির? কোন ডিফেক্ট ছিল গাড়িতে?'

'কি আবোল তাবোল প্রশ্ন করছেন সায়েব!'—কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল লোকটা। 'কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ। ডিফেক্ট মানে? একেবারে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি। পিকক ব্লু…মাত্র এক সপ্তাহ…'

কর্নেল শেখের ইঙ্গিতে ভ্যান ছেড়ে দিল ড্রাইভার। অয়্যারলেস অপারেটার গাড়িটার চেহারা বর্ণনা আরম্ভ করল মাইক্রোফোনে। ফিয়াটটা দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার বাঁ পাশে, কিন্তু থামল না ওরা। ফুলস্পীড দিয়েছে ড্রাইভার। ইঞ্জিনের গর্জন, চাকার কর্কশ শব্দ, আর মুষলধারে বৃষ্টি। একটা সিগারেট ধরালেন মেজর জেনারেল।

'কবীর চৌধুরী প্লাস্টিক-সার্জারি ইত্যাদি নানা উপায়ে ডক্টর আবু সুফিয়ানের মত চেহারা ধারণ করল বুঝলাম,'—কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে কথা বলে উঠল কর্নেল শেখ, 'বুঝলাম, চোখে কন্ট্যাক্ট লেন্সও নাহয় লাগিয়ে নিল বিদেশে গিয়ে—কিন্তু ডক্টর শরীফ পর্যন্ত ধরতে পারলেন না, এটা কি রকম কথা? ডক্টর সুফিয়ান ছিল ডক্টর শরীফের অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং মাইক্রোবায়োলজিস্টের কাজ অত্যন্ত টেকনিকাল কাজ। একদিন দু'দিন নয়, ছয় ছয়টা মাস অভিনয় করল কবীর চৌধুরী ডক্টর সুফিয়ানের ভূমিকায়, অথচ ধরা পড়ল না ডক্টর শরীফের কাছে এটা কেমন করে হয়?'

'তোমার আমার বা রানার পক্ষে অসম্ভব ঠিকই, কিন্তু একটা কথা ভুলে যেয়ো না যে কবীর চৌধুরী একজন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে হচ্ছে অত্যন্ত উজ্জ্বল এক প্রতিভা। এ প্যারেন্ট জিনিয়াস। রাঙামাটির পাহাড়ের নিচে* সে রিসার্চ করছিল আল্ট্রা সোনিকস্, লেভিটেশন, অ্যান্টি বডি, ইত্যাদি নিয়ে। এগুলো ফিজিক্সের ব্যাপার। আবার কোলায়ের লেকের ওক্কার দ্বীপে** সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে গবেষণা চালিয়েছিল সে একজন পাগলের ব্রেনের ওপর ডক্টর আবদুল্লাহ্ কৈয়াজের সাহায্যে। এবার আবার পরিবর্তন করেছে সে তার গবেষণার বিষয়, এতে আশ্চর্যের কি আছে? ওর মত একজন দুর্দান্ত প্রতিভার পক্ষে যে কোন বিষয়ে ছয়মাস পড়াশুনা ও পরিশ্রমই যথেষ্ট। হত্যা করবার আগে ডক্টর আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে অনেক কথা আদায় করে নেয়া হয়েছিল, এটা তার কঙ্কাল দেখলেও বুঝে নেয়া যায়। কবীর চৌধুরীর পক্ষে ডক্টর সুফিয়ানের ছদ্মবেশে সবার চোখে ধুলো দেয়া বেশ সহজ ব্যাপার ছিল।'—চিন্তান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন মেজর জেনারেল। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মেসেজ এল স্পীকারে।

পিকক ব্লু কনসালের আমেরিকা ফেরতা মালিক নাকি জয়দেবপুর থানায় জানিয়েছে পেট্রল ভরবার আগেই চুরি গিয়েছে গাড়িটা। ফুয়েল ট্যাঙ্ক প্রায় খালি ছিল—তিরিশ মাইলের বেশি যাবে না। অর্থাৎ, টাঙ্গাইল পৌছবার আগেই কোথাও

---

* ধ্বংস-পাহাড় দ্রষ্টব্য।

** রানা! সাবধান!! দ্রষ্টব্য।

না কোথাও তেল নিতে হবে গাড়ি থামিয়ে।

মির্জাপুর পেট্রল পাম্পে জিজ্ঞেস করে জানা গেল গত পনেরো মিনিটে তেল নেয়নি কেউ। করটিয়াতেও একই অবস্থা। অতএব টাঙ্গাইল।

আবার প্রশ্ন তুলল কর্নেল শেখ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে। 'বোঝা যাচ্ছে, নানান ভাবে আমাদের চোখে ধুলো দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল কবীর চৌধুরী। কেন?'

উত্তর দিল রানা। 'সহজ কারণ। সময় দরকার তার। আগে থেকেই জানা ছিল তার যে যেই মুহূর্তে রিসার্চ সেন্টার থেকে ভাইরাস চুরি যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে খেপা কুকুর হয়ে যাব আমরা। কিন্তু সারা দেশে প্যানিক সৃষ্টি করতে হলে অন্তত দুটো দিন সময় দরকার। এই দুটো দিন যেন আমরা ডক্টর হারুন আর ডক্টর সাদেকের পিছনেই খরচ করি সেজন্যে হাতুড়ি আর প্লায়ার্স রেখে আসার ব্যবস্থা করেছিল সে ডক্টর হারুনের গ্যারেজে, আর গহর মামা সেজে টাকা জমা দিয়েছিল ডক্টর সাদেকের অ্যাকাউন্টে, মরিস মাইনর গাড়িটাও ফেলে রাখা হয়েছিল ডক্টর সাদেকের বাড়ির সামনে। আমাকে বন্দী করার পিছনেও একই যুক্তি—সময় হাতে পাওয়া, যাতে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে পুলিস ফোর্স।'

'প্যানিক সৃষ্টি করতে পারলে কবীর চৌধুরীর কি লাভ?'

'এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন।'—বলল রানা। 'কি বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে পারে সে, যদি জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড একটা ভীতি ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা সম্ভব হয় তার পক্ষে? সেটাই...' —রানার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল ড্রাইভার।

'একটা পেট্রল পাম্প দেখা যাচ্ছে সামনে, স্যার।'

'থামাও।'—হুকুম দিল কর্নেল শেখ। 'খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

ভ্যান এবং ভ্যানের দেখাদেখি পিছনের জীপ থেকে হর্ন দেয়া হলো, কিন্তু কেউ এল না এগিয়ে। তড়াক করে লাফিয়ে নামল রানা। রানার পিছন পিছন কর্নেল শেখ। পিছনের জীপ থেকে ততক্ষণে নেমে পড়েছে করিৎকর্মা দারোগা ইয়াকুব আলী। কাঁচ দিয়ে ঘেরা অফিস ঘরটায় কেউ নেই। ঘরটার পিছনে পাওয়া গেল হাত-পা মুখ বাঁধা অবস্থায় মোটাসোটা একজন লোককে। রাগে দুঃখে অপমানে লাল হয়ে গেছে লোকটার ফর্সা মুখ। মুখের বাঁধন একটু আলগা হতেই দুর্বোধ্য সিলেটি ভাষায় অনর্গল অকথ্য গালিগালাজ করল সে পুরো এক মিনিট কারও কোন তোয়াক্কা না রেখে। আরবী, ফার্সী, না বাংলা ভাষা, বোঝার উপায় রইল না কারও। শুধু একটা ব্যাপার বোঝা গেল যে গালিগুলো বেশির ভাগই নারী-পুরুষের সঙ্গম সংক্রান্ত। এই গালি কানে গেলে যে কোন মরা মানুষ উঠে বসবে।

'হয়েছে।'—খানিকক্ষণ শ্রদ্ধা মিশ্রিত অবাক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে হাঁক ছাড়ল কর্নেল শেখ। 'যথেষ্ট হয়েছে। যে লোক তোমার এই অবস্থা করেছে সে একজন খুনী। পালাচ্ছে সে। আমরা পুলিসের লোক, ধাওয়া করছি ওকে। গালাগালি করে সময় নষ্ট করলে আর ধরা যাবে না ওকে। কি ঘটেছিল বলে

ফেলো। জল্দি।'

লোকটার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে: কুঁজো একটা লোক এসে হাজির হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টিতে ভিজে। মাইলখানেক দূরে নাকি পেট্রল ফুরিয়ে গিয়েছে ওদের গাড়ির, টিনে করে এক গ্যালন তেল দিতে পারলে ভাল হয়। টিনের জন্যে যেই সে পিছন ফিরেছে, ওমনি শালা…ইত্যাদি, ইত্যাদি…লোকটা তার মাথার পিছনে কি যেন একটা শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাত করেছে। জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখতে পেয়েছে সে একটা নীল গাড়িতে পেট্রল ভরছে সেই কুঁজো লোকটা। গাড়ির ড্রাইভিং সীটে শুকনো একটা লোক বসা ছিল, পিছনের সীটে একটা মেয়েলোক।

'কতক্ষণ আগে?'

'পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়ে গেছে ওরা।'

'কোন্‌দিকে?'

হাত তুলে দেখাল লোকটা, ময়মনসিংহের দিকে। ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠল ওরা আবার। ছুটল গাড়ি। কর্নেল শেখ বলল, 'খোদা! খুব সম্ভব ধরা যাবে এবার। ময়মনসিংহ থেকে একটা জীপ রওনা হয়ে গেছে। জামালপুর থেকে দুটো। মধুপুরে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে সেন্ট্রিদের। কাজেই ধরা ওকে পড়তেই হবে।'

'এবং এই কথাটা জানা আছে তারও।'—বলল রানা। 'ভয়টা সেখানেই। হয়তো অন্য কোন প্ল্যান আছে ওর।'

'নাও থাকতে পারে। ও হয়তো ভাবছে, আমরা এখনও টেরই পাইনি ও কোনদিকে চলেছে। হয়তো ভাবছে, ওর হুম্‌কিতে সরে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা, আর ভয় নেই কোন।'

'দেখা যাক।'—আশাবাদী কর্নেল শেখকে নিরুৎসাহ করতে ইচ্ছে করল না রানার। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, রিসার্চ সেন্টার ধ্বংস করার কোন রকম বাসনা নিয়ে এ কাজে নামেনি কবীর চৌধুরী। পাগলামির ছিটে ফোঁটাও নেই ওর মধ্যে। ভয়ঙ্কর কোন প্ল্যান আছে ওর। সেটা কি, জানা নেই রানার—কিন্তু সেটা যে বিরাট কোন ব্যাপার, রিসার্চ সেন্টারটা মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয়ার সঙ্গে যে তার কোন সম্পর্কই নেই, এটুকু বুঝতে পেরে কিছুতেই আশাবাদী হতে পারছে না সে। দেশের কি সর্বনাশ হতে চলেছে কে জানে! সীটে হেলান দিয়ে বসল রানা। দুর্বল লাগছে শরীরটা। গত বত্রিশ ঘণ্টার প্রতিটা সেকেন্ড অস্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থায় কাটিয়ে আর যেন বইতে পারছে না দেহটা ওকে। নানান কথায় ভুলে থাকবার চেষ্টা করলেও বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে বন্দিনী অনীতার চেহারাটা। নিষ্ঠুর দু'জন বেপরোয়া লোকের ইচ্ছার পুতুল এখন অনীতা। বারবারই একটা বিচ্ছিরি আশঙ্কা অশুভ ছায়া ফেলছে রানার মনে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা চেপে ধরতে চাইছে রানাকে চারপাশ থেকে।

ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে ষাট মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে ভ্যান। মুষলধারে ঝরছে বৃষ্টি। চুপচাপ নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে রইল রানা ক্লান্ত ভঙ্গিতে। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছেন মেজর জেনারেল। হয়তো ভাবছেন

এদিকের ভার রানার ওপরই ছেড়ে দিয়ে মীটিং-এ যাওয়া উচিত ছিল তাঁর, এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করবার বয়স ও সামর্থ্য তাঁর আর নেই। বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি।

মধুপুরের কাছাকাছি পৌঁছে মেসেজ এল। ময়মনসিংহ থেকে যে জীপটা আসছিল তার কাছ থেকে মেসেজ। ডানদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে গেল একটা গাড়ি ওদের গাড়ির হেড লাইট দেখে। রঙ চেনা যায়নি দূর থেকে।

'ওদের ডানদিক মানে আমাদের বামদিক!'—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অয়্যারলেস অপারেটার। 'বামদিকে একটাই রাস্তা আছে, স্যার—ওটা শিবগঞ্জের বাজার ঘুরে এসে আবার বড় রাস্তাতেই উঠেছে। অন্য কোনদিকে কোন পথ নেই। দু'মাইল পরেই ওটাকে আবার উঠে আসতে হবে বড় রাস্তায়।'

'রাস্তাটা কেমন? কতক্ষণ লাগবে ওর?'—জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ।

'আঁকাবাঁকা রাস্তা, স্যার। অন্তত ছয় মিনিট তো লাগবেই। রাস্তা ভাল না।'

'ও যেখানটায় বড় রাস্তায় উঠবে সেখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের? সময় মত পৌঁছানো যাবে?'

ড্রাইভার মনে করল তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। উত্তর দিল, 'এদিকের রাস্তাঘাট ভালমত চিনি না আমি, স্যার।'

'আমি চিনি।'—বলল অয়্যারলেস অপারেটার। 'আমার বাড়ি মধুপুরের কাছাকাছিই। ধনবাড়ি। পৌঁছানো যাবে, স্যার।'

ময়মনসিংহের জীপকে গাড়িটার পিছু পিছু ধাওয়া করতে নির্দেশ দেয়া হলো। রানারা ছুটে চলল সামনে। ছয় মিনিটে ছয় মাইল কাভার করতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলাপ করে প্রস্তুত হয়ে নিল সবাই। মোড়ে পৌঁছে দেখা গেল এসে পৌঁছায়নি এখনও কনসাল। এত বৃষ্টিতে চাকার দাগ দেখতে পাওয়ার কথা নয়, তবু পরীক্ষা করা হলো। কাদার দাগ অন্তত পাওয়া যাবে। কোন রকম দাগই নেই পিচের রাস্তার ওপর। আসেনি এখনও ওরা। আসবে এখুনি।

সাত

ছোট রাস্তাটার ওপর আড়াআড়ি করে রাখা হলো ভ্যানটা। বড় রাস্তায় উঠবার পথ বন্ধ। সবাই নেমে পড়ল ঝটপট। রাহাত খানকে গাড়ির ভিতরেই থাকতে বলল ওরা, কিন্তু সেকথায় কান না দিয়ে নেমে এলেন উনিও। ভ্যানের ছাতে ফিট করা স্পট লাইটের মুখটা ঘুরিয়ে দিল একজন গলিটার দিকে, ঠিক যেদিক থেকে কবীর চৌধুরীর চুরি করা কনসালটা আসবে সেইদিকে। ভ্যানের পিছনে যে যার পজিশন নিল ভ্যান থেকে পাঁচ ফুট তফাতে। দারোগা ইয়াকুব আলী, ইন্সপেক্টর রায়হান আর গিলটি মিঞা জীপ থেকে নেমে এল। সবাই প্রস্তুত। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি।

স্পট লাইটটা একবার জ্বেলে পরীক্ষা করা হলো। ডাইনে বাঁয়ে পালাবার

রাস্তা নেই। একদিকে জঙ্গল, আরেক দিকে বারো ফুট নিচু ধানী জমি। একটা দীঘির পাড়ে আবছা ভাবে একটা পোড়ো বাড়ি দেখা যাচ্ছে, প্রায় দুশো গজ দূরে। ভূতুড়ে বাড়ি মনে হচ্ছে এখান থেকে। আশ পাশে কোথাও কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। নিভিয়ে দেয়া হলো স্পট লাইট। কেবল বৃষ্টির শব্দ।

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে এল একটা ইঞ্জিনের শব্দ। ক্রমেই বাড়ছে শব্দটা। পাঁচ সেকেন্ড পর একটা মোড় ঘুরতেই হেড লাইটের আলো দেখা গেল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই আলোয়। আর একটা মোড় ঘুরলেই দেখতে পাওয়া যাবে গাড়িটাকে। ভাঙা চোরা রাস্তার উপর দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা সেকেন্ড গিয়ারে। এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল রানা। পি. সি. আই. থেকে সাপ্লাই দেয়া ল্যুগারটা বের করল, সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল।

ব্রেকের শব্দ এল কানে, ইঞ্জিনের শব্দটা বাড়ল আরেকটু, শেষ মোড়টা ঘুরল কনসাল গাড়ি। এবার সোজা এগিয়ে আসছে সেটা বড় রাস্তার দিকে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি! থামছে না কেন? পঞ্চাশ গজ, চল্লিশ গজ, তিরিশ, বিশ, পনেরো...এইবার দেখতে পেয়েছে ওরা ভ্যানটাকে। উইন্ড স্ক্রীন ওয়াইপার হয়তো ঠিকমত কাজ করছিল না, কিংবা প্রবল বৃষ্টিতে ঘেমে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল কাঁচ—পনেরো গজ দূরে এসে তারপর ব্রেক কষল কনসালের ড্রাইভার। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ তুলে ভেজা রাস্তার ওপর পিছলে খাদের দিকে চলেছিল গাড়িটা, কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্তন করে জঙ্গলের দিকে গেল। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় খায়, এমন সময় আবার মাঝ রাস্তায় চলে এল গাড়ি। ভ্যান থেকে ঠিক পাঁচ ফুট তফাতে এসে আচমকা থেমে গেল সেটা। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল রানা কয়েক পা। হেড লাইটের চোখ ধাঁধানো আলোয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

ভ্যানের মাড গার্ডের আড়াল থেকে পরপর দুটো গুলি করল রানা কনসালের হেড লাইট সই করে। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা, এবং তারপরই জ্বলে উঠল ভ্যানের ছাতের শক্তিশালী স্পট লাইট। ময়মনসিংহ থেকে আগত জীপটা এসে থামল কনসালের পিছন দিকে নাক লাগিয়ে। মাড গার্ডের সামনে দিয়ে ঘুরে এগোচ্ছিল রানা, পিছু পিছু আর সবাই—এমন সময় ঝটাং করে কনসালের ডানদিকের দুটো দরজা খুলে গেল। দ্রুত রাস্তার ওপর নেমে এল দু'জন। একটি মাত্র মুহূর্ত, স্পষ্ট অনুভব করল রানা। জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যেতে পারত একটি মাত্র মুহূর্তেই; দু'জনকেই গুলি করে ভূপাতিত করতে পারত সে অক্লেশে—কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারল না রানা, আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়ে কাউকে মেরে ফেলা কি উচিত, ইত্যাদি নানান প্রশ্ন এক সঙ্গে এসে ভিড় করল ওর মধ্যে—পার হয়ে গেল মুহূর্তটি। হ্যাঁচকা টানে গাড়ির মধ্যে থেকে বের করে আনল কবীর চৌধুরী অনীতাকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল অনীতা। পরমুহূর্তে বাম হাতে অনীতাকে নিজের দেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ওর ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পিস্তল ধরল কবীর চৌধুরী রানার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় লোকটি লম্বায় রানার সমানই হবে, কিন্তু চওড়ায় রানার তিনগুণ। ইস্পাত-কঠিন দেহের প্রতিটি পেশী, পিঠে প্রকাণ্ড একটা কুঁজ। বাম হাতে ধরা পিস্তলটা তার স্থির হয়ে রয়েছে রানার ডান

চোখের দিকে চেয়ে। গিলটি মিঞার বাঁইয়া সেই লোক। সেই মোটর সাইকেল আরোহী। এবং খুব সম্ভব ডক্টর সুফিয়ান আর ইনামের হত্যাকারী। হত্যাকারী তাতে সন্দেহ নেই। জীবনে বহু খুনী দেখেছে রানা, এখন আর ভুল হয় না চিনতে। স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, আপাতদৃষ্টিতে আর পাঁচটা লোকের মত সাধারণ মনে হলেও এদের চোখের দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটা ফাঁকা ভাব থাকে। অনেকটা উন্মাদের দৃষ্টির মত। কিছু একটা আছে এদের মধ্যে তা নয়, কি যেন নেই। এই লোক অবলীলাক্রমে দ্বিধাহীন চিত্তে খুন করতে পারে। সন্দেহ নেই রানার, এরই হাতে নির্যাতিত হয়েছিল সে বন্দী হবার পর। ফিরে এল রানার দৃষ্টি অনীতার ওপর। জামা কাপড় ছেঁড়া, চুল এলোমেলো, গালে কামড়ের দাগ, ফর্সা একটা স্তন উন্মুক্ত, সেখানে নির্যাতনের চিহ্ন।

'মাসুদ রানা।'—গম গম করে উঠল কবীর চৌধুরীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'প্রথম সুযোগেই তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল আমার। অতীতে দুই দুইবার তুমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছ, এবারও তাই ঘটতে চলেছিল প্রায়। তোমাকে বুদ্ধিমান বলব না, বলব ভাগ্যবান। কিন্তু ভাগ্যের পাশা এবার উল্টে গেছে টের পেয়েছ?'—পিছনের গাড়ি থেকে দু'জন সার্জেন্ট নামতেই ইঙ্গিত করল কবীর চৌধুরী সঙ্গীকে। ঝট করে ঘুরে পিস্তল তাক করল লোকটা ওদের দিকে।

'এই শিম্পাঞ্জীটাই বোধহয় ডক্টর সুফিয়ান আর ইনাম আহমেদের হত্যাকারী?'—জিজ্ঞেস করল রানা কবীর চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে।

'কে, গুস্তভ? শুধু ওরা কেন, সাবের খানও গেছে ওর হাতেই। আমাকে করিডরে দেখে পিস্তল বাগিয়ে ধরে ছুটে এসেছিল ব্যাটা। পিছন থেকে আক্রমণ করে এই গুস্তভই পিস্তল কেড়ে নিয়েছিল ওর, তারপর সায়ানাইড ইঞ্জেক্ট করেছিল ওর হাতের তালুতে, যাতে তোমরা মনে করো হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে মারা গেছে সাবের খান। তাছাড়া তোমার গায়েও ওর কোমল স্পর্শের কিছু চিহ্ন আছে—টের পাওনি এখনও?'

'পেয়েছি। এবং তুমিও অনেক কোমল স্পর্শ লাভ করবে আমার হাতের।'—বলল রানা এক পা সামনে এগিয়ে। পিস্তল ধরা হাতটা উঁচু করে ফেলেছে রানা।

'খবরদার!'—ধীর স্থির কণ্ঠে বলল কবীর চৌধুরী। পিস্তলের নলটা অনীতার শিরদাঁড়ার ওপর ঠেসে ধরল সে এবার। 'খুন করতে দ্বিধা করব না আমি, রানা! আর এক পা সামনে এগোলে…'

আরেক পা সামনে এগোল রানা। দু'জনের মধ্যে দূরত্ব এখন মাত্র চারফুট। বলল, 'কিছুই করবার ক্ষমতা নেই তোমার, কবীর চৌধুরী। তোমার জানা আছে, অনীতাকে হত্যা করার পর মুহূর্তে তোমার খুলি ফুটো করে দেব আমি, দ্বিধা করব না। নিজের প্রাণের প্রতি তোমার যথেষ্ট মায়া আছে। তাছাড়া এত প্ল্যান, এত পরিকল্পনা, এত খুন খারাপি—সবকিছুর পিছনে মস্ত বড় কোন উদ্দেশ্য আছে তোমার। সেটা কি, আমি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, যে জন্যে তোমার

এতদিনের এত আয়োজন, সেটা পাওয়া হয়নি তোমার এখনও। অনীতাকে হত্যা করে সবকিছু নষ্ট করবার মত দুর্বুদ্ধি কি তোমার হবে? এখনও তো আশা আছে তোমার, আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেতেও পারো, তাই না?'

'আমাকে বাঁচাও, রানা। এদের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে...'—আবছা অস্ফুট কণ্ঠে বলল অনীতা। 'হত্যা করে করুক, তবু ভাল...'

'কোন চিন্তা নেই, অনীতা।'—স্থির শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমাকে খুন করবার সাহস ওর হবে না।'

'বিরাট মনস্তাত্ত্বিক দেখছি...'—হাসি হাসি মুখ করে বলল কবীর চৌধুরী। তারপর হঠাৎ, কাউকে প্রস্তুত হবার কোন সুযোগ না দিয়ে সেঁটে গেল গাড়ির গায়ে। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অনীতা রানার গায়ের ওপর। দু'পা পিছিয়ে গেল রানা। টাল সামলে নিয়ে অনীতাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে পিস্তলটা আবার তাক করতে গিয়ে দেখল কবীর চৌধুরীর হাতে ছোট্ট একটা পাতলা কাঁচের বোতল। বোতলের মাথায় নীল প্লাস্টিক সীল। কবীর চৌধুরীর নির্বিকার মুখের দিকে চাইল রানা একবার, তারপর আবার চাইল নীল বোতলটার দিকে। এই বৃষ্টির মধ্যেও ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেল রানার পিস্তল ধরা হাতের তালু।

পিছন ফিরে চাইল রানা। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল শেখ, ইন্সপেক্টর রায়হান আর দারোগা ইয়াকুব আলী—এদের পিছনে মেজর জেনারেল রাহাত খান। সামনের দিকে চাইল রানা আবার। গুস্তভের পিস্তলের সামনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সার্জেন্ট। ধীরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলে উঠল রানা।

'কেউ কিছু করতে যাবেন না। সাবধান! ওই লোকটার হাতে ধরা ছোট বোতলটার মধ্যে আছে কালকূট। আজকের পেপার সবাই পড়েছেন, কাজেই আপনারা সবাই জানেন ওই বোতল ফাটলে কি অবস্থা হবে।'

বোঝা গেল, সবাই জানে। সবাই জানে এই কালকূটের মাহাত্ম্য। কেবল ওই বোতলটা ফাটলেই আগামী দুই মাসের মধ্যে পৃথিবীর প্রাণীকুল সম্পূর্ণ লোপ পাবে। কাজেই সাবধান! প্রত্যেকটি লোক সচকিত হয়ে চাইল বোতলটার দিকে।

'ঠিক।'—শান্ত, প্রায় উদাসীন কণ্ঠে বলল কবীর চৌধুরী। 'লাল সীল করা অ্যাম্পুল হচ্ছে বটুলিনাস টক্সিনের, আর নীল সীল যেটাতে, সেটা হচ্ছে কালকূট। আমি আপনাদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি—আজ রাতে সত্যিই বিশেষ একটা কিছু অর্জন করতে চলেছি আমি। গত একটি বছর পরিশ্রম করেছি আমি আজকের দিনটির সাফল্যের আশায় বুক বেঁধে।'—থামল কবীর চৌধুরী। উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের মুখের দিকে চাইল সে আলাদা আলাদা ভাবে। স্পট লাইটের তীব্র আলোয় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখের সবুজ কন্ট্যাক্ট-লেন্স। 'আমাকে যদি এখান থেকে বিনা বাধায় যেতে না দেয়া হয় তাহলে লক্ষ্য অর্জন করতে পারছি না আমি। এবং যদি সফলকাম না হতে পারি তাহলে এই জীবন ধারণ করবার কোন অর্থ থাকবে না আমার কাছে। কালকূটের বোতল ফাটিয়ে দেব তাহলে আমি। ইচ্ছে

করলে কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন।'

বিশ্বাস করল রানা ওর কথা। ক্ষমতার লোভ, গোটা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসে নিজের ইচ্ছেমত ঢেলে সাজাবার অদম্য আগ্রহ—এক কথায় সর্বশক্তিমান হওয়ার ইচ্ছা খেপা কুকুর করে তুলেছে কবীর চৌধুরীকে। দুই দুইবার কঠোর হাতে দমন করেছে রানা ওর এই উন্মত্ততা। আবার সুযোগ বুঝে প্ল্যান এঁটেছে সে। নিজের পাগলামি চরিতার্থ করবার জন্যে কবীর চৌধুরী পারে না এমন কাজ নেই, বাধা দিলে যা খুশি তাই করে বসাও তারই পক্ষে সম্ভব। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখা দরকার।

'ফাটিয়ে দিলে তোমার স্যাঙাৎ গুস্তভও মারা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার মতামতটাও জেনে নিলে ভাল হত না? সে হয়তো তার জীবন নিয়ে তোমার ছিনিমিনি খেলায়…'

'সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না, মাসুদ রানা। আমি একবার বাঁচিয়েছি ওকে ডুবে মরা থেকে, আর তিনবার বাঁচিয়েছি ফাঁসীকাঠ থেকে। ওর জীবনটা আমার খুশিমত ব্যবহারের অধিকার আমার আছে, এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই ওর। কি বলো, গুস্তভ, আমার জন্যে মরতে পারবে না?'

নোংরা হলুদ দাঁত বের করে হাসল গুস্তভ ঘাড় ফিরিয়ে। অর্থাৎ, পারবে।

'তুমি উন্মাদ!' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'তুমিই না গতকাল সবাইকে বুঝিয়েছ কালকূটের ধ্বংস নেই, আজ হোক কাল হোক পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মারা যাবে লবণের চামচের এক চামচ কালকূট ছড়িয়ে দিলে?'

'বলেছি। এবং কথাটার মধ্যে একবিন্দু মিথ্যা নেই, মেজর জেনারেল। ডক্টর হাশমতও জানে সেকথা। আর ছড়িয়ে দেয়ারও দরকার নেই, শুধু চামচটা উপুড় করে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। যদি আমাকে মরতেই হয় তাহলে পৃথিবীর বাকি সবাই মরুক বা বাঁচুক তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

'কিন্তু…'—আটকে গেল মেজর জেনারেলের মুখের কথা। 'খোদা! লোকটা বদ্ধ পাগল! পৃথিবীর জঘন্যতম দুষ্কৃতিকারীও কল্পনা করতে পারবে না এমন, এমন…অসম্ভব! নিশ্চয়ই কি বলছ বুঝতে পারছ না তুমি!'

'আমি উন্মাদ কিনা জানি না, কিন্তু যা বলছি, বুঝেই বলছি, মেজর জেনারেল রাহাত খান। মুখের কথা কাজে পরিণত করে দেখাতেও আমার আপত্তি নেই।'—নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে নেড়ে চেড়ে দেখল কবীর চৌধুরী কালকূটের বোতলটা। বার কয়েক উপর দিকে ছুঁড়ে আবার লুফে নিল। ভীত-সন্ত্রস্ত সম্মোহিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সবাই ওর হাতের দিকে। হঠাৎ নিচু হয়ে ঝুঁকে রাস্তার ওপর রাখল সে বোতলটা ডান পায়ের জুতোর গোড়ালিটা উঁচু করে ঠিক তার নিচে। পায়ের পাতা মাটিতেই আছে শুধু গোড়ালিটা উঁচু হয়ে জায়গা দিয়েছে বোতলটাকে। ব্যাপারটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারল রানা। কারণ ও জানে কবীর চৌধুরীর বাম পাটা কাঠের—এখন সামান্য একটু ভারসাম্য হারালেই গোড়ালির চাপ খেয়ে ভেঙে যাবে পাতলা কাঁচের বোতলটা। দুই চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল রানার। সোজা হয়ে চাইল কবীর চৌধুরী রানার

দিকে। 'বাজে কথায় নষ্ট করবার মত বাড়তি সময় আমার হাতে নেই। ল্যাবরেটরিতে এই জাতীয় একটা খালি বোতলের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি, মাত্র ছয়-সাত পাউন্ড ওজনের চাপ পড়লেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এগুলো। কাজেই এখন আমাকে কেউ যদি গুলিও করে, আমার পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাবে বোতলটা। এবার একজন একজন করে এগিয়ে এসো তোমরা, দূর থেকে পিস্তল বা রিভলভারের বাঁট এগিয়ে দাও আমার দিকে। আমি বহুকষ্টে ব্যাল্যান্স রক্ষা করছি, সাবধান, কেউ কোন কৌশল করবার চেষ্টা করলেই ব্যাল্যান্স হারিয়ে ফেলব। নাও, শুরু করো—তুমিই প্রথম, রানা।'

ল্যুগারটা উল্টো করে ধরে অতি সাবধানে হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে তুলে দিল রানা কবীর চৌধুরীর হাতে। একে একে সবাই তাই করল। এই চরম পরাজয়ের অপমান বড় তীক্ষ্ণ ভাবে বাজল সবার বুকে, কিন্তু উপায় নেই, মান অপমানের সময় এটা নয়। কবীর চৌধুরী এখান থেকে উদ্ধার পেয়ে কোন্ ভয়ঙ্কর সর্বনাশা খেলায় মাতবে জানা নেই কারও—কিন্তু তাকে যেতে দিতে হবে, ঠেকাবার কোনও উপায় নেই।

পিস্তলগুলো গাড়ির ছাতে জমা করে লাইন বেঁধে দাঁড়াতে আদেশ করল ওদের কবীর চৌধুরী। পিছন থেকে প্রত্যেককে সার্চ করল গুস্তভ। কারও কাছে পাওয়া গেল না আর কোন অস্ত্র। এবার গোড়ালিটা সরিয়ে নিল কবীর চৌধুরী বোতলটার ওপর থেকে, নিচু হয়ে তুলে পকেটে ফেলল সেটা। পিস্তলটা বের করল আবার।

'এবার পিস্তলের কাজ চলবে।'—হাসল সে সন্তুষ্টির হাসি। ইঙ্গিতে কাছে ডাকল সে গুস্তভকে তারপর নিচু গলায় বিচিত্র এক ভাষায় অনর্গল কথা বলল সে দুই মিনিট। কান খাড়া রেখেও একটি কথাও বুঝতে পারল না রানা সে বক্তব্যের। কথা শেষ হতেই মাথা ঝাঁকাল গুস্তভ। বুঝেছে সে। হাসি হাসি চেহারা নিয়ে চাইল সে অসহায় লোকগুলোর মুখের দিকে। অশুভ একটা ইঙ্গিত পেল রানা সে হাসিতে। কবীর চৌধুরী ফিরল এবার অনুসরণকারী জীপের সার্জেন্ট দু'জনের দিকে।

'ইউনিফর্ম খুলে ফেলো। এক্ষুণি।'—হুকুম করল সে। 'তোমরা দু'জন।'

পরস্পরের দিকে চাইল সার্জেন্ট দু'জন। ময়মনসিংহ জেলার বাছা বাছা দশ বারোটা গালি বেরিয়ে এল একজনের মুখ থেকে পয়েন্ট ফোর ফাইভ বুলেটের মত। কিন্তু অটল অবিচল দাঁড়িয়ে রইল কবীর চৌধুরী যেমন ছিল তেমনি। ম্যাগাজিন শেষ হতেই বলল, 'এক মিনিট সময় দিলাম।'

'পাগল হইছুইন? কাপড় খুলবাম আমি? উঁহুঁ!'

'না খুললে খুন করা হবে আপনাকে। বোকামি করবেন না।'—ধমকে উঠল রানা। 'কি ধরনের লোক এরা টের পাননি এখনও? খুলে ফেলুন কাপড়।'

'অসোম্বাব!'—আরেক প্রস্থ গালি ফায়ারিং করতে উদ্যত হলো সার্জেন্ট।

'আমি আদেশ করছি, এক্ষুণি খুলে ফেলো ইউনিফর্ম।'—বাধা দিয়ে গর্জন করে উঠল কর্নেল শেখ। 'কথা অমান্য করলে তোমার দুই চোখের মাঝখান দিয়ে একটা

বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে ইউনিফর্মটা খুলে নেয়া ওদের পক্ষে কঠিন কোন কাজ হবে না। খুলে ফেলো গর্দভ।'

ইউনিফর্ম খুলে রাগে এবং শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল সার্জেন্ট দু'জন জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায়। ইউনিফর্ম দুটো অয়্যারলেস ফিট করা ভ্যানের মধ্যে রাখল নিয়ে গুস্তভ।

'অয়্যারলেস অপারেটার কে?'—জিজ্ঞেস করল এবার কবীর চৌধুরী।

রানার মনে হলো কেউ যেন ছুরি বসিয়ে দিয়েছে ওর হৃৎপিণ্ডে। কেবল বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মোচড় দিচ্ছে ছুরিটা। উপায় নেই, কোন উপায় নেই আর।

'আমি।'—জবাব দিল অপারেটার।

'গুড। হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। ওদের বলো ধরা পড়েছি আমি। আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঢাকায়. সমস্ত পুলিস এবং Q-4 ব্রাঞ্চের জীপ যেন ফিরে যায় যার যার স্টেশনে।'

'যা বলছে তাই করো।'—বলল কর্নেল শেখ নির্জীব কণ্ঠে। 'কোন কৌশল করতে গেলে মারা পড়বে, সার্জেন্ট। যা বলছে তাই করতে হবে তোমাকে। আমরা সবাই জানি, তোমার কোন দোষ নেই।'

মেসেজ পাঠানো হলো হেড কোয়ার্টারে। সেখান থেকে জানিয়ে দেয়া হবে সমস্ত স্টেশনে। কোনও কৌশল করবার উপায় ছিল না অপারেটারের—সর্বক্ষণ কানের পাশে ধরা ছিল গুস্তভের পিস্তল।

'চমৎকার।'—অনাবিল হাসি হাসল কবীর চৌধুরী। 'কনসাল আর তোমাদের জীপ দুটো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে। কাল সকালের আগে আর কেউ খুঁজে পাবে না ওগুলো। সার্চ পার্টিও ফিরে যাচ্ছে যার যার স্টেশনে। কাজেই ওই ভ্যানে করে ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছানো মোটেই কষ্টকর হবে না আমাদের পক্ষে। বনানী কিংবা গুলশানের কোন একটা কানাগলিতে ভ্যানটা ফেলে রেখে হাওয়া হয়ে যাব আমরা। এখন একমাত্র সমস্যা হচ্ছে তোমাদের নিয়ে কি করা যায়?'

একে একে জীপ দুটো আর কনসালটা জঙ্গলের মধ্যে রেখে এল গুস্তভ। ভ্যানটাকেও নিয়ে এল গলির খানিকটা ভিতরে।

'ভ্যানে নিশ্চয়ই পোর্টেবল স্পট লাইট গোছের কিছু আছে। আছে না?'—প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী অয়্যারলেস অপারেটারের দিকে চেয়ে।

'আছে।'—জবাব দিল অপারেটার মাটির দিকে চেয়ে। 'ব্যাটারি সেট আছে একটা।'

'বের করে নিয়ে এসো।'—জয়ের হাসিতে উদ্ভাসিত কবীর চৌধুরীর মুখ। বলল, 'তোমরা সবাই দুই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ো। ওই যে পোড়ো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে একটা অস্থায়ী বন্দীশালা পাওয়া যাবে। গুস্তভের এক হাতে থাকবে স্পট লাইট, অন্য হাতে পিস্তল। আর আমি থাকব সবার পিছনে। মেজর জেনারেল রাহাত খানের শিরদাঁড়ার ওপর ঠেসে ধরা থাকবে আমার পিস্তল। কেউ কোনও রকম চঞ্চলতা প্রকাশ করলেই ট্রিগার টিপব আমি। গাড়ির ছাতের স্পট লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে রওনা হব আমরা এখুনি।'

দুই সারিতে পাঁচজন করে মোট দশজন হলো গুস্তভ আর কবীর চৌধুরী ছাড়া। এতক্ষণে লক্ষ করল রানা, সট্‌কে পড়েছে গিলটি মিঞা। নেই সে ওদের মধ্যে।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, পেয়ে গেল কবীর চৌধুরী তার পছন্দ মত বন্দীশালা। বেশ বড় সড় একটা ঘর—ষোলো ফুট বাই বারো ফুট। টালির ছাদ। প্রকাণ্ড সেগুন কাঠের ভারী দরজা। বাইরে থেকে হুড়কো তুলে দিলে হাজার চেষ্টা করলেও খোলা যাবে না ভিতর থেকে। চার দেয়ালে চারটে ছোট ছোট জানালা, মাথা সমান উঁচু। মোটা শিক দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে জানালাগুলোকে। খুব সম্ভব ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত এ ঘরটাকে এক সময়।

ঘরটার চারপাশে চোখ বুলাল রানা। টালির ছাদটা ঢালু হয়ে এসেছে দক্ষিণ দিকে। কবীর চৌধুরী বোকা নয়। তার নিশ্চয়ই জানা আছে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এই ঘরে এতগুলো বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী লোককে আটকে রাখা সম্ভব নয়। টালির ছাদ ভেঙে বেরিয়ে যাবে ওরা আধঘণ্টা চেষ্টা করলেই। তাহলে? সব জেনেও এই ঘরটা পছন্দ হলো কেন তার? দশজন মানুষ এক সঙ্গে চিৎকার করলে হয়তো আধঘণ্টার আগেই মানুষ জড় করে ফেলতে পারবে ওরা। তাহলে? তবু কেন এভাবে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে সে?

উত্তর পাওয়া কঠিন হলো না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠল রানা। শীতল একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে। কবীর চৌধুরী কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। ও জানে, দরজা বা টালির ছাদ ভেঙে একটি লোকও বের হতে পারবে না এই ঘর থেকে, চিৎকার করে একটি লোকও জড় করতে পারবে না ওরা কিছুই করবার উপায় নেই। একটি লোকও জ্যান্ত বেরোতে পারবে না এই ঘর থেকে। চার পাঁচ দিন পর মাংস পচা গন্ধ পেয়ে যখন মানুষ জন এসে ওদের উদ্ধার করবে, তখন খাটিয়া দরকার হবে বের করতে।

'ওপাশের দেয়ালের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো সবাই লাইন বেঁধে।'—আদেশ করল কবীর চৌধুরী। 'বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার আগে কেউ পিছন ফিরলেই গুলি খাবে। ইচ্ছে করলে শেষ বারের মত আমার চেহারাটা দেখে নিতে পারো। কারণ, আর দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে। এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে।'

'পরাজিত শত্রুপক্ষের এক আধটা আবেদন মঞ্জুর হতে পারে না?'—হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা।

'পারে, নিশ্চয়ই পারে।'—এগিয়ে এল কবীর চৌধুরী। 'বলে ফেলো। তোমার আবেদন মঞ্জুর হবে না তো কারটা হবে? তোমার মত বান্ধব আর কে আছে আমার?'—পিস্তলের চোখা মাছি দিয়ে রানার কানের পাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত একটা আঁচড় কাটল সে আদর করে। ফিনকি দিয়ে নেমে এল কয়েক ফোঁটা উত্তপ্ত রক্ত। অনাবিল হাসি ফুটে উঠল গুস্তভের মুখে। নির্যাতন করা ও দেখার চাইতে আনন্দের আর কিছু নেই ওর কাছে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল অনীতার মুখ থেকে। ছুটে আসছিল সে এদিকে, শক্ত হাতে ধরে রইল কর্নেল শেখ। এক পা পিছিয়ে গেল কবীর চৌধুরী। বলল, 'বলো, মঞ্জুর করে দিচ্ছি। অত্যন্ত দয়ালু লোক

আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা কবীর চৌধুরীর চোখের দিকে। হাত তুলে পরীক্ষা করল না কাটা গালটা একটি বারও। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতে।'

'রানা!'—আঁতকে উঠল অনীতা। রানার মুখ থেকে এমন কথা শুনবে কল্পনাও করতে পারেনি সে। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না অনীতা। 'একি বলছ!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়েছিল কর্নেল শেখও। শুধু চুপচাপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল কবীর চৌধুরী। দুর্বোধ্য একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে রানার কথায়। বলল, 'খুব সম্ভব তুমি শুধু ভাগ্যবানই নও, বুদ্ধিমানও। এবং হৃদয়বান। তুমি যে বুঝতে পেরেছ সেটা আমার জানা ছিল না। ঠিকই বলেছ, অমন একটা সুন্দরী যুবতীকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া আমার উচিত হচ্ছিল না। একেবারে পিশাচ আমি নই, রানা।'—অনীতার দিকে ফিরল সে। 'চলুন, মিস্ এ্যানিটা গিলবার্ট, গুস্তভ খুব খুশি হবে আপনাকে ফিরে পেয়ে।'

সোজা এসে রানার সামনে দাঁড়াল অনীতা। দুই বাহু খামচে ধরল সে রানার। অস্বাভাবিক নিচু কণ্ঠে বলল, 'কি ব্যাপার, রানা! কি হয়েছে? আমাকে এভাবে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ কেন? কি করেছি আমি তোমার? পিশাচের অধম ওই গুস্তভ, ওর হাতে…'—আর কথা বলতে পারল না অনীতা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল ওর। দুই ফোঁটা জল এসে পড়ায় ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। এক হ্যাঁচকা টানে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল অনীতাকে গুস্তভ।

রানা শুধু মনে মনে বলল, 'যাও, নীতা। আবার দেখা হবে।'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ঘটাং করে আটকে গেল হুড়কো। ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখা স্পট লাইটের আলোয় বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওরা পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড।

হঠাৎ খেপে উঠল কর্নেল শেখ। 'নিজেকে কি মনে করো তুমি, রানা? মেয়েটাকে এভাবে তুলে দিলে ওই পিশাচের হাতে! তুমি একটা আহাম্মক, না গর্দভ…'

'শাট্ আপ্!'—গর্জে উঠল রানা। সবার দিকে চাইল একবার সে ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে। 'ছড়িয়ে পড়ো! সবাই ছড়িয়ে পড়ো চারদিকে!'—মরিয়া কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'জল্দি! জানালাগুলোর দিকে নজর রাখো। ওই জানালা দিয়েই আসবে!'

রানার কণ্ঠস্বরে এমন একটা উত্তেজিত জরুরী ভাব প্রকাশ পেল যে বিনা-বাক্য-ব্যয়ে ছড়িয়ে পড়ল সবাই ঘরের চারদিকে। কর্নেল শেখও। সবার চোখ এখন জানালাগুলোর দিকে। প্রায় স্বগতোক্তির মত বলে চলল রানা, 'ওই জানালাগুলোর একটা দিয়ে ছুঁড়ে মারবে কবীর চৌধুরী একটা ভাইরাসের বোতল।

বটুলিনাস টক্সিন। যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে সেটা। ধরে ফেলতে হবে ওটাকে শূন্যে। যদি দেয়ালে বা মেঝেতে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই, সবাই মারা পড়ব...'

রানার কথা শেষ হবার আগেই একটা হাতের আবছা ছায়া দেখা গেল উত্তরের জানালা দিয়ে। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এল ঘরের মধ্যে কি যেন। স্পট লাইটের আলোয় ঝিক করে উঠল একবার জিনিসটা। সবাই দেখল ছোট্ট কাঁচের একটা বোতল—লাল সীল তার মাথায়। বটুলিনাস টক্সিন।

এতই দ্রুত, এতই আচমকা এল বোতলটা যে প্রস্তুত হবার সুযোগ পেল না কেউ। ঠুন করে শব্দ হলো দক্ষিণের দেয়ালের গায়ে প্রায় মেঝের কাছাকাছি। চুরমার হয়ে গেল পাতলা কাঁচের বোতল।

আট

লাফ দিল রানা।

আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে যে সে ঠিক করে রেখেছিল ভাইরাসের বোতল ফাটলে কি করতে হবে, তা নয়। মাথার ওপর লাঠির বাড়ি পড়বার আগে যেমন মানুষ মাথা নিচু করে, ঘুসি তুললে আপনা আপনি একটা হাত উঠে আসে আত্মরক্ষার জন্যে, চোখের কাছে খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে আঙুল নিয়ে গেলে নিজের অজান্তেই চোখ বুজে ফেলে—তেমনি 'ঠুন' শব্দটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিল রানা। যেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে রানা যে ভাইরাসের বোতলটা ধরা যাবে না, তখনও দেয়ালে গিয়ে লাগেনি সেটা, সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে রানার অবচেতন মন। লাফ দিয়েই ধাঁই করে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে বাম হাতে দক্ষিণ দিকের টালির ছাদে। খসে পড়ল সেটা চার টুকিরো হয়ে। বৃষ্টির পানির ঢল নামল ঘরের ভিতর।

ছড়ে গেছে রানার হাত ঘুসি মারার ফলে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই ওর। দুই হাতে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে ছিটাচ্ছে সে দেয়ালের গায়ে, ঠিক যেখানে ভেঙেছে ভাইরাসের বোতল। এরই ফাঁকে কথা বলে চলেছে সে।

'দম বন্ধ করে রাখো সবাই! যতক্ষণ সম্ভব দম বন্ধ করে রাখো। আর পানি ছিটাও। জলদি পানি ছিটাও দেয়ালের গায়ে। কিন্তু সাবধান, ছিটানো পানি যেন গায়ে না লাগে।'

কেন পানি ছিটাতে হবে সে কথা বুঝুক আর না বুঝুক কাজে লেগে গেল সবাই তৎক্ষণাৎ। পানি ছিটাতে ছিটাতে প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ, 'কি হবে? পানি ছিটালে কি হবে?'

'কি হবে জানি না।'—উত্তর দিল রানা। 'শুধু জানি বটুলিনাস টক্সিন হচ্ছে হাইড্রোস্কোপিক। পানি পেলে সহজে বাতাসের সঙ্গে মিশতে চায় না।'—

অয়্যারলেস অপারেটার আর ভ্যানের ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। 'তোমরা দু'জন পানি মুখে পুরে ফুঁ দিয়ে স্প্রে করো, বাতাসের সঙ্গে যেটুকু মিশেছে সেগুলোও যেন নেমে যায় নিচে। কিন্তু সাবধান, মেঝের পানি স্পর্শ করবে না কেউ।'

ডান হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা একজন সার্জেন্টকে। নিজের অজান্তেই মেঝের পানির ওপর চলে এসেছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে খচ্ করে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল রানা বুকের ভিতর। প্রথমেই মনে হলো রানার, ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে, মারা যাচ্ছে সে—কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, ডানদিকের পাঁজরের ভাঙা হাড় নড়ে ওঠাতেই এমন তীক্ষ্ণ ব্যথা লেগেছে ওর। পাঁজরের ভাঙা হাড়ের খোঁচা লেগে প্লুরা কিংবা ফুসফুস ছিদ্র হয়ে গেছে কিনা কে জানে? কিন্তু এসব ভেবে এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করল না রানা। বোধহয় অনেকটা পানি জমা হয়ে ছিল ছাতের ওপর, স্পট লাইটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে পানি এখন মেঝের ওপর জমতে জমতে। লাফিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিল রানা স্পট লাইট।

'সরে এসো! এপাশে সরে এসো সবাই! খবরদার! মেঝের পানি যেন লাগে না কারও গায়ে। দম বন্ধ করে রাখো।'

প্রত্যেকটা লোকের মুখের ওপর আলো ফেলল রানা। আর কতক্ষণ? কার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠবে সবচেয়ে প্রথমে? দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের গর্জন। চলে যাচ্ছে কবীর চৌধুরী ভ্যানে স্টার্ট দিয়ে। যাক। এক মিনিট নিশ্চয়ই পার হয়ে গেছে এতক্ষণে? এখনও ভাবান্তর নেই কারও মুখে। তবে কি···তবে কি বেঁচে যাবে ওরা এবারের মত? স্পট লাইটের আলোয় প্রত্যেককে পরীক্ষা করল রানা পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

'ডান পায়ের বুটটা খুলে ফেলুন।'—বলল রানা ময়মনসিংহ থেকে আগত একজন সার্জেন্টকে। হাত দিয়ে খুলতে আরম্ভ করতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রানার। 'হাত দিয়ে না, গাধা কোথাকার! বাম পায়ের বুটের গোড়ালি দিয়ে চেপে ধরে খুলতে হবে। কর্নেল, তোমার জামার হাতায় পানি কেন?'—পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল কর্নেল শেখ। সাবধানে জামাটা খুলে নামিয়ে দিল রানা সেটা কলার ধরে, ফেলে দিল মাটিতে।

'আমরা কি নিরাপদ এখন?'—জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল।

'না, স্যার। এই ঘরে একশোটা গোক্ষুর সাপ ছেড়ে দিলেও বেশি নিরাপদ বোধ করতাম। পানির তো ব্যবস্থা করা গেল কিন্তু পানি বেরোবার কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না, স্যার। মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যদি পায়ে লাগে তাহলেই মারা পড়ব সবাই। দেয়ালে তো আর পানি দেয়া যাচ্ছে না। শুকিয়ে গেলেই এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাব। তাছাড়া ঘরের বাতাসে যেটুকু জলকণা আছে সেগুলোতে হয়তো ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাস এতক্ষণে।'

'কাজেই এখন বেরোনো দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

দরকার ঠিকই, কিন্তু উপায় নেই লাফিয়ে উঠে ভাঙা টালির একধার ধরে

ফেললে পাশাপাশি কয়েকটা টালি খসিয়ে ছাতে উঠে যাওয়া অসম্ভব নয়, এবং একবার ছাতে উঠতে পারলে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়া খুবই সহজ—কিন্তু শুকনো মেঝে থেকে লাফিয়ে ওখানে পৌঁছানো যাবে না। লাফিয়ে উঠে ভাঙা টালি ধরতে হলে দক্ষিণের মেঝেতে তিন ইঞ্চি উঁচু হয়ে থাকা পানির মধ্যে যেতে হবে চারপাশে চেয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল রানা। স্পট লাইটটা দিল কর্নেল শেখের হাতে।

'এটা ধরে থাকো। আমি দেখি চার পাঁচটা টালি খসিয়ে ছাতে ওঠা যায় কিনা। সবাই দম বন্ধ করে রাখো। যত কম শ্বাস নিয়ে পারা যায় ততই ভাল। সরে এসো, ড্রাইভার, পানির অত কাছে যেয়ো না।'

তৈরি হচ্ছিল রানা লাফ দেওয়ার জন্যে, ধরে ফেলল ওকে কর্নেল শেখ। 'রানা! তোমার পায়ে ওই ভাইরাস ধোয়া পানি লাগবে। মারা যাবে তুমি, রানা!'

'ওই পানি লাগলে কিছু নাও হতে পারে। তুমি আমি কেউই তো বৈজ্ঞানিক নই, নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। হয়তো…'

'তাহলে আমাদের পানির কাছে যেতে নিষেধ করছ কেন?'—আজে বাজে যুক্তি দিয়ে কর্নেল শেখকে বোঝানো মুশকিল। 'তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ, রানা!'

'আত্মহত্যা করবার সাহস আমার নেই, শেখ। এখান থেকে বেরোবার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ওটা। কাজেই কারও না কারও চেষ্টা করে দেখতে হবেই। আমিই নাহয় দেখলাম। আর এক মিনিটও এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

'স্যার,'—রাহাত খানের দিকে ফিরল কর্নেল শেখ। 'আপনি বারণ না করলে ঠেকানো যাবে না রানাকে। আপনি কিছু বলুন, স্যার।'

'আমি এখানে দর্শক মাত্র, শেখ। এতদিন এয়ার কন্ডিশনড অফিসে বসে মানসচক্ষে দেখেছি তোমাদের কার্যকলাপ, আজ চোখের সামনে দেখছি। আমার বলবার কিছুই নেই। তোমরা যা ভাল বোঝো তাই করো।'

বোঝা গেল মেজর জেনারেল রাহাত খানও পরিষ্কার বুঝে নিয়েছেন অবস্থাটা। বুঝে নিয়েছেন উনি, কোন একজনের আত্মত্যাগ ছাড়া বাকি আটজনের জীবন রক্ষা পাওয়ার আর উপায় নেই। কাজেই বলবার তাঁর কিছুই নেই।

প্রস্তুত হলো রানা। কর্নেল শেখের হাতটা ছাড়িয়ে দিল বাহু থেকে। এগিয়ে যাচ্ছিল সে পানির দিকে, ঠিক এমনি সময়ে ঘটাং করে শব্দ হলো সেগুন কাঠের দরজায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দু'পাট খুলে গেল দরজাটা। দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিঞা।

'চৌদরী সায়েব লোকটা বেশী খারাপ না, স্যার, হারামী হচ্ছে ওই দৈত্যটা। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল শালা অনীতা বৌদিকে। বেরিয়ে আসুন সবাই, হাঁ করে ডেঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

আশার আলো জ্বলে উঠল সবার চোখে। সবাই বেরিয়ে এল বাইরে। বন্ধ করে দেয়া হলো ঘরের দরজাটা।

'তুমি দূরে সরে থাকো, গিলটি মিঞা।'—আদেশ করল রানা। ছাদের একটা

নল থেকে চারইঞ্চি মোটা হয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে, সেদিকে এগোল সে। ডাকল সবাইকে। 'সবাই চলে আসুন এখানে। আমাদের জামা কাপড়ে ভাইরাস লেগে গিয়ে থাকতে পারে, ধুয়ে নামাতে হবে বৃষ্টির পানিতে।'

আপত্তি তুলল কর্নেল শেখ। 'এতক্ষণেও মরিনি যখন, মরার ভয় আর নেই। তাছাড়া বৃষ্টিতে তো ভিজছিই, ভাইরাস থাকলে আপনিই ধুয়ে নেমে যাবে। এখন সময় নষ্ট না করে···'

মুখের কথা মুখেই আটকে গেল কর্নেল শেখের। চমকে উঠল সে। ভয়ঙ্কর, অপার্থিব এক চিৎকার দিয়ে বাঁকা হয়ে গেছে একজন সার্জেন্ট। ময়মনসিংহ থেকে আগত জীপের সেই সার্জেন্ট—রানা যাকে ডান পায়ের বুটটা খুলে ফেলতে বলেছিল। আর্তনাদটা গোঙানিতে পর্যবসিত হলো পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই। দুই হাতে নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরে ঢলে পড়ল সে মাটিতে। নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে সে কণ্ঠনালীটা, আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। এগিয়ে যাচ্ছিল অপর সার্জেন্ট, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা।

'খবরদার! ছুঁয়ো না ওকে! ওকে ছুঁলে মারা যাবে তুমিও। জলদি চলো সবাই—ধুয়ে সাফ করে ফেলতে হবে ভাইরাস। ওকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই।'

রানার আদেশ সত্ত্বেও নড়তে পারল না কেউ। বিস্ফারিত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সবাই মৃত্যু-পথ-যাত্রী সার্জেন্টের দিকে। বিশ সেকেন্ড লাগল ওর মারা যেতে। কিন্তু এই বিশটি সেকেন্ড বিভীষিকা হয়ে বার বার ফিরে আসবে ওদের দুঃস্বপ্নে—ভুলতে পারবে না কেউ এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অনেক মৃত্যু দেখেছে রানা, কিন্তু এমন ছটফট করে, এমন যন্ত্রণা পেয়ে মারা যেতে দেখেনি সে আর কাউকে। দুই দুইবার লাফিয়ে উঠল দেহটা মাটি থেকে শূন্যে, সামনে পিছনে বাঁকা হয়ে গেল বার কয়েক ধনুষ্টঙ্কার রুগীর মত, তারপর স্থির হয়ে গেল হঠাৎ কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে।

'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!'—মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল ওদের মধ্যে কেউ একজন।

রক্তশূন্য হয়ে গেছে সবার মুখ ভয়ে। কী বীভৎস মৃত্যু! হঠাৎ সচকিত হয়ে চাইল সবাই সবার দিকে। এর একটি মাত্র অর্থ হচ্ছে: এবার কার পালা?

'হাত দিয়ে জুতো খুলতে গিয়েই সর্বনাশ করেছিল লোকটা।'—বলল রানা। 'নিশ্চয়ই ভাইরাস লেগে গিয়েছিল হাতে। হয়তো সেই হাত মুখেও দিয়েছিল। চলুন, স্যার, আপনি প্রথম।'

একে একে সবাইকে দাঁড় করানো হলো দুই মিনিটের জন্যে পানির তোড়ের নিচে। স্পট লাইট ধরে দাঁড়িয়ে রইল রানা কাছেই, কোনও জায়গা বাদ পড়লে বলে দিল। এরপর ডুব দিতে হলো প্রত্যেককে দীঘির পানিতে। চুপচুপে ভেজা অবস্থায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল ওরা। সবচেয়ে পিছনে মেজর জেনারেল রাহাত খান এবং রানা।

'আমি জানতাম না, শত ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হয়,

রানা। গল্পের মত তোমার রিপোর্ট পড়েছি এতদিন সাত তলার অফিস কামরায় বসে। প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তোমাকে কিভাবে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়—আজ দেখলাম নিজের চোখে। অনীতাকে সরিয়ে দিয়ে ঠিকই করেছিলে তুমি।'

মনে মনে লজ্জা পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল রানা। এত কোমল কথা জীবনে শোনেনি সে এই বৃদ্ধের মুখে। যাঁর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দৃষ্টির সামনে চোখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত সাহস হয়নি তার কোনদিন, যাঁর সামনে দাঁড়ালে আজও দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে ওর বুকের ভিতরটা—পৃথিবীর যে একটি মাত্র লোকের পায়ে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা সমর্পণ করে বসে আছে সে নিশ্চিন্তে, যাঁর চোখের একটি মাত্র ইঙ্গিতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা হয় না ওর—সেই লোকের মুখে প্রশংসা শুনে খুশির চোটে বেসামাল হয়ে পড়ল রানার স্নেহ কাঙাল অন্তর।

'কিন্তু সার্জেন্টের মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে আমার, স্যার। সাবধান করা উচিত ছিল আমার। ওকে বলে দেয়া উচিত ছিল যে মুখে বা নাকে হাত...'

'ওর নিজেরই সেকথা জানা উচিত ছিল।' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'বিপদের কথা তোমার মত ওরও জানা ছিল। প্রত্যেকটা খবরের কাগজে ভেঙেচুরে লেখা হয়েছে সব কথা। নিজেকে তোমার দোষী মনে করবার কিছুই নেই। দোষ কবীর চৌধুরীর। আগামী পাঁচ ঘন্টার মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। তাকে ঠেকাবার ব্যবস্থা করো।'

'আগামী পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই ধরা পড়বে, স্যার ও।'

'কিভাবে?'

'বাড়ি ফিরে কাপড় ছেড়েই মীটিং-এ যেতে হবে আপনাকে, স্যার। জিন্না এভিনিউ এবং মতিঝিল থেকে সমস্ত লোক সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে চাপ দেবেন, স্যার আপনি। কেউ যদি খেপা লোকটার আবদার মেনে নেয়ার প্রস্তাব তোলে তাহলে হেসে উড়িয়ে দিতে হবে তাকে। ওই এলাকা থেকে লোক সরানো মোটেই কষ্টকর হবে না। মাইক দিয়ে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করতে হবে, দরকার হলে রেডিয়োতে অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে হবে যেন এই এলাকার কাছাকাছি কেউ না যায় আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে।'

কর্নেল শেখ পিছিয়ে এসেছিল, রানার শেষের কথাগুলো কানে গেল ওর।

'কি ব্যাপার, এখনও তুমি কবীর চৌধুরীকে ধরবার আশা ত্যাগ করোনি?'

'না। আগামী পাঁচ ঘন্টার মধ্যে কালকূট ফিরিয়ে আনব আমি রিসার্চ সেন্টারে। দুই-তিনশো সাহসী লোক দরকার আমার। সশস্ত্র সাহসী লোক। আমি জানি কবীর চৌধুরীর প্ল্যান।'

'জানো! কি বলছ তুমি, রানা?'

'ঠিকই বলছি। কথা একটু বেশি বলে ফেলেছে সে। বুঝেছি আমি আজ রাতে কি করতে চলেছে কবীর চৌধুরী।'

'ওর কথাগুলো তো আমরাও শুনেছি, রানা! কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি!' বললেন মেজর জেনারেল।

'আজ দুপুরে আমি যে তথ্যগুলো জানতে পেরেছি পুরানো ঢাকা শহরের অলিগলি ঘুরে, সেগুলো আপনি জানলে আপনিও বুঝতে পারতেন, স্যার। ঠিক মিলাতে পারছিলাম না একটার সঙ্গে আরেকটা তথ্যকে। কবীর চৌধুরীর দুই একটা কথাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে সব আমার কাছে। এক নম্বর: ও বলেছে ঢাকায় চলেছে সে। যদি সত্যি সত্যিই ঢাকার বুকে ভাইরাসের বোতল ফাটাবার ইচ্ছে থাকত তাহলে আর যেখানেই যাক, ঢাকার দিকে রওনা হত না সে। বরং তাহলে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেত সে ঢাকা থেকে। তাছাড়া রিসার্চ সেন্টার ভাঙা হচ্ছে কি হচ্ছে না জানতে হলে তার টঙ্গি থাকা দরকার। কিন্তু তা সে থাকছে না। আসলে রিসার্চ সেন্টার আস্ত থাকুক বা না থাকুক কিছুই এসে যায় না কবীর চৌধুরীর। বোঝা যাচ্ছে ওর কাজটা আসলে ঢাকায়। দুই নম্বর: ও বলেছে আজ রাতেই সে বিরাট একটা সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছে। তিন নম্বর: আজই চলে যাচ্ছে সে পাকিস্তান ছেড়ে। এবং চার নম্বর: আজ হচ্ছে শনিবারের রাত্রি। এই চারটে জিনিস একত্রে মেলালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ওর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ।'

'আরও অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।' বলল কর্নেল শেখ। 'একটু বুঝিয়ে বলো, রানা।'

বুঝিয়ে বলল রানা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে।

নয়

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে রানার চাঁদির ওপর। সারা মুখে আর হাতে কালি মেখে নিয়েছিল সে ধুয়ে যাচ্ছে সেগুলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রানা—নিথর, নিস্পন্দ। অপেক্ষা করছে সে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। রাত বারোটা।

ভাঙা রিবটা খুব সম্ভব ডিজলোকেটেড হয়ে গেছে। প্রতিবার শ্বাস নেবার সময় খচ্ করে খোঁচা লাগছে বুকের ভেতর কোথায় যেন। শীত করছে ভয়ানক। আর দুর্বলতা। ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। অনীতাকে ওভাবে কবীর চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে সত্যিই কি ভাল করেছে সে? সত্যিই কি রক্ষা করতে পারবে সে ওকে স্যাডিস্ট পিশাচ গুস্তভের হাত থেকে? মাথা ঝাড়া দিয়েও এই চিন্তাটা দূর করতে পারছে না রানা মাথার মধ্যে থেকে। ঘুরে ফিরেই মনে পড়ছে অনীতার অসহায় করুণ মুখ, আর গুস্তভের ক্ষুধিত হাসি।

মধুপুরের সেই পোড়ো বাড়িটার আশপাশের দু'মাইল এলাকা থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আগামী বারোঘণ্টার জন্যে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে পানি ব্যবহার করতে। সব রকমের চেষ্টা চলছে, যেন

ভাইরাসের আক্রমণে আর কেউ মারা না যায় হতভাগ্য সার্জেন্টটার মত।

দশটার সময় আরেকটা মেসেজ এসেছে ও. পি. পি. অফিসে, সেখান থেকে দুই এক হাত ঘুরে দশটা পাঁচে পি. সি. আই. অফিসে। আদেশ অমান্য করার অপরাধে ভোর সাড়ে চারটা থেকে সময়টা এগিয়ে দেয়া হয়েছে সাড়ে চার ঘন্টা। রাত ঠিক বারোটার সময় ফাটবে একটা ভাইরাসের বোতল শহরের কেন্দ্র বিন্দু মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায়।

লোক সরানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আগেই। দশটার পর থেকে বারবার বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে রেডিয়ো পাকিস্তান থেকে। সবাইকে সরে যেতে বলা হয়েছে অন্তত দুই মাইল তফাতে। হাজার দুয়েক মিলিটারি সুশৃঙ্খল ভাবে পুরো এলাকা থেকে লোক সরিয়ে নিয়ে গেছে, বার বার করে মাইকে ঘোষণা করেছে, এক আধজন যদি ভুল করে রয়ে গিয়ে থাকে, যেন এই মুহূর্তে সরে যায় এখান থেকে। একটি লোকও আর অবশিষ্ট নেই। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, জিন্না এভিনিউ, তোপখানা রোড, হাটখোলা, গোপীবাগ—সব জনশূন্য আজ। ঠিক পোনে বারোটার সময় হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি ফেইল করল। পাওয়ার স্টেশনে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে হয়তো—দপ্ করে নিভে গেছে মতিঝিল আর জিন্না এভিনিউয়ের সমস্ত বাতি। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা আরও পনেরোটা মিনিট। রাত বারোটা।

পকেট থেকে ছয় আউন্সের একটা ছোট হুইস্কির বোতল বের করল রানা। ঢক ঢক করে আউন্স তিনেক নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে বোতলের মুখ বন্ধ করে হিপ্ পকেটে রেখে দিল সেটা আবার। বাম বাহুতে বাঁধা আছে খাপে পোরা থ্রোয়িং নাইফ ফুল-হাতা চামড়ার জ্যাকেটের নিচে, বাঁটটা কজির কাছে। পায়ের গোড়ালির কাছে ইলাস্টোপ্লাস্ট দিয়ে সাঁটানো আছে একটা জিলেট ব্লেড। শোলডার হোলস্টারে ওয়ালথার। অস্ত্রশস্ত্রগুলো একবার সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে নিল রানা। পিস্তলটা বের করে হাতে নিল, তারপর হাঁটতে আরম্ভ করল সাবধানী পায়ে।

সতেরো তলার ভিত বাড়িটার। অসম্পূর্ণ। প্রায় দুই বিঘা জমির ওপর উঠছে চারকোনা বাড়ি। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলেছে পুরোদমে। দ- তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে মাত্র দু-তিন দিন হলো। রানার অফিস থেকে পরিষ্কার দেখা যায় বাড়িটা। বাড়িটার মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশ বর্গফুট মত জায়গা খালি রেখে দেয়া হয়েছে, প্রকাণ্ড একটা ইন্দারার মত। খুব সম্ভব সতেরো তলা সম্পূর্ণ হলে এই প্রকাণ্ড ইন্দারার ছাদটা ঢেকে দেয়া হবে ট্র্যান্সপেরেন্ট প্লাস্টিক দিয়ে—প্রচুর আলো আসবে ওখান দিয়ে দিনের বেলা, অতবড় চৌকোনা প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে বসেও স্বাভাবিক আলো পাবে মানুষ, অন্ধকার ঘুপচি মনে হবে না। বাড়িটার ভেতরে বাইরে রাজমিস্ত্রিদের বাঁধা বাঁশের মই।

অতি সাবধানে বাড়িটার পিছনে চলে এল রানা। সুইপারের জন্যে দুটো সরু সিঁড়ি বাড়ির পিছনের দুই কোণে। ঠিক বারো ধাপ পর পরই এক একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম—প্রত্যেকটি তলায় ল্যাট্রিন এবং ইউরিনালের দরজা ছুঁয়ে উঠে গেছে

সিঁড়িটা দশ তলা পর্যন্ত।

একটা ইঁট ভেজাবার চৌবাচ্চার মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল রানা। আরও একটু এগিয়ে দেয়ালের গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেল সে। তিন মিনিট পার হয়ে গেল। কাঠ-পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা আরও দুই মিনিট। তারপরই কানে এল শব্দটা। বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দের উপর দিয়েও শুনতে পেল রানার সতর্ক কান সেই শব্দটা। একজন একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে পা বদল করল। দেহের ওজন এক পায়ের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল আরেক পায়ে। অসাবধানতায় জুতোটা ঘষা লেগে গেল মাটির সঙ্গে। আবার নীরবতা। আর কোন শব্দ এল না। কিন্তু আর শব্দের প্রয়োজন নেই রানার। একবারই যথেষ্ট। লোকটার আবছা ছায়া দেখতে পেয়েছে সে। জমাদারের সিঁড়ির ঠিক নিচে বৃষ্টি থেকে গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। রানাকে দেখতে পায়নি সে। দোষ নেই তার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বৃষ্টির রাতে কালো ফুলপ্যান্ট আর কালো লেদার জ্যাকেট পরা কোন লোক যদি হাতে মুখে কালি মেখে দুই ফুট দূরে এসে দাঁড়ায়, তবু টের পাওয়ার কথা নয়—রানা তো প্রায় বিশ ফুট তফাতে আছে। লোকটা যেই হোক, শত্রুপক্ষই হোক আর আফটার-ডিনার-ওয়াক-এ-মাইল ভদ্রলোকই হোক—কপাল খারাপ তার।

বাম হাতে চলে গেল রানার পিস্তলটা, ছুরিটা চলে এল ডান হাতে। শিকারী চিতার মত নিঃশব্দ পায়ে লোকটার দশ ফুটের মধ্যে চলে এল রানা। আবছা ছায়াটা আর একটু স্পষ্ট দেখাচ্ছে। এর ডবল দূরত্ব থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড গেঁথে দিতে পারে রানা এই ছুরি দিয়ে, দিনের বেলা। কাজেই আর কাছে যাওয়ার দরকার নেই। ছুরি সুদ্ধ হাতটা পিছন দিকে নিয়ে গেল রানা—চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে লোকটার হৃৎপিণ্ডের ওপর। দ্বিধা এল রানার মনে। ছুরিটা ছুঁড়তে গিয়েও থেমে গেল সে কি মনে করে। নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, যত খারাপ লোকই হোক না কেন, যত বড় দুষ্কৃতিকারীই হোক না কেন—ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করা কি উচিত? মায়া দয়ার সময় এটা নয়, ধরা পড়লে হয়তো ফাঁসীই হয়ে যাবে লোকটার, তবু ছুঁড়তে পারল না রানা ছুরিটা। খাপের মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে রেখে পিস্তলটা ডান হাতে নিল সে আবার। তারপর ভূতের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে এক পা এক পা করে। দূর থেকে ছুরি মেরে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ না সেরে বোকার মত এই ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছে বলে নিজের ওপরই চটে গেল রানা। তাই লোকটার কানের কাছে মাথার খুলির ওপর পিস্তলের বাঁটের আঘাতটা রাগের মাথায় একটু জোরেই হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়বার আগেই ধরে ফেলল রানা লোকটাকে—আস্তে করে নামিয়ে দিল মাটিতে। ফজরের আজানের আগে আর ঘুম ভাঙবে না ব্যাটার। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করল রানা।

ধীরে ধীরে উঠছে রানা। সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে উপরের দিকে বারবার। এখন সজাগ থাকতে হবে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। চাঁদের আলোর মত আলতো ভাবে পড়ছে রানার পা। নিঃশব্দে। সাত

তলা পর্যন্ত উঠেই আবছা আলো দেখতে পেল রানা। আরও সাবধান হয়ে গেল সে। গতি কমে গেল ওর। আলো কেন? আশপাশে কোথাও কোন আলো নেই, এখানে কেন? এক পা এক পা করে উঠে এল রানা নয় তলার প্ল্যাটফর্মে। আলোটা আসছে বাড়ির ভেতর থেকে, ল্যাট্রিনের দরজা দিয়ে। অতি সাবধানে দেয়ালের গায়ে সেঁটে মুখ বাড়াল রানা সামনে। এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা ওর কাছে।

আট তলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি তলার ল্যাট্রিনের দরজা বন্ধ করা আছে বলে আলোটা চোখে পড়েনি তার এতক্ষণ পর্যন্ত। নয় তলার দরজাটা তৈরিই করা হয়নি এখনও। কিন্তু কালো একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দার নিচে দিয়ে আসছে আলোটা। বাথরুম তৈরি হয়নি এখনও—এবড়োখেবড়ো দেয়াল তুলে রাখা হয়েছে কেবল। তার ওপাশে চওড়া একটা বারান্দা, বারান্দার পরই চার ফুট উঁচু রেলিং। ওপাশে পঞ্চাশ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা। আলোটা আসছে সেখান থেকেই। খুব সম্ভব হ্যাজাক। ওখানে আলো জ্বাললে আশপাশের কোন দিক থেকে দেখা যাবে না, কিন্তু আকাশ থেকে দেখা যাবে স্পষ্ট। অন্ধকার বৃষ্টির রাতে কোন বাড়ির ছাতের ওপর হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে হলে এর চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর হতেই পারে না।

পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। ঠিকই। প্রকাণ্ড গর্তটার ঠিক মাঝামাঝি দশ তলার ওপর একটা বিমের সাথে ঝুলিয়ে বাঁধা রয়েছে একখানা হ্যাজাক লাইট। নিচের দিকে চাইল রানা। প্রায় একশো ফুট নিচে আবছা দেখা যাচ্ছে মেঝে। গর্তটার ঠিক মাঝখান দিয়ে সোজা ওপরে উঠে এসেছে একটা চারফুট ব্যাসের গোল পিলার। প্রতি বিশ ফুট অন্তর অন্তর সেই পিলার থেকে চারটে একফুট চওড়া লোহার বিম মিশেছে গিয়ে চার পাশের চার দেয়ালে। এলাহি কারবার—ওপর থেকে নিচের দিকে চাইলে ঘুরে ওঠে মাথাটা।

কেউ নেই নয় তলায়। থাকার কথাও নয়। ফিরে এল রানা বাথরুমের মধ্যে দিয়ে সরু সিঁড়িটায়। আর একটা প্ল্যাটফর্ম, তারপর বারো ধাপ উঠলেই ছাতে পৌঁছবে সে। এক ধাপ উঠতেই পিছন থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা বাহু পেঁচিয়ে ধরল রানার গলা। টেনে নিয়ে গেল ওকে দু'পা পিছনে। আক্রমণটা এতই অতর্কিতে এল যে দুই সেকেন্ড কিচ্ছু করবার উপায় রইল না রানার। চমকে উঠল সে প্রথমে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে মট্ করে ভেঙে যাবে ঘাড়টা এক্ষুণি। ডান হাতের কব্জির ওপর শক্ত ধাতব কিছু একটার আঘাত পড়ল। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল পিস্তলটা, রেলিং-এর ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা অতল অন্ধকারে।

দুই হাতে গলার ওপর থেকে হাতটা সরাবার চেষ্টা করল রানা। পারল না। আরও চেপে বসছে হাতটা, ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইছে ওর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে।

পিঠের ওপর জোর এক গুঁতো অনুভব করল রানা। বুঝতে পারল, পিস্তল ঠেসে ধরা হয়েছে ওখানটায়। কিন্তু এভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় না, কিছু একটা

না করলে আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কড়াৎ করে ভেঙে যাবে ঘাড়টা। ডানা দেয়ালে ঠেকিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিল রানা। রেলিং-এর ওপর গিয়ে পড়ল দুজন—প্রথমে আক্রমণকারী, তার বুকে পিঠ লাগানো অবস্থায় রানা। মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল আক্রমণকারীর পা দুটো। রানারও। ভারসাম্য হারিয়ে রেলিং-এর ওপর প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় রইল দুজন দুই সেকেন্ড, তখনও রানার গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে আক্রমণকারীর বাম হাত। এইবার রেলিং টপ্‌কে বাইরের দিকে পড়ে যাচ্ছে ওরা।

রানার গলার ওপর থেকে সরে গেল আক্রমণকারীর হাত, পিঠের থেকে সরে গেল পিস্তলটাও। ঝট্ করে দুইহাতে রেলিং ধরে ফেলল লোকটা। সরে এল রানা। ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল সে বুক ভরে, টলে উঠল মাথাটা, পড়ে গেল সে দশ তলায় ওঠার সিঁড়ির ওপর। ডান ধারে কাত হয়ে পড়ল—ভয়ানক ব্যথা লাগল ভাঙা পাঁজরে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে, কিন্তু জ্ঞান হারালে চলবে না—রানা, সহ্য করে নাও, তোমার ওপর নির্ভর করছে দেশের নিরাপত্তা, অনীতার জীবন! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল রানা। কয়েক সেকেন্ড কিছু দেখতে পেল না সে চোখে, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে দৃষ্টিটা।

গুস্তভ! সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড দৈত্যটা রেলিং থেকে নেমে। নিঃশব্দে উঠে এসেছিল সে রানার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারল রানা, গুস্তভের উদ্দেশ্য। যদি বন্দী করতে চাইত, মাথার পিছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাঝারি গোছের একটা টোকা দিলেই যথেষ্ট ছিল। যদি খুন করতে চাইত, গুলি করতে পারত। কিংবা জ্ঞানহীন রানার দেহটাকে রেলিং টপকে নিচে ফেলে দিলেই চলত, একশো ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়লে ছাতু হয়ে যেত রানার মাথা। কিন্তু এত সহজে রানাকে হত্যা করবার ইচ্ছে নেই গুস্তভের। যদি মরতে হয়, কষ্ট পেয়ে যন্ত্রণাময় মৃত্যু ঘটবে ওর ধীরে ধীরে। রানার মৃত্যু-যাতনা উপভোগ করতে চায় সে চেখে চেখে। গুস্তভের চোখে রক্ত পিপাসা।

চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে রানা। পিস্তল হাতে এগিয়ে এল গুস্তভ, শরীরটা সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে কুঁজো হয়ে। ঝট্ করে লাথি চালাল রানা। যেখানটা সই করেছিল, সেখানে লাগলে আগামী বারো ঘণ্টার জন্যে অজ্ঞান হয়ে থাকতে হত গুস্তভকে, কিন্তু জায়গা মত লাগল না লাথিটা। গুস্তভের উরু ঘেঁষে আরও উপরে উঠে গেল রানার জুতো—পিস্তল ধরা হাতের কনুইয়ের উপর পড়ল লাথিটা। ছোট্ট একটা গর্জন করে উঠল গুস্তভ। পিস্তলটা ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক ধাপ নিচে সিঁড়ির উপর।

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়াল গুস্তভ, দ্রুত পায়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। নিচু হয়ে ঝুঁকে খুঁজছে সে তার পিস্তল। লাফ দিল রানা। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে জোড়া পায়ে লাথি মারল সে গুস্তভের পিঠে। আর একটি ক্ষুদ্র গর্জন বেরিয়ে এল গুস্তভের মুখ থেকে। সিঁড়ির উপর দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে গড়িয়ে নেমে গেল সে নিচের প্ল্যাটফর্মে। অবাক হয়ে দেখল রানা, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে গা'ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে গুস্তভ। হাতে পিস্তল।

আর চিন্তা করবার সময় নেই, ঠিক কখন শত্রু পক্ষকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হয় জানা আছে রানার, দ্বিধা মাত্র না করে এক লাফে বাথরুমে ঢুকল সে। বসে থাকলে গুলি খেতে হত, নিচে বা উপরে রওনা হলেও সেই একই কথা। যদি দৈবক্রমে গুলি এড়িয়ে দশ তলার ছাদে পৌঁছানো সম্ভব হত—গোপনীয়তা রক্ষা হত না, প্রস্তুত হয়ে যেত কবীর চৌধুরী। একটি মাত্র ছুরি সম্বল করে কিছুই করতে পারবে না সে, কবীর চৌধুরীর মত ভয়ঙ্কর এবং ধূর্ত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে। বাথরুম এবং বারান্দা পেরিয়ে ছুটে চলে এল রানা ফাঁকা জায়গাটার চার ফুট উঁচু রেলিং-এর ধারে। দশ ফুট নিচে এক ফুট চওড়া লোহার বিম্। এইখান থেকে লাফিয়ে পড়া যাবে না ওর উপর? বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে নেই তো ওটা? যদি পা ফসকায় তাহলে সোজা একশো ফুট নিচে···দুলে উঠল বাথরুমের পর্দা। গুস্তভের প্রকাণ্ড চেহারার একাংশ দেখা গেল পর্দার ফাঁক দিয়ে। রেলিং টপকে ওপাশে ঝুলে পড়ল রানা। গুস্তভের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, উপায় নেই আর, নিচের দিকে চেয়েই ঘুরে উঠতে চাইল রানার মাথাটা, হাত দুটো ছেড়ে দিল সে রেলিং থেকে। ডান পা-টা পড়ল রানার বিমের উপর, বাম পা-টা গেল পিছলিয়ে। পড়ে যাচ্ছিল সে, দুই হাতে জড়িয়ে ধরল সে বিমটাকে। কয়েক সেকেন্ড যায় যায় অবস্থায় দোদুল্যমান থেকে সামলে নিল সে ঝুলটা। তারপর কম্পিত দেহে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছে গুস্তভ রেলিং-এর ধারে, হয়তো এক্ষুণি গুলি করবে—কিন্তু এসব ভাবার সময় নেই রানার। ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নিচে, কোনদিকে না চেয়ে দৌড় দিল সে মাঝের চার ফুটি পিলারের দিকে। পিলারের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত পিছন ফিরে একটি বারও তাকাল না সে গুস্তভের দিকে এবার কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে চাইল রানা পিছনে।

হাসছে গুস্তভ। ওর হাসির কারণটা বুঝতে পারল না রানা প্রথমে, কিন্তু বারান্দা ধরে গুস্তভকে বাম দিকে এগোতে দেখেই ঝট করে ফিরল সে বাঁয়ে। সমস্ত আশা-ভরসা দপ্ করে নিভে গেল রানার। রাজমিস্ত্রিদের বাঁশের মই দেখা যাচ্ছে বাঁয়ে। সাহসের অভাব ছিল বলে যে রানার পিছু পিছু লাফিয়ে পড়েনি গুস্তভ, তা নয়। বিমের উপর নেমে আসার সহজ উপায় থাকতে ঝুঁকি নেওয়ার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। নেমে আসছে সে বাঁশের মই বেয়ে। নিজের উপরই প্রচণ্ড রাগ হলো রানার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে সে নয়তলা পর্যন্ত, একটিবারও পিছু ফিরে দেখার কথা মনে আসেনি তার। নিশ্চয়ই গার্ডদের খবরদারি করার জন্যে এবং তাদের উপর নজর রাখার জন্যে এক তলায় থাকবার নির্দেশ দিয়েছিল গুস্তভকে কবীর চৌধুরী। সিঁড়ির কাছে গার্ডকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে কিছুই বুঝতে বাকি ছিল না ওর, ক্ষুধার্ত শার্দূলের মত শিকারের পিছু পিছু উঠে এসেছে সে সিঁড়ি বেয়ে।

বিমের উপর নেমে এল গুস্তভ দুই হাত দুই দিকে মেলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে সাবধানী পায়ে এগিয়ে আসছে সে রানার দিকে। ডান হাতে পিস্তল। দ্বিধামাত্র না করে রানাও একটা বিমের উপর দিয়ে সরে যেতে আরম্ভ করল যতদূর সম্ভব। পঁচিশ ফুট এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে—সামনে দেয়াল, আর যাবার

রাস্তা নেই কোন। নিচের দিকে চাইল রানা. বিশ ফুট নিচে আর একটা বিম. তারও বিশ ফুট নিচে আরও একটা। লাফিয়ে পড়া আর আত্মহত্যা একই কথা। মাঝের পিলারের কাছে এসে দাঁড়াল গুস্তভ, মুখে জয়ের হাসি। পঁচিশ ফুট দূরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত রানা শুধু ট্রিগার টেপার অপেক্ষা হঠাৎ সিগারেটের তেষ্টা পেল গুস্তভের। বিমের দুই পাশে পা ঝুলিয়ে বসে বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল সে একটা পিস্তলটা একবার তাক করল রানার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে. তারপর নামিয়ে রাখল সেটা বিমের উপর। নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছে সে, নোংরা-হলুদ দাঁত বের করে হাসছে আর মাঝে মাঝে কুৎসিত মুখভঙ্গি করে চোখ টিপছে। ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত সমুপস্থিত কয়েক টান দিয়ে সিগারেটটা বাঁ হাতে নিল সে. পিস্তলটা দাঁতে কামড়ে ধরে বিমের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল সে দশ ফুট আবার বিশ্রাম দরকার হয়ে পড়ল তার, বিমটাকে দুই পায়ে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে বসল সে। রানার পা লক্ষ্য করে পিস্তলটা তাক করল সে এবার, মুখে বীভৎস হাসি।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল রানা, মাথার উপর হাত তুলল সে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। দারুণ মজা পেল গুস্তভ। পিস্তলটা বিমের উপর নামিয়ে রেখে সিগারেট টানতে থাকল সে অন্যমনস্কতার ভান করে।

মাথার উপর তোলা বাম হাতের জ্যাকেটের তলা থেকে অতি ধীরে, অতি সাবধানে, একটু একটু করে চলে আসছে ছুরিটা রানার ডান হাতে। হঠাৎ কি মনে করে রানার তলপেট সই করল গুস্তভ পিস্তল উঠিয়ে। বরফের মত জমে গেল রানা. তীক্ষ্ণ একটা বেদনার জন্যে প্রস্তুত হলো ওর শরীর। ট্রিগারের উপর গুস্তভের তর্জনীর নখটা সাদা দেখাচ্ছে। চাপ দিচ্ছে সে ট্রিগারে। নাকি মনের ভুল? চোখ বুজে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করল রানা পাঁচ সেকেন্ড। চোখ খুলে দেখল পিস্তলটা বিমের উপর রেখে সিগারেট টানছে গুস্তভ, আর হাসছে মিটিমিটি। রানার মানসিক যন্ত্রণা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে সে। খেলা করছে সে রানাকে নিয়ে ঠিক শিকারী বিড়াল যেমন খেলে অসহায় ইঁদুরকে নিয়ে। খেলা শেষ হলেই গুলি ছুঁড়বে গুস্তভ, নব্বই ফুট নিচে কংক্রিটের মেঝের উপর আছড়ে পড়ে রানার দেহটা যখন থেঁতলে যাবে. সেটাও একটা চমৎকার দর্শনীয় মজার খেলা হবে।

বিদ্যুৎবেগে ডান হাতটা নেমে এল রানার মাথার উপর থেকে। ঝিক করে উঠল ছুরিটা মাঝ পথে হ্যাজাক-বাতির আলোয়।

বিচিত্র একটা ধ্বনি বেরোল গুস্তভের কণ্ঠ থেকে। চমকে উঠল ওর শরীরটা. তারপর বাঁকা হয়ে গেল পিছনের দিকে। যেন প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। দুই কণ্ঠার হাড়ের ঠিক মাঝখানে নরম মাংসে ঢুকে গেছে ছুরিটা তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে গুস্তভ। উঠে বসল সে আবার সামনের দিকে সামান্য বাঁকা হয়ে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে। টান দিয়ে বের করে ফেলল সে ছুরিটা। মুহূর্তে রক্তে ভেসে গেল শার্টের সামনের দিকটা। গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে অনর্গল। ভয়াবহ রূপ নিল গুস্তভের মুখের চেহারা অসহ্য যন্ত্রণায়। লাল হয়ে গেছে ছুরিটা রক্তে। অবাক হয়ে দেখল সে তার নিজের ছুরিটা। ডান

হাতটা ঘাড়ের পিছনে নিয়ে গেল সে, একটু পিছনে হেলে ছুঁড়তে চেষ্টা করল ছুরিটা। কিন্তু পারল না। রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভিড় করেছে ওর হাতে, ঘড় ঘড় আওয়াজ হচ্ছে ওর গলা দিয়ে, শ্বাস নিতে পারছে না। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ছুরিটা। অনেক নিচে কংক্রিটের ওপর গিয়ে পড়ায় আগুনের ফুলকি দেখা গেল একটা চোখ বুজে আসছে গুস্তভের, কাৎ হয়ে গেল একদিকে, তারপর ঝপাং করে উল্টে গেল ওর দেহটা। পায়ের কব্জিদুটো পরস্পরের সঙ্গে আঁকড়ে থাকায় মাথা নিচু পা উঁচু অবস্থায় বাদুড়ের মত ঝুলে রইল সে কিছুক্ষণ। রানার মনে হলো অনন্তকাল ধরে ঝুলছে গুস্তভ ওখানে। ধীরে ধীরে খুলে গেল পায়ের বন্ধন, পা দুটো আলাদা হয়ে গেল পরস্পর থেকে—অদৃশ্য হয়ে গেল গুস্তভের দেহটা প্রকাণ্ড ইন্দারার আবছা অন্ধকার গর্ভে।

ভয়ে, ক্লান্তিতে, শীতে কাঁপছে রানা থরথর করে। হিপ্ পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে গলায় ঢালল সে। শেষ হয়ে গেল বোতল। বোতলটা নিচে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও কি মনে করে রেখে দিল রানা ওটা বিমের উপর। যতটুকু শব্দ না করে উপায় ছিল না তার বেশি শব্দ করে সতর্ক হয়ে যাবার সুযোগ দিতে চায় না সে কবীর চৌধুরীকে। নিচে কংক্রিটের ওপর কাঁচের বোতল ঝন ঝন করে ভাঙলে হয়তো শব্দটা কবীর চৌধুরীর কানে পৌঁছতেও পারে।

হুইস্কির কল্যাণে উদ্যম ফিরে এল কিছুটা রানার মনে। কিন্তু দেহটা বাগ মানতে চাইছে না কিছুতেই। এই অবস্থায় এক ফুট চওড়া বিমের উপর দিয়ে হেঁটে রাজমিস্ত্রির মইয়ের কাছে পৌঁছানো ওর পক্ষে অসম্ভব। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। বিমের ওপর রাখা পিস্তলটা দেখেই চিনতে পারল সে, ওটা ওরই ওয়ালথার—প্রথমবার বন্দী করার পর কেড়ে নিয়েছিল গুস্তভ ওর কাছ থেকে। অভ্যস্ত হাতে শোলডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সে ওটা। রক্তে ভিজে গেছে বিমের বেশ খানিকটা জায়গা। গুস্তভের তাজা রক্ত। ওর ওপর দিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল রানা, কেমন যেন ঘিন-ঘিন করে উঠল ওর গা-টা।

বেরিয়ে এল রানা বাথরুমের পর্দা সরিয়ে আবার জমাদারের সিঁড়ির নবম প্ল্যাটফর্মের ওপর। বসে পড়ল সে সিঁড়িতে। শরীরটা বইতে বড় কষ্ট হচ্ছে। উত্তেজিত মুহূর্তগুলো পার হয়ে যেতেই আবার পাঁজরের ব্যথাটা খচ্ খচ্ করে বাজছে বুকে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘুম আসছে রানার। খবরদার! আসল কাজই পড়ে রয়েছে তোমার, রানা। আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরো। আর কিছুক্ষণ। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে। একটু সামলে নাও, পারবে তুমি, রানা, একটু সামলে নাও নিজেকে। সাবেরের কথা মনে পড়ল, ও বলত—হুঁ হুঁ বাওয়া, শরীলের নাম মহাশয়, যা সহাইবেন তাহাই সয়। আর ইনাম ছিল কাব্য রসিক। একবার সোহেলের হাত মুচড়ে ধরেছিল সলীল কি একটা ব্যাপারে ঠাট্টা করতে করতে, সোহেল বেচারার একটাই মাত্র হাত, উপায়ান্তর না দেখে কামড়ে দিয়েছিল সে সলীলের হাত। হো হো হেসে উঠেছিল ইনাম। বলেছিল: সোহেলের কাজ সোহেল করেছে, কামড় দিয়েছে গায়ে, তা বলে সোহেলে কামড়ানো কিরে সলীলের শোভা পায়? উহ্, মারছে যেন কে! ও হ্যাঁ, ল্যাংড়া আর দস্যু চ্যাং মারছে রানাকে, মাথা ঘুরছে

রানার, শুয়ে আছে সে মায়া ওয়াং-এর কোলে মাথা রেখে। জড়িয়ে ধরল ওকে ফু-চুং—উহ্, দোস্ত একটু আস্তে ধর, বড় ব্যথা লাগছে বুকে। ব্যথা! আর ঘুম আসছে। চারদিক অন্ধকার। অনীতা শুয়ে আছে নাকি পাশে? কি যেন বলেছিল সে—জীবনে আমার পাশে শোয়ার আর চান্স নাও পেতে পারো। রানার কথা ফলে যায়। খবরদার, অনীতা···অনীতা? সে আবার কে? ওহ্-হো, মনে পড়েছে এবার। আরে দূর, ও ছুঁড়িকে তো ধরে নিয়ে গেছে কবীর চৌধুরী আর গুস্তভ। গুস্তভ! গুস্তভটা কে? কিসের গুস্তভ···

প্রলাপের মত আজেবাজে কি ভাবছে সে! চোখ খুলল রানা। নিজের অজান্তেই শুয়ে পড়েছে সে অপরিসর সিঁড়ির ওপর। উঠে বসল পূর্ণ সচেতন রানা। পরিষ্কার মনে পড়ল ওর সব কথা। কতক্ষণ শুয়ে আছে সে এখানে? কবীর চৌধুরী কি পালিয়ে গেল? দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। খচ্ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

ধীর পায়ে উঠতে আরম্ভ করল রানা। চব্বিশ, তেইশ, বাইশ করে গুনতে গুনতে পাঁচে নেমে এল সিঁড়ির ধাপ। অতি সাবধানে মাথাটা উঁচু করল রানা উপরে। আছে! ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা টুয়েলভ সীটার হেলিকপ্টার। আলো দেখে ল্যান্ড করতে অসুবিধা হয়নি কোনও। হেলিকপ্টারের পাইলট কেবিনে আলো জ্বলছে। মাথা আর কাঁধ দেখা যাচ্ছে পাইলটের, পাশের সীটে বসে আছে কবীর চৌধুরী।

সতর্ক দৃষ্টি বুলাল রানা চারপাশে। আর একটি প্রাণীও নেই ছাদের ওপর। পিস্তলটা দাঁতে কামড়ে ধরে বুকে হেঁটে এগোল রানা। মাথাটা নিচু করে রেখেছে, চার হাত-পায়ে এগোচ্ছে সে কুমীরের মত। হেলিকপ্টারের গায়ের সঙ্গে সেঁটে উঠে দাঁড়াল রানা প্যাসেঞ্জারস্ কেবিনের দরজার সামনে। ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল, তারপর নিঃশব্দ পায়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

ম্লান একটা আলো জ্বলছে প্যাসেঞ্জারস্ কেবিনে। অতি সাবধানে মাথাটা ঢোকাল রানা ভিতরে। ঠিক চার ফুট দূরে চেয়ারের সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় বসে আছে অনীতা রানার দিকে মুখ করে। এক টুকরো কাপড় নেই সারা শরীরে, মাথা ভর্তি উস্কখুস্ক চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অনীতা রানার মুখের দিকে। চিনতে পারল সে রানাকে। মুখে হাতে কালি মেখে ভূত হয়ে এসেছে রানা, কিন্তু মুহূর্তে চিনতে পারল ওকে অনীতা। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। মরেনি তাহলে রানা! ঝট্ করে তর্জনী ঠোঁটে তুলে চুপ করবার ইঙ্গিত করল ওকে রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করে নির্যাতন এবং নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিল অনীতা, এমন সময় রানাকে আশ্চর্যভাবে উপস্থিত হতে দেখে নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না সে।

'রানা! এসেছ তুমি, রানা! আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে, রানা। গুস্তভ···গুস্তভ···' আর বলতে পারল না অনীতা, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কোন কথা না বলে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা অনীতার পাশের একটা সীটে। বাম হাতে অনীতার হাতের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে ওর পাইলট কেবিনের দরজার ওপর। ডান হাতে ধরা পিস্তলটাও।

খুলে গেল কেবিনের দরজা। এগিয়ে আসছে কবীর চৌধুরী। অনীতার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে, কিন্তু কথাগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। ডান হাতে পিস্তল আছে অবশ্য, কিন্তু নলটা নিচের দিকে। কবীর চৌধুরীর ঠিক কপাল বরাবর লক্ষ্য স্থির করল রানা, আরও কয়েক পা এগিয়ে আসবার সুযোগ দিল, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, কবীর চৌধুরী।'

দশ

'রানা!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কবীর চৌধুরী। রক্তশূন্য হয়ে গেছে ওর মুখ। চিনতে পেরেছে সে-ও। 'তুমি···তুমি এখানে এলে কি করে! অসম্ভব···'

'পিস্তলটা ফেলে দাও হাত থেকে। তারপর পিছন ফিরে দাঁড়াও।' আদেশ করল রানা।

'নইলে?'

'নইলে আগামী দশ সেকেন্ডের মধ্যে গুলি করব। দশ সেকেন্ড সময় দিলাম, কবীর চৌধুরী। মৃত্যু অথবা বন্দীত্ব—বেছে নাও যেটা খুশি।'

হাহা করে হাসল কবীর চৌধুরী পাঁচ সেকেন্ড। তারপর বলল, 'গুলি তুমি করতে পারবে না, মাসুদ রানা। আমি জানি আমার বাম হাতের ছোট্ট বোতলটাকে বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পাও তুমি।' বাম হাত খুলে দেখাল কবীর চৌধুরী। নীল প্লাস্টিক সীল করা একটা ভাইরাসের বোতল। কালকূট। 'গুলি তো করবেই না, আমি নাচতে বললে নেচে দেখাবে তুমি এক্ষুণি।' হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর কণ্ঠ। 'পিস্তলটা ফেলে দাও হাত থেকে।'

'না। এবার আর তোমার ফাঁদে পা দেব না আমি, কবীর চৌধুরী।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'যতক্ষণ তোমার কপাল বরাবর ধরা আছে আমার এই পিস্তল ততক্ষণ কিছুই করবার সাহস হবে না তোমার। যেই পিস্তল ফেলে দেব, ওমনি গুলি করবে তুমি আমাকে। আমি জানি, কোন অবস্থাতেই ফাটাবে না তুমি ওই বোতল। আজ সন্ধ্যায় সেকথা জানতাম না আমি, কিন্তু এখন জানি। খেপা লোকের অভিনয় করে তুমি আমার মনেও খানিকটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু এখন পরিষ্কার জানি আমি, মরবার সাহস তোমার নেই। নিজের প্রাণটা তোমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, কোন অবস্থাতেই সেটা বিসর্জন দেয়ার কথা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি।'

'একটা ব্যাপারে ভুল করছ, রানা। প্রয়োজন পড়লে সত্যিই ব্যবহার করব আমি কালকূট। কারণ পৃথিবীর সবাই মারা গেলেও আমি আর অনীতা বেঁচে থাকব। কালকূট কোন ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের। মিথ্যে কথা বলেছিলাম আমি সেদিন তোমাদের। আসলে কালকূটের বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার করেছিলেন

ডক্টর শরীফ এক সপ্তাহ আগে। সবটুকু ভ্যাকসিন আমি চুরি করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমার আর অনীতার শরীরে রয়েছে সেই প্রতিষেধক। যদি সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, আমরা দু'জন হব আগামী পৃথিবীর অ্যাডাম অ্যান্ড ঈভ। ইচ্ছে করলে অনীতার হাতে টিকার দাগ দেখতে পারো।'

'এবং সেই ফাঁকে তুমি আমার বুকের মধ্যে গোটা দুয়েক বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারো।'

'তোমার যা খুশি ভাবতে পারো। আমার কথা বিশ্বাস করলে করো, ইচ্ছে করলে না করো। কিন্তু শেষ বারের মত বলছি…'

হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে কান খাড়া করল কবীর চৌধুরী। দ্বিতীয় বারের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। 'কিসের শব্দ! কিসের শব্দ ওটা!'

রানাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কেন, বোঝা যাচ্ছে না? আমার তো মনে হলো ওটা Merlin Mark 2 মেশিন কারবাইনের শব্দ। তোমার কি মনে হয়?'

'মেশিন কারবাইন! কি বলছ তুমি!'

'বলছি, তোমার সব ক'টা চ্যালাকে বন্দী করা হচ্ছে এখন। হয়তো কেউ বোকামি করে বাধা দিয়েছিল—কপাল খারাপ তার। খবরদার!'

উত্তেজনার বশে এক পা এগিয়ে এসেছিল কবীর চৌধুরী, থমকে দাঁড়াল। 'বন্দী করা হচ্ছে! কাকে বন্দী করা হচ্ছে?'

'তোমার সমস্ত অক্সি-অ্যাসেটিলিন, নাইট্রো-গ্লিসারিন আর কম্বিনেশন এক্সপার্টদের। যাদের জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি দশ তলার ছাতে বসে। এত সহজে ভুলে গেলে ওদের কথা?'

'জানো তাহলে তোমরা সব!'—ফ্যাসফেঁসে অস্ফুট কণ্ঠে বলল কবীর চৌধুরী।

'জানি। প্রথম দিকে বোকা বানিয়েছিলে তুমি আমাদের। বার বার রিসার্চ সেন্টার ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ, পতেঙ্গায় ডেমোনস্ট্রেশন ইত্যাদি দেখে সবার ধারণা হয়েছিল এটা নিশ্চয়ই কোন খেপা লোকের কাজ। লোকটা জানে না যে বট্যুলিনাস টক্সিন ভেবে যে বোতলগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে সে, তার মধ্যে তিনটে বোতলে আছে গোটা পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাস কালকূট—একথা ভেবে শুধু আমাদেরই নয়, পিলে চমকে গিয়েছিল পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের। এ ব্যাপারে তোমার প্রশংসাই করতে হয়। সবাই মনে করেছে আজ রাত বারোটায় মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া আর জিন্না এভিনিউ-এ আরেকটা ভাইরাসের বোতল ফাটানো হচ্ছে খেপা লোকটার আদেশ মাফিক রিসার্চ সেন্টারটা ধ্বংস করে দেয়া হয়নি বলে। সবই ঠিক ছিল প্ল্যান অনুযায়ী, শুধু আমার মত এক-আধজন পাজি লোক সন্দেহ করে বসল যে এই সমস্ত হুমকি এবং ডেমোনস্ট্রেশনের পিছনে খেপা লোকটার কেবল একটি মাত্রই উদ্দেশ্য আছে—সেটা হচ্ছে একটা বিশেষ দিনে এই বিশেষ এলাকা থেকে সমস্ত মানুষকে অপসারণ করা। সম্পূর্ণ ফাঁকা, জনশূন্য করতে চেয়েছিলে তুমি এই এলাকাটাকে,

কবীর চৌধুরী।' হাসল রানা। 'কারণ ঢাকার সব ক'টা বড় বড় ব্যাঙই রয়েছে এই এলাকার মধ্যে। কোটি কোটি টাকার দেশী বিদেশী কারেন্সী, সোনা আর সেফ ডিপোজিট থেকে জুয়েলারী ছিনিয়ে নেয়ার প্ল্যান ছিল তোমার আজ রাতে। ভাইরাসের ভয়ে একটি লোকও থাকবে না এই অঞ্চলে—ভেবেছিলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে তোমার দলবল। যদি গোপন কোনও অটোমেটিক অ্যালার্মের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সিগন্যাল পেয়ে ছুটে আসতে পারে পুলিস, সেই ভয়ে এই এলাকায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল তোমাকে। এবার বুঝতে পারছ, আমরা সবকিছু জানি কিনা?'

বুঝতে পেরেছে কবীর চৌধুরী। বিকৃত রূপ ধারণ করেছে ওর চোখ মুখ তীব্র ঘৃণা আর প্রতিহিংসায়।

বলেই চলল রানা। 'পাকিস্তান এয়ার লাইনসের এই পাইলটকে জবরদস্তি ধরে আনা হয়েছে, পিস্তল দেখিয়ে ল্যান্ড করতে বাধ্য করা হয়েছে এই বাড়ির ছাতে। রাত একটার মধ্যে সবার এখানে পৌঁছে যাবার কথা। সমস্ত লুঠের মাল এই হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে মনে করেছিলে পার হয়ে যাবে পাকিস্তান বর্ডার। সোমবারের আগে কেউ টেরই পাবে না কতবড় ডাকাতী হয়ে গেছে ঢাকার বুকে—যখন জানতে পারবে তখন নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে মুচকি হাসছ আর গোঁপে তা দিচ্ছ তুমি। বাহ্, চমৎকার প্ল্যান! কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তানে আমার মত দু'চারজন হারামী লোক আছে যারা তোমার মত নিরীহ লোকের সুখ সহ্য করতে পারে না, ঈর্ষায় মরে যায়, আদা-নুন-জল খেয়ে পিছনে লাগে।'

'ধরা পড়েছে ওরা?' প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী।

'তোমার দুইশো লোকের প্রত্যেকে ধরা পড়েছে। রাত এগারোটায় সময় পুরো এলাকাটায় ছড়িয়ে পড়েছে Merlin সাব-মেশিনগান হাতে পাঁচশো হাইলি ট্রেইন্ড স্পেশাল কমান্ডো ফাইটার। কেউ বাধা দিলেই খতম করে দেয়ার আদেশ আছে ওদের ওপর। কিছুক্ষণ আগে যে শব্দটা শুনলে, কেউ হয়তো বাধা দিয়েছিল, শেষ হয়ে গেল সে।'

কেবিনের ম্লান আলোয় জ্বল জ্বল করছে কবীর চৌধুরীর কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগানো চোখ। সর্ব শরীর থর থর করে কাঁপছে উত্তেজনায়। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে সব আশা-ভরসা নিঃশেষ হয়েছে ওর। বেপরোয়া একটা ভঙ্গি ফুটে উঠল ওর চেহারায়।

মৃদু হাসল রানা। 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আত্মসমর্পণ করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ?'

'না!' উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল কবীর চৌধুরী। 'শেষ চেষ্টা করে দেখব আমি।' চট করে চাইল সে একবার প্যাসেঞ্জার্স্ কেবিনের খোলা দরজার দিকে। চাপা কর্কশ স্বরে আদেশ করল সে রানাকে, 'বন্ধ করো। বন্ধ করো ওই দরজা। নইলে ফাটিয়ে দেব আমি এই বোতল!' বাম হাতটা মাথার উপর তুলে এগিয়ে এল সে আরও দুই পা। মাতালের মত টলছে।

রানা বুঝল, জীবনের চরম সাফল্যের মুখে এসে সবকিছু ভেস্তে যাওয়ায়

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে কবীর চৌধুরীর। এখন করতে পারে না সে এমন কাজ নেই। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে কালকূটের বোতল ফাটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। পিছু হেঁটে দরজার কাছে চলে এল রানা, কিন্তু তার চোখ এবং পিস্তল স্থির রইল কবীর চৌধুরীর দিকে। টান দিয়ে স্লাইডিং ডোরটা বন্ধ করে দিল সে।

আরও একপা এগিয়ে এল কবীর চৌধুরী। 'এবার তোমার পিস্তল, রানা! ফেলে দাও ওটা।'

'অসম্ভব!' বলল রানা। কিন্তু তেমন জোর পেল না গলায়। সত্যিই কি খেপে উঠেছে, নাকি অভিনয় করছে কবীর চৌধুরী? বলল, 'পিস্তল ফেলে দিলেই পালিয়ে যাবে তুমি আমাদের দুইজনকে শেষ করে দিয়ে। যতক্ষণ আমার হাতে এই যন্ত্রটা আছে ততক্ষণ পালাবার কোন উপায় নেই তোমার, কবীর চৌধুরী। কালকূটের আক্রমণে আমার মৃত্যুর অনেক আগেই মৃত্যু ঘটবে তোমার গুলি খেয়ে। পিস্তল ফেলছি না আমি।'

আরও এক পা এগিয়ে এল কবীর চৌধুরী। তারপর প্রচণ্ড জোরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'পিস্তল! ফেলো এক্ষুণি!'

মাথা নাড়ল রানা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কি যেন চিৎকার করে উঠল কবীর চৌধুরী, তারপর মাথার উপর থেকে দ্রুতবেগে নেমে আসতে আরম্ভ করল ওর বাম হাত। দপ্ করে নিভে গেল কেবিনের ম্লান আলো। এতক্ষণ লক্ষ করেনি রানা, এক পা এক পা করে ঠিক বাতিটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল কবীর চৌধুরী। অন্ধকার হয়ে গেল কেবিনটা, শুধু দুই ঝলক হলুদ আলো দেখা গেল রানার পিস্তলের মুখে। প্রচণ্ড শব্দ গম গম করে উঠল বন্ধ কেবিনের ভিতর। ককিয়ে উঠল অনীতা। পর মুহূর্তে ভেসে এল কবীর চৌধুরীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'অনীতার ঘাড়ের উপর ঠেসে ধরা আছে আমার পিস্তল। তিন সেকেন্ড পর ট্রিগার টিপব আমি।'

ঠক্ করে শব্দ তুলে মেঝের উপর পড়ল রানার পিস্তল।

'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে, কবীর চৌধুরী।'

'দরজার বাম পাশে সুইচ আছে, টিপে দাও ওটা।'

সুইচটা খুঁজে পেয়ে টিপে দিল রানা—উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পুরো কেবিনটা। অনীতার পিছনের সীটে বসে আছে কবীর চৌধুরী। আলো নিভিয়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গিয়েছিল সে। অনীতার ঘাড়ের উপর থেকে পিস্তলের মুখটা সরিয়ে রানার বুকের দিকে তাক করল সে এবার। বাম হাতে তেমনি ধরা রয়েছে কালকূট।

'পিছনে সরে যাও। পিস্তল থেকে যতটা সম্ভব দূরে।'

পিছিয়ে গেল রানা। এগিয়ে এসে তুলে নিল কবীর চৌধুরী রানার পিস্তলটা। পকেটে রেখে দিয়েছে সে কালকূটের বোতল। দুই হাতে দুই পিস্তল নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে এবার। 'চলে এসো। পাইলটের কেবিনে।'

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে পাইলট তার সীটে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। রানা

লক্ষ করল কপালের একপাশ উঁচু হয়ে ফুলে আছে পাইলটের। ডান গালে বিচ্ছিরি একটা ক্ষতচিহ্ন, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে।

'বসে পড়ো কো-পাইলটের সীটে।' হুকুম করল কবীর চৌধুরী। 'হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও ওর।'

নীরবে আদেশ পালন করল রানা। পিস্তলের নল দিয়ে টোকা মারল কবীর চৌধুরী পাইলটের মাথায়। তারপর আদেশ করল, 'আকাশে তুলে ফেলো হেলিকপ্টার।'

'আকাশে?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা কবীর চৌধুরীর মুখের দিকে। 'তোমার ডাকাতি করা একশো সাত রাজার ধন ফেলেই পালাবে?'

'যা করব তা দেখতেই পাবে। বাজে কথা বলে বিরক্ত কোরো না, রানা।'

গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে পাইলট। আদেশ পালনের কোন রকম আগ্রহই দেখা গেল না তার মধ্যে। আর একটা টোকা দিল কবীর চৌধুরী ঠিক একই জায়গায়। Merlin সাব-মেশিনগানের মত একটানা অবিশ্রাম ত্রিশ সেকেন্ড অকথ্য গালিবর্ষণ করল পাইলট ইংরেজী-বাংলা-উর্দু মিশিয়ে। তৃতীয়বার টোকা দেয়ার জন্যে কবীর চৌধুরীর পিস্তলটা উঁচু হতেই গজর গজর করতে করতে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া আরম্ভ করল সে। স্টার্ট দিল হেলিকপ্টারে। রোটর ব্রেক ছেড়ে দিয়ে পিচ-কনট্রোলের থ্রটল ঘোরাল। রোটর স্পীড ইনডিকেটারের কাঁটা দুইশোতে পৌঁছতেই হুইল ব্রেক ছেড়ে দিয়ে পিচ-লিভারটা উপরে টেনে আরও খানিকটা ঘুরাল থ্রটল। কেঁপে উঠল হেলিকপ্টার। উইন্ডস্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে বার বার চারপাশে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ফেলছিল কবীর চৌধুরী। হেলিকপ্টার শূন্যে উঠে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন সে। ভয়ঙ্কর একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

বাম হাতের পিস্তলটা কোমরে গুঁজে মাথার ওপরের একটা র‍্যাক থেকে একটা ছোট স্টীলের বাক্স উঠিয়ে রানার হাতে দিল কবীর চৌধুরী। এবার একটা চামড়ার ছোট্ট ব্যাগ পেড়ে আনল সে একই জায়গা থেকে। সেটাও বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'বাক্সের জিনিসগুলো ওই ব্যাগটার মধ্যে সাজিয়ে রাখো সাবধানে। বাক্সটা খুললেই বুঝতে পারবে কেন সাবধান হতে বলছি।'

বাক্সটা খুলতেই ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। খড়ের মধ্যে সাজানো আছে কয়েকটা ভাইরাসের বোতল। দুটো বোতলের মাথায় নীল প্লাস্টিক সীল—অর্থাৎ কালকূট; আর তিনটের মাথায় লাল প্লাস্টিক সীল—ওগুলো বটুলিনাস টক্সিন। অতি সাবধানে একটা একটা করে সাজিয়ে রাখল রানা ওগুলো স্টীল রডের লাইনিং দেয়া চামড়ার ব্যাগের মধ্যে। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা তুলো মোড়া ঘর আছে ব্যাগের মধ্যে। আরেকটা কালকূটের বোতল বের করে রানার হাতে দিল কবীর চৌধুরী। মোট হলো ছয়টা। এই সামান্য কাজটুকু করতেই ঘেমে উঠেছে রানা—ঘাম মুছল কপালের। অনুভব করল, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পাইলট বোতলগুলোর দিকে। বুঝল, এর মাহাত্ম্য জানা আছে পাইলটের। ফিরিয়ে দিল ব্যাগটা রানা কবীর চৌধুরীর হাতে।

'চমৎকার!' ব্যাগটা নিয়ে হাত বাড়িয়ে প্যাসেঞ্জারস্ কেবিনের একটা সীটের ওপর রাখল কবীর চৌধুরী। তারপর কোমরে গোঁজা পিস্তলটা আবার হাতে নিল। 'এবার তোমাকে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে হবে।'

'নিয়ে এসো তাঁকে, বলছি।'

'নিয়ে আসতে হবে না, রানা, এখানে বসেই দিব্যি আলাপ করতে পারবে তার সঙ্গে। অয়্যারলেসের মাধ্যমে।' পাইলটের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে চক্কর দিতে থাকো তুমি। অন্ধকার এলাকার বাইরে যাবে না। খানিক পরেই নেমে আসব আমরা আবার এই ছাদের ওপর।'

'আমি অয়্যারলেস অপারেট করতে পারি না।' বলল রানা।

'পারো। হয়তো ভুলে গেছ, কিন্তু মনে পড়ে যাবে এক্ষুণি। এত বছর ধরে যে লোক স্পাইং করছে, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুঃসাহসিক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে, তার পক্ষে অয়্যারলেস অপারেট না করতে পারাই তো স্বাভাবিক—তাই না? ঠিক আছে, এক মিনিট সময় দেয়া যাচ্ছে, মনে করবার চেষ্টা করো। যদি বলো যে প্যাসেঞ্জারস্ কেবিন থেকে একটা নারী কণ্ঠের আর্তনাদ না শুনতে পেলে কিছুই তোমার মনে পড়বে না, তাহলে সে ব্যবস্থাও করতে পারি।'

'কি বলতে হবে মেজর জেনারেলকে?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই তো, বেশ, পথে এসে গেছ। প্রশংসা না করে পারছি না, সাধারণ একজন আর্টস গ্র্যাজুয়েটের তুলনায় তোমার মাথাটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার, মাসুদ রানা। যাক, মেজর জেনারেলকে জানাতে হবে যদি এই মুহূর্তে আমার সমস্ত লোককে চোরাই মাল সহ মুক্তি না দেয়া হয় তাহলে বটুলিনাস টক্সিন ফেলব আমি ঢাকার ওপর। কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় না, যে-কোনখানে। তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে কালকূট ফেলতে বাধ্য হব আমি। কেবল মুক্তি দিলেই চলবে না, সমস্ত পুলিস এবং মিলিটারি সরিয়ে নিতে হবে নিচের এই এলাকা থেকে। এদের কাজে কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলেই বিনা দ্বিধায় ভাইরাস ফেলব আমি আকাশ থেকে। বুঝেছ?'

উত্তর দিল না রানা বেশ কিছুক্ষণ। উইন্ডস্ক্রীন ওয়াইপার পেরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলল, 'বুঝেছি।'

'বেপরোয়া লোক আমি, রানা। প্রয়োজন হলে পশুর মত হিংস্র হয়ে উঠতে পারি। এত দিনের এত সাধনার পর আজ আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম শিখরে আরোহণের শেষ সুযোগ আমি কোন মূল্যেই হারাতে পারি না। ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা ধন-দৌলত আমাকে সেই চরম সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে মাত্র—এগুলো আমার আসল লক্ষ্য নয়। আসলে সমস্ত পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায় নিয়ে আসব আমি কালকূটের ভয় দেখিয়ে। আমার ইচ্ছেমত চলবে পৃথিবী। কল্পনা করতে পারো? আই শ্যাল বি দ্য ওনলি মোনার্ক অভ দিস ওয়ার্লড! আ মোনার্ক! যদি এই লক্ষ্য অর্জন করতে না পারি, পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিতে আমার কিছু মাত্র দ্বিধা হবে না। বিশ্বাস করো এ কথা?'

'করি। তোমার মত পিশাচের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'কাজেই মেজর জেনারেলের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে তোমাকে।'

'চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অন্য কারও বিশ্বাসের ওপর গ্যারান্টি দিতে পারি না।'

'পারলেই মঙ্গল হবে তোমাদের। নইলে আমি আর অনীতা একা হয়ে যাব এই পৃথিবীতে। কালকূট ফাটিয়ে দিলেও বেঁচে থাকব আমরা—অ্যাডাম অ্যান্ড ঈভ। কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ অনুভব করছি আমি. এই বিশাল পৃথিবীতে আমি আর অনীতা। একা! ঢেউ উঠছে বিশাল সাগরে, তুফান উঠছে অরণ্য কাঁপিয়ে—কেউ নেই। শুধু এক পুরুষ, আর এক নারী। মানুষ সৃষ্টি করব আমরা আগামী পৃথিবীর জন্যে...'

তিক্ত হাসি হাসল রানা। 'মানুষগুলো যদি সব ক'টা মেয়ে হয়?'

'তাহলে তাদের গর্ভে ছেলে হবে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল রানার হাসি উত্তর শুনে। উন্মাদ ছাড়া আর কোন টাইটেল দেয়া যায় না লোকটাকে। দুর্দান্ত প্রতিভাধর এক উন্মাদ।

কয়েক মিনিট নাড়াচাড়ার পর ওয়েভ-লেংথ ঠিক করে নিয়ে সিগন্যাল দিল রানা পি. সি. আই. হেড অফিসে। বলল, 'রানা স্পীকিং। আর্জেন্ট, ইম্পরট্যান্ট মেসেজ ফর দ্য চীফ। মে আই গেট হিম?'

তিন সেকেন্ড পর স্বয়ং মেজর জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল এয়ার ফোনে।

'কোথা থেকে বলছ তুমি, রানা?'

'হেলিকপ্টার থেকে। কবীর চৌধুরী, অনীতা, ক্যাপ্টেন...' পাইলটের দিকে চাইল রানা।

'ইসলাম।' রুক্ষ কণ্ঠে বলল পাইলট।

'ক্যাপ্টেন ইসলাম আর আমি আছি এই হেলিকপ্টারে। হেরে গেছি আমি, স্যার। দুই হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী। একটা মেসেজ আছে ওর।'

'হেরে গেছ!' অস্ফুট আবছা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ এই দুটো শব্দ। অসহায় একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে। 'পারলে না, রানা?'

'না, স্যার, পারলাম না। মেসেজটা বলছি, স্যার।' গড় গড় করে বলে গেল রানা কবীর চৌধুরীর বক্তব্য এবং হুমকি।

'ধোঁকা দিচ্ছে না তো?'

'না, স্যার। এ ব্যাপারে ও বদ্ধ পরিকর। লক্ষ্য অর্জন করতে না পারলে পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিতেও দ্বিধা করবে না ও। ঢাকা শহরের এগারো লক্ষ মানুষের জীবন নির্ভর করছে এখন আপনার সিদ্ধান্তের ওপর।'

'ভয় পেয়েছ তুমি, রানা।' কোমল কণ্ঠে বললেন মেজর জেনারেল।

'জ্বি, স্যার, ভয় পেয়েছি। কিন্তু ভয়টা কেবল নিজের জন্যেই নয়।'

'বুঝলাম। কয়েক মিনিট পরে কল করছি আবার।'

এয়ার ফোনটা কান থেকে সরিয়ে কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে বলল রানা, 'উনি এক্ষুণি কোন জবাব দিতে পারছেন না। সিদ্ধান্ত নেবার আগে দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করতে হবে ওঁকে।'

'তা তো হবেই।' মাথা ঝাঁকাল কবীর চৌধুরী। প্যাসেঞ্জারস্ কেবিনে যাবার খোলা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে এখন। মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি। কিন্তু পিস্তল দুটো স্থির, নিষ্কম্প। আলাপের ফল কি দাঁড়াবে জানা আছে তার। 'কয়েক মিনিটে এমন কিছুই এসে যাবে না। আমার প্রস্তাবে রাজি হতেই হবে ওদের।'

রানাও জানে, কবীর চৌধুরীকে ঠেকাবার উপায় নেই, রাজি হতেই হবে ওর প্রস্তাবে। কবীর চৌধুরীর জয় আজ সুনিশ্চিত। শুধু···ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে যেন সে! কিন্তু একি সম্ভব? চেষ্টা করে দেখবে সে একবার?

খড়খড় করে উঠল হাতে ধরা এয়ার ফোনটা। চট্ করে কানে লাগাল রানা ওটা। মেজর জেনারেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কোন রকম ভণিতা না করে বললেন উনি, 'কবীর চৌধুরীকে বলে দাও, রানা, রাজি আছি আমরা।'

'জ্বি, স্যার। এ সবকিছুর জন্যে আমি দুঃখিত, স্যার।' বলল রানা।

'তোমার সাধ্যমত তুমি করেছ। দোষ তোমার নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার চাইতে নিরীহ জনসাধারণকে রক্ষা করাই আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য।'

পিস্তলের নল দিয়ে টোকা দিল কবীর চৌধুরী রানার মাথায়। 'কি ব্যাপার? কি বলছে ব্যাটা?'

'রাজি আছেন।' বলল রানা সামলে নিয়ে।

'গুড। চমৎকার। এবার জিজ্ঞেস করো কতক্ষণ লাগবে আমার লোকজন আর টাকা পয়সা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা থেকে পুলিস আর মিলিটারি সরিয়ে নিতে।'

জিজ্ঞেস করবার আগেই উত্তর দিলেন রাহাত খান, 'আধ ঘণ্টা।' কবীর চৌধুরীর কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন তিনি। রানা জানাল ওকে উত্তরটা।

'ঠিক আছে। অয়্যারলেসের সুইচ অফ করে দাও। আধঘণ্টা আকাশে উড়ে বেড়াব আমরা, তারপর নামব আবার সেই বাড়িটার ছাতে।' আবার দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে। 'দেরি হয়ে গেল আধঘণ্টা, ঠিক আছে, এমন কিছুই অসুবিধে হবে না এতে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, রানা কি আনন্দ হচ্ছে এখন আমার। সর্বশক্তিমান মনে হচ্ছে নিজেকে। আজ রাত আমার জয়ের রাত।'

'এবং আমার পরাজয়ের।' তিক্ত, ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল রানা।

'ঠিক বলেছ। আমার জয় আরও মহিমা মণ্ডিত হয়েছে তোমার মত একজন ধূর্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে পেরে। আনন্দ রাখবার জায়গা নেই আজ আমার। উপায় থাকলে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিতাম আমি তোমাকে।'

'আপাতত একটা সিগারেট দিলে অর্ধেক রাজত্ব না পাওয়ার শোকটা ভুলতে পারি। আপত্তি আছে?'

'মোটেই না। কোন আপত্তি নেই।' বাম হাতের পিস্তলটা কোটের পকেটে রেখে এক প্যাকেট পলমল আর একটা ম্যাচ ছুঁড়ে দিল সে রানার কোলে। সিগারেট ধরিয়ে ফেরত দিল ওগুলো রানা, তারপর বাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আধ মিনিটের মধ্যেই প্রথম কথা পাড়বার সুযোগ এসে গেল। অপেক্ষাকৃত গরম বাতাসের উর্ধ্বমুখী স্রোত পেয়ে খানিকটা কেঁপে উঠল হেলিকপ্টারটা, উঠে গেল বেশ খানিকটা উপরে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা কবীর চৌধুরীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে। 'বসে পড়ছ না কেন কোথাও? আর দাঁড়িয়ে থাকতে হলে একটা কিছু ধরে দাঁড়াও। হেলিকপ্টারটা হঠাৎ কোন এয়ার পকেটে পড়লেই টাল সামলাতে না পেরে ওই ব্যাগের ওপর পড়ে এক আধটা বোতল ভেঙে ফেলবে তুমি দেখতে পাচ্ছি।'

'নিশ্চিন্তে থাকো তুমি, ঘাবড়িয়ো না।' বলল কবীর চৌধুরী মৃদু হেসে। দরজার গায়ে আরেকটু হেলে দাঁড়াল সে আরাম করে। দুই হাতে দুই পিস্তল। 'এ রকম ওয়েদারে এয়ার পকেট থাকে না। আমি যখন লেভিটেটেড এয়ারক্রাফট তৈরির স্বপ্ন দেখছিলাম, তখন এ সম্পর্কে কিছু পড়াশুনো করতে হয়েছিল আমাকে। এই ধরনের ওয়েদার...'

একটি কথাও ঢুকছে না রানার কানে। আড়চোখে চেয়ে আছে সে ক্যাপ্টেন ইসলামের দিকে। ঘাড়টা কিছুমাত্র না নেড়ে তেরছা চোখে চাইল ইসলাম রানার দিকে। পিছন থেকে টের পেল না কবীর চৌধুরী। ডান চোখটা টিপল একবার ক্যাপ্টেন ইসলাম। রানা ভাবল, ও বাবা, এ দেখছি কড়া ইস্তিরী দেয়া চালু মাল। ইশারাই কাফি। যন্ত্রপাতি থেকে ডান হাতটা সরিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নিজের উরুর উপর রাখল ক্যাপ্টেন। যেন উরুর উপর আনমনে হাত বুলাচ্ছে এমনি ভাবে আঙুলগুলো সোজা রেখে এগিয়ে নিয়ে গেল সে হাতটা হাঁটুর কাছে, হাঁটু পেরিয়েই ঝপ্ করে আঙুলগুলো নেমে গেল নিচু দিকে।

রানার পক্ষেও ইশারাই কাফি। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আনমনে মাথা নাড়ল সে দুইবার। জয়ের উল্লাসে এসব কিছুই লক্ষ করল না কবীর চৌধুরী, বক্তব্য শেষ করল 'কাজেই ভয় নেই তোমার, রানা' দিয়ে।

'ঠিক আছে।' জবাব দিল রানা। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে এবার। 'অনীতার ওই অবস্থা করেছে কে, কবীর চৌধুরী? তুমি?'

'গুস্তভ। ও একটা আস্ত জানোয়ার। বহু রকম জীবজন্তু-জানোয়ারের গল্প তোমাকে শোনাতে পারি আমি, রানা। অদ্ভুত সব বিচিত্র প্রাণী। মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান জন্তু আছে এই পৃথিবীতে, এমন মশা আছে যারা কোনদিন কামড়ায় না, ভেন্ট্রিলোকুইস্ট পোকা আছে, খাড়া অবস্থায় সাঁতার কাটে এমন মাছ আছে, এমন পাখি আছে যারা পিছন দিকে ওড়ে, লোমশ জন্তু আছে যারা ডিম পাড়ে, এমন জানোয়ার আছে যাদের পাকস্থলী ছয়টা, এমন প্রাণী আছে যারা কান দিয়ে কথা বলে। কিন্তু গুস্তভের মত এমন বিচিত্র আর ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর হয় না। জার্মেনীর...'

নড়ে উঠল ক্যাপ্টেন ইসলামের ঠোঁট নিঃশব্দে। রানা বুঝল, নীরবে যে কথাটা

বলতে চাইছে ইসলাম, সেটা হচ্ছে 'রেডি'। প্রস্তুত হলো রানা, আরেকবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সে। পরমুহূর্তেই ঝপ্ করে নিচু হয়ে গেল হেলিকপ্টারের মাথা। আচমকা ডাইভ দিল নিচের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে কবীর চৌধুরী রানার ঘাড়ে।

ঝট্ করে ঘুরে উঠে দাঁড়াতে গেল রানা, তার আগেই এসে পড়ল কবীর চৌধুরী। ঠিক জায়গা মত পড়ল না রানার ঘুসিটা, একটু উঁচু হয়ে পাঁজরের ওপর পড়ল। 'হুঁক' করে উঠল কবীর চৌধুরী প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে। দুই হাতের পিস্তল ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল আর উইন্ডস্ক্রীনের ওপর।

বুঝে ফেলেছে কবীর চৌধুরী ব্যাপারটা। দমাদম মেরে চলল সে রানাকে। হিংস্র উন্মত্ত জানোয়ার হয়ে উঠেছে সে হাত-পা-কনুই-হাঁটু-দাঁত সব ব্যবহার করছে সে। মাঝে মাঝে আহত জানোয়ারের মত গর্জন করছে। বৃষ্টির মত বর্ষণ করছে সে কিল-ঘুসি, রানার প্রবল প্রতি-আক্রমণ গ্রাহ্যই করছে না। কল্পনাও করতে পারেনি রানা, এমন ভয়ঙ্কর অসুরের শক্তি থাকতে পারে কবীর চৌধুরীর হাড্ডি সর্বস্ব শরীরে। নাক-মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে রানার—ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসছে শরীর। হঠাৎ থেমে গেল কিল-ঘুসি, পাইলট কেবিন থেকে বেরিয়ে গেছে কবীর চৌধুরী।

পিছন পিছন ধাওয়া করল রানা। এখনও ডাইভ দিয়ে নিচের দিকে চলেছে হেলিকপ্টারটা, পিছন দিকটা উঁচু। সীট ধরে ধরে এগিয়ে চলেছে কবীর চৌধুরী পিছন দিকে বহু কষ্টে। মাধ্যাকর্ষণ নিচের দিকে টানছে ওকে। তাছাড়া মাত্র একটা হাত ব্যবহার করতে পারছে সে—অপর হাতে ধরা আছে ভাইরাস ভর্তি চামড়ার ব্যাগটা। প্যাসেঞ্জারস্ কেবিনের মাঝামাঝি চলে গেছে সে। নিশ্চয়ই বাইরের দরজাটা খোলার চেষ্টা করবে সে এখন। বুঝে নিয়েছে সে হেলিকপ্টারের ভিতর এখন আর ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। এই হুমকিতে এখন আর কাজ হবে না। কারণ, ভাইরাসের আক্রমণে রানা এবং পাইলটের মৃত্যু যদিও বা হয়, কবীর চৌধুরীরও অব্যাহতি নেই। পাইলটবিহীন হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ করলে মৃত্যু ঘটছে তারও। কাজেই ভাইরাসের বোতল নিচে ছুঁড়ে ফেলার হুমকি দেখাবে সে এবার।

কবীর চৌধুরী যখন দরজার কাছে, রানা পৌঁছে গেছে কেবিনের মাঝামাঝি। দরজা খোলার চেষ্টা করছে কবীর চৌধুরী। হেলিকপ্টারের মাথাটা নিচু হয়ে থাকায় অসম্ভব জোর লাগছে স্লাইডিং-ডোরটা ধাক্কা দিয়ে খুলতে। ছয় ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। এমনি সময় সোজা হয়ে গেল আবার হেলিকপ্টারটা। ঝটাং করে খুলে গেল দরজাটা, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল কবীর চৌধুরী। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর উপর।

রানার একমাত্র লক্ষ্য কবীর চৌধুরী নয়, ভাইরাসের ব্যাগটা। দড়াম করে নাকের উপর একটা ঘুসি মেরেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল ব্যাগটা রানা। ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে কবীর চৌধুরী, দুটো হাতই ব্যবহার করতে আরম্ভ করল সে। রানার একহাত বন্ধ। কবীর চৌধুরীর প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না

সে।

নীরবে মেরে চলেছে কবীর চৌধুরী। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে ওর, দাঁতে দাঁত চাপা। হিংস্র জানোয়ার সে এখন। নিঃশ্বাস বইছে প্রবল বেগে। মার খেতে খেতে পিছিয়ে আসছে রানা। হঠাৎ লম্বা দুই হাতে গলা টিপে ধরে ঠেলে পিছনে নিয়ে চলল রানাকে কবীর চৌধুরী। ডান পাটা কেবিনের দেয়ালে ঠেকিয়ে জোর পাওয়ার জন্যে পিছনে সরাল রানা। হতবাক হয়ে দেখছিল অনীতা ওদের উন্মত্ত যুদ্ধ, সংবিৎ ফিরে পেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। কি যেন বলল সে চিৎকার করে, বুঝতে পারল না রানা। চোখে দেখতে পাচ্ছে না ও, কানেও শুনতে পাচ্ছে না ভাল মত।

ফাঁকা! কিছুই ঠেকল না পায়ে। রানার পিছনে কেবিনের দেয়াল নেই, আছে উন্মুক্ত দরজা। দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বাঁচবার চেষ্টা করল রানা। দুই কনুই আটকাল দরজার দুই পাশে। গলা টিপে ধরে ধাক্কা দিচ্ছে কবীর চৌধুরী, দরজার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ডান পাটা ভেতরে নিয়ে আসবার আগেই প্রচণ্ড এক লাথি মারল সে রানার বাম পায়ে। দুটো পা-ই বেরিয়ে গেল রানার বাইরে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে কেবিনের মেঝের উপর। নাক-মুখ-কপাল ঠুকে গেল মেঝেতে জোরে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ব্যথা লাগল বুকের ভাঙা পাঁজরে। অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল রানা। কনুইয়ের কাছে ছড়ে গেছে হাতের চামড়া, কিন্তু হাত দুটো ছড়ানোই আছে এখনও, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত কোন রকমে আটকে আছে হেলিকপ্টারের ভিতর—নিচের অংশ ঝুলছে শূন্যে। বৃষ্টিতে ভিজছে দেহের নিচের অংশ।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে রানা, অন্ধকার হয়ে আসছে চোখ, কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে আর। বাম পা-টা রানার কাঁধে ঠেকিয়ে ঠেলা দিচ্ছে কবীর চৌধুরী, ধীরে ধীরে একটু একটু করে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে রানার দেহের উপরের অংশ। হাত দুটো ভাঁজ হয়ে আসছে ক্রমেই।

কাঁধের উপর চাপটা কমে গেল হঠাৎ। চোখ মেলল রানা। আবছা ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে সব কিছুই। রানার মনে হলো দুইটা নগ্ন অনীতা, দুইজন কবীর চৌধুরীকে পাগলের মত এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি মারছে। কবীর চৌধুরীর চুল ধরে ঝুলে পড়েছে অনীতা, উন্মাদিনীর মত কি যেন চিৎকার করে বলছে সে রানাকে। আবছাভাবে কানে এল রানার, অনীতা বলছে, 'উঠে পড়ো, রানা, জলদি উঠে পড়ো। পারছি না আর, বাঁচাও আমাকে, রানা।'

অনীতার নগ্ন পিঠ দেখতে পাচ্ছে রানা, এক পা দুই পা করে পিছিয়ে আসছে সে খোলা দরজার দিকে। পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল রানা। খোলা দরজা দিয়ে অনীতাকে নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে কবীর চৌধুরী। উপরে উঠে আসবার চেষ্টা করল রানা। বেকায়দা অবস্থায় ঝুলে থাকায় শক্তি পাচ্ছে না সে। বাম হাতে আঁকড়ে ধরা চামড়ার ব্যাগটা আলগোছে নামিয়ে রেখে দুই হাতে ধরল এবার সে খোলা দরজার দুই পাশ। অমানুষিক চেষ্টায় বাম পাশে কাত হয়ে কোমর পর্যন্ত দেহের অর্ধাংশ তুলে ফেলল রানা হেলিকপ্টারের উপর পা দুটো উঠিয়ে আনছে

সে এবার। ঠিক এমনি সময় শেষ ধাক্কা দিল কবীর চৌধুরী অনীতাকে। ডান পা-টা উঁচু করল রানা ঠেকাবার জন্যে, দরজার কিনারায় শক্ত করে চেপে ধরল পা-টা। অনীতার দুই উরুর পিছন দিকটা লাগল এসে রানার পায়ে। এতই জোরে ধাক্কা দিয়েছিল কবীর চৌধুরী যে সামলাতে পারল না অনীতা, দুই পা শূন্যে উঠে গেল ওর, রানার পায়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর নগ্ন দেহটা বাইরের নিশ্ছিদ্র, নিকষ কালো অন্ধকারে। তীক্ষ্ণ একটা অপার্থিব চিৎকার উঠেই মিলিয়ে গেল তিন সেকেন্ডের মধ্যে।

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল রানা, হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল অনীতাকে—এখন স্তব্ধ বিস্ময় আর একরাশ অবিশ্বাস চোখে নিয়ে চেয়ে রইল সে নিচের দিকে। দম বন্ধ করে সে কি অপেক্ষা করছে অনীতার পতনের শব্দ শুনবে বলে?

দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি পড়ল রানার পিঠে। ঝট্ করে ফিরল সে পিছন দিকে। আবার পা তুলেছে কবীর চৌধুরী। দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল রানার কাঁধের উপর। পা-টা ধরে ফেলেই মোচড় দিল রানা। খুলে এল প্যান্টের ফোকর গলে হাঁটু পর্যন্ত কাঠের নকল পা। ছুঁড়ে মারল সেটা রানা কবীর চৌধুরীর বুক লক্ষ্য করে। অবর্ণনীয় ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। এক পায়ে টাল সামলাতে পারল না সে, হুড়মুড় করে পড়ল মেঝের উপর ওর প্রকাণ্ড কাঠামোর হাড্ডিসার দেহটা।

ব্যাগটা দরজার পাশ থেকে তুলে নিয়েই ছুটল রানা পাইলট-কেবিনের দিকে। দুটো পিস্তল পড়ে আছে সেখানে।

বেশিদূর যেতে হলো না, প্যাসেঞ্জারস্ কেবিনের মাঝামাঝি আসতেই ক্যাপ্টেন ইসলামকে দেখতে পেল রানা। হেলিকপ্টারটা সোজা করে অটো-পাইলটের হাতে ছেড়ে দিয়েই একটা পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে সাহায্য করতে আসছিল সে রানাকে। রানাকে দেখেই ছুঁড়ে দিল সে পিস্তলটা। খপ্ করে শূন্যে ধরে ফেলল রানা সেটা। ধরেই ঘুরে দাঁড়াল।

কবীর চৌধুরী আসছে না রানার পিছু পিছু। আছড়ে-পাছড়ে সীট ধরে এক পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে খোলা দরজার সামনে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রানার দিকে। একটা হাত ওঠাল কবীর চৌধুরী নিষেধের ভঙ্গিতে। ধীর স্থির কণ্ঠে বলল, 'গুলি কোরো না, রানা।'

'নিতান্ত বাধ্য না হলে গুলি করব না আমি তোকে, শুয়োরের বাচ্চা। জ্যান্ত চাই আমি তোকে।'

'পাবে না।' করুণ হাসি হাসল সে। 'স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে। শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলাম তোমার কাছে, রানা। পারলাম না।' খোলা দরজা দিয়ে নিচের দিকে চাইল একবার কবীর চৌধুরী। আবার চাইল রানার দিকে। 'সুখে থাকো তোমরা এই পৃথিবীতে। আর কোনদিন জ্বালাতে আসব না আমি তোমাদের।'

পাশ ফিরল কবীর চৌধুরী। পর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে বাইরের অন্ধকারে।

রানা শুনতে পেল সামনের কেবিন থেকে পাইলটের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'দিস ইজ ক্যাপ্টেন ইসলাম স্পীকিং…' অয়্যারলেসে খবর দিচ্ছে সে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। সবশেষে বলল, 'অ্যান্ড অ্যান অ্যাম্বুলেন্স ফর মিস্টার মাসুদ রানা।'

একটা সীটের উপর বসে পড়ল ক্লান্ত রানা। সীটের পিছনে মাথা ঠেকিয়ে জ্ঞান হারাল নিশ্চিন্তে।

দশদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলো রানা। সাত তলায় উঠে এল সে লিফটে করে, কার্পেট মোড়া লম্বা করিডর ধরে এসে দাঁড়াল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কামরার সামনে। পাশের কামরায় সোহানাকে না দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়েছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে তার কণ্ঠস্বর শুনে। ইন্টারকমের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল সোহানার কণ্ঠস্বর।

'…অদ্ভুত সাহসী, স্যার।'

রানা বুঝল বুড়োর ঘরে রয়েছে সোহানা। ইন্টারকমের সুইচটা অন করা রয়েছে বলে ওর কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে এঘর থেকে। মেজর জেনারেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল এবার।

'আমার রানা শুধু একজন স্পাই নয়, সোহানা, ও একজন সত্যিকারের মানুষ। রানার মত এমন একটা উদার প্রাণ…'

কি করবে ভেবে পেল না রানা। ওই রকম একটা কট্টর বুড়ো, ধমক ছাড়া একটি কথা বলতে জানে না যে, তার মুখে এই কথা! অদ্ভুত এক আনন্দ শিহরণ অনুভব করল সে বুকের ভিতর। সিক্ত হয়ে গেল ওর স্নেহ কাঙাল হৃদয়। কিন্তু এদিকে চুপি চুপি কারও কথা শোনাও যায় না। ঢুকে পড়ল সে দরজা ঠেলে।

হাসি মুখে কি যেন বলছিলেন তিনি সোহানাকে, রানার দিকে চোখ পড়ল ওঁর, অদৃশ্য একটা সুইচ টিপলেন তিনি, মিলিয়ে গেল হাসিটা। রানা ভাবল ও বাবা, কাজ উদ্ধার হয়ে যেতেই আগের সেই সব ভঙ্গিমা শুরু হয়েছে দেখছি বুড়োর।

'কি চাই?' কটমট করে চাইলেন তিনি রানার মুখের দিকে।

'ছুটি চাই, স্যার।' মিনমিন করে বলল রানা।

'কেন?'

'কদিন বিশ্রাম দরকার, স্যার। ঘুরে বেড়াতে চাই কিছুদিন

কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে দুই সেকেন্ড চিন্তা করলেন বৃদ্ধ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কয় দিন?'

'এক মাস, স্যার।'

'ঠিক আছে, অ্যাপ্লাই করো, গ্র্যান্ট করে দেব।'

'থ্যাঙ্ক-ইউ, স্যার।'

'আর কিছু বলবে?'

'না, স্যার, এইজন্যেই এসেছিলাম।' ঘুরে দাঁড়াবার আগে বৃদ্ধকে স্মরণ করিয়ে

দিল রানা। 'ইন্টারকমের সুইচটা অন করা আছে, স্যার।'

কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ রানার চোখের দিকে, সুইচটা অফ করে দিলেন বামহাতে।

'তোমার কাজে আমি খুশি হয়েছি, রানা, যাও।'

* * * *

মাসুদ রানা

নীল আতঙ্ক

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

আঁতকে উঠল সমগ্র দেশ। পৃথিবীটা ধ্বংস করে দেবে নাকি লোকটা? মাইক্রো-বায়োলজিকাল রিসার্চ সেন্টার থেকে চুরি গেছে কালকূট। ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ক্ষ্যাপা লোক। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইরাস হাতে নিয়ে হুমকি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে—তার কাছে নতি স্বীকার না করলে যে-কোন মুহূর্তে ফাটিয়ে দেবে সে ভাইরাসের বোতল! রানা, বাঁচাও!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০